একটুখানি বিজ্ঞান

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

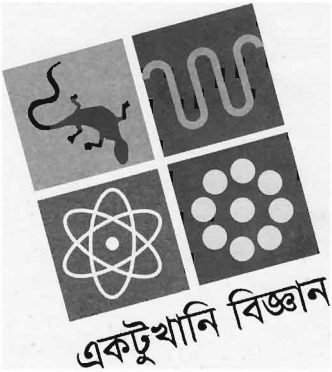

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

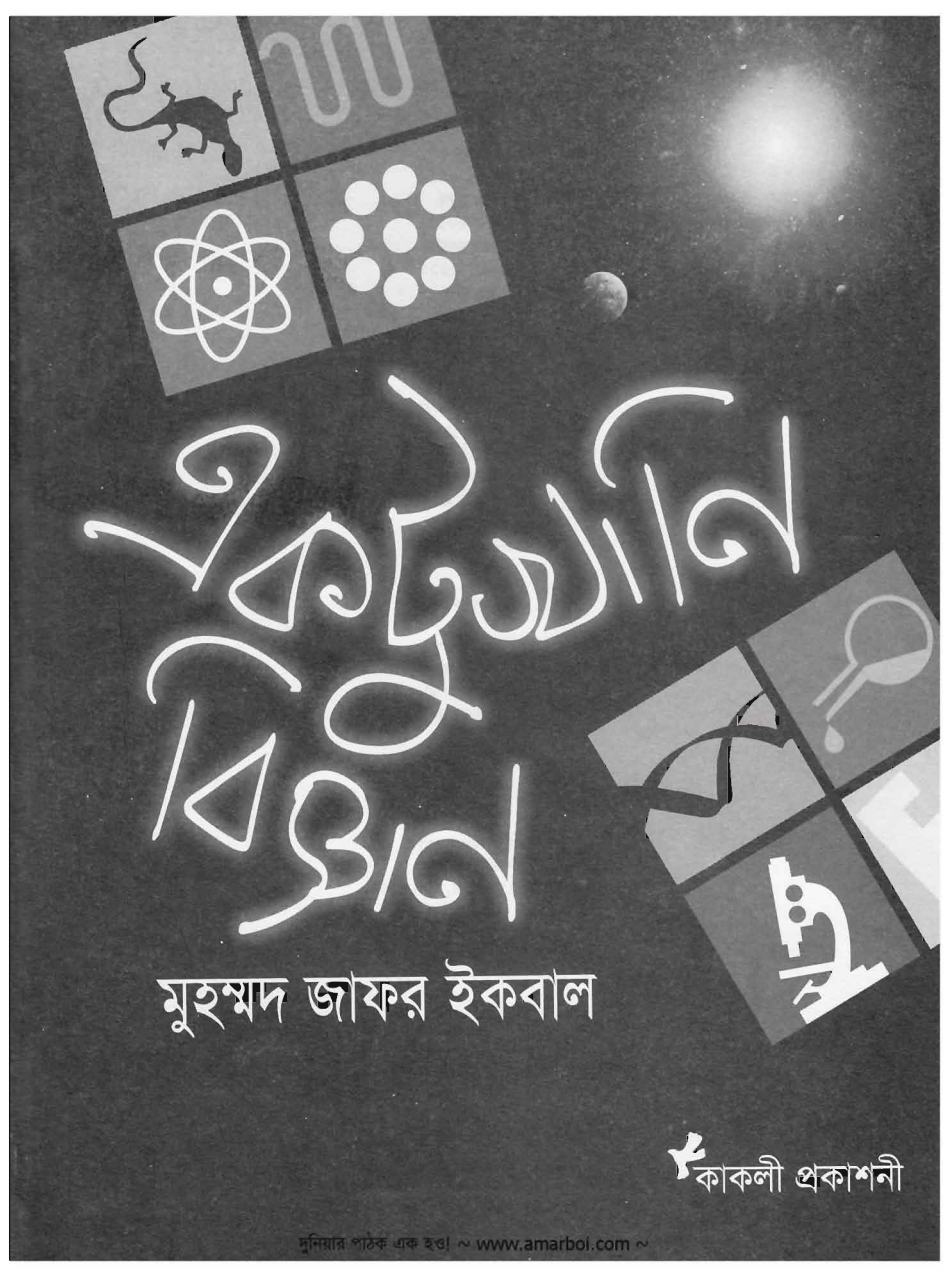

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২
অষ্টম মুদ্রণ
জুলাই ২০১১
সপ্তম মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০১০
ষষ্ঠ মুদ্রণ
মার্চ ২০১০
পঞ্চম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯
চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
দিদারুল আলম শামীম
কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এল্লেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ৩০০ টাকা

Aktukhani Bigyan by Muhammed Zafar Iqbal
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakali Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk 300.00

ISBN 984-70133-0352-7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

প্রফেসর আনিসুজ্জামান
যাকে সব সময় মনে হয়েছে
আমাদের আপনজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আমার বিরুদ্ধে আমার পাঠকেরা যেসব অভিযোগ করে থাকেন তার মাঝে এক নম্বর অভিযোগটি হচ্ছে আমি বিজ্ঞানের বই লিখি না। আমি যে লিখতে চাই না তা নয়, এক দু'বার যে লিখি নি তাও নয় কিন্তু তার পরেও বিজ্ঞান কল্পকাহিনী যতগুলো লিখেছি বিজ্ঞানের বই লিখেছি তার চাইতে অনেক কম। কারণটি খুব সহজ, বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লিখতে দরকার একটুখানি বিজ্ঞান এবং অনেকখানি কল্পনা। বিজ্ঞানের বেলায় তা নয়, কল্পনাটাকে বাক্সবন্দি করে তখন শুধু বিজ্ঞান নিয়ে বসতে হয়। তার জন্যে যেটুকু সময় দরকার কীভাবে জানি সেটুকু সময় কখনোই হয়ে উঠে না।

তারপরেও একটুখানি বিজ্ঞান নামে এই নাদুস-নুদুস বইটি দাঁড়া হয়ে গেছে তার কারণ শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আনিসুজ্জামান! তিনি কালি ও কলমের প্রতি সংখ্যায় আমাকে বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই একটু একটু করে লিখতে লিখতে আজকের এই একটুখানি বিজ্ঞান। যেসব বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে পাঠকেরা সেখানে একবার চোখ বুলালেই বুঝতে পারবেন যে তার মাঝে খুব একটা মিল নেই, যে বিষয়গুলো আমার ভালো লাগে সেগুলোই বারবার উঠে এসেছে। তবে সান্ত্বনা এটুকু, বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো সবচেয়ে রহস্যময় আমার সেগুলোই সবসময় সবচেয়ে ভালো লাগে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১ সেপ্টেম্বর ২০০৬
বনানী, ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বইসমূহ

আমার বন্ধু রাশেদ
বুবুনের বাবা
আধুনিক ঈশপের গল্প
দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর
শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু
দেশের বাইরে দেশ
দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন
রবোনগরী
একটুখানি বিজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বিজ্ঞান
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা / ১১
বিজ্ঞান বনাম প্রযুক্তি / ১৬
বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভাষা— গণিত / ২৪
বিজ্ঞানী
একজন বিজ্ঞানী এবং তার গবেষণা প্রক্রিয়া / ২৯
একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা / ৩৪
প্রযুক্তি
তথ্যপ্রযুক্তি / ৩৯
ফাইবার অপটিক্স / ৪৪
রসায়ন
অক্সিজেন : নিত্যকালের সঙ্গী / ৪৯
প্রাণিজগৎ
জীবনের নীল নকশা / ৫৪
একটি জীবাণুর বক্তৃতা / ৫৯
মস্তিষ্ক
মস্তিষ্কের ডান বাম / ৬৪
বুদ্ধিমত্তা : মস্তিষ্কের ভেতরে এবং বাইরে / ৬৮
ঘুমের কলকব্জা / ৭৪
প্রাণীদের ভাবনার জগৎ / ৭৯
চোখ আলো ও রঙ / ৮৩
অটিজম / ৮৯
পদার্থবিজ্ঞান
কোয়ান্টাম মেকানিক্স / ৯৪
থিওরি অফ রিলেটিভিটি / ১০০
বিগ ব্যাং : একটি নাটকীয় বিষয় / ১০৫
সবকিছুর তত্ত্ব : স্ট্রিং থিওরি / ১১১
গ্রহ
ভূমিকম্প / ১১৭
গ্রহাণুপুঞ্জ / ১২৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজগৎ
মহাজাগতিক ক্যালেন্ডার / ১২৭
হারিয়ে যাওয়া ভর / ১৩৪
নক্ষত্রের সন্তান / ১৩৯
অদৃশ্য জগতের সন্ধানে / ১৪৫
ব্ল্যাক হোল / ১৫১
বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত বিচি / ১৫৬
মহাজাগতিক সংঘর্ষ / ১৬১
ভবিষ্যৎ
টাইম মেশিন / ১৬৭
আমরা কী একা? / ১৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা

পৃথিবীর মানুষ আজকাল যে ধরনের বিজ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেটি কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশ নূতন। আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ কিছু একটা বলতেন অন্য সবাই তখন সেটাকেই মেনে নিতো। অ্যারিস্টটল তাঁর সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন জ্ঞানীমানুষ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন ভারী জিনিস হালকা জিনিস থেকে তাড়াতাড়ি নিচে পড়ে—[১] কেউ কোনো রকম আপত্তি না করে সেটা মেনে নিয়েছিলেন। দুই হাজার পর একজন বিজ্ঞানী (গ্যালেলিও গ্যালিলি) ব্যাপারটা একটু পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন বিষয়টি সত্যি নয়, ভারী এবং হালকা জিনিস একই সাথে নিচে এসে পড়ে। বিজ্ঞানের একটা ধারণাকে যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে তার সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখা যায় সেই চিন্তাটি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের জগৎটাকেই পাল্টে দিয়েছিল। এই নূতন পদ্ধতিতে বিজ্ঞানচর্চায় কৃতিত্বটা দেয়া হয় নিউটনকে (আইজাক নিউটন)। বর্ণহীন আলো যে আসলে বিভিন্ন রংয়ের আলোর সংমিশ্রণ সেটা নিউটন প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সময়ের নিয়ম অনুযায়ী এই তত্ত্বটা প্রকাশ করার পর সকল বিজ্ঞানীদের সেটা নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, কারো কারো এর পক্ষে এবং কারো কারো এর বিপক্ষে যুক্তিতর্ক দেয়ার কথা ছিল। নিউটন এইসব আলোচনার ধারে

1.1 নং ছবি : অ্যারিস্টটল তার সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন জ্ঞানীমানুষ ছিলেন।

১. ভারী বস্তু এবং হালকা বস্তু যে একই সাথে নিচে পড়বে সেটা কোনো পরীক্ষা না করে শুধুমাত্র যুক্তিতর্ক দিয়েই বের করা সম্ভব। ধরা যাক ভারী বস্তু তাড়াতাড়ি এবং হালকা বস্তু ধীরে ধীরে নিচে পড়ে। এখন একটি ভারী বস্তুর সাথে হালকা বস্তু বেঁধে দিলে হালকা বস্তুটি ভারী বস্তুটিকে তাড়াতাড়ি পড়তে বাধা দিবে, কাজেই দুটি মিলে একটু আস্তে পড়বে। কিন্তু আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি ভারী এবং হালকা মিলে যে বস্তুটা হয়েছে সেটা আরো বেশি ভারী কাজেই আরো তাড়াতাড়ি পড়া উচিৎ। একভাবে দেখা যাচ্ছে আস্তে পড়বে অন্যভাবে দেখা যাচ্ছে দ্রুত পড়বে। এই বিভ্রান্তি মেটানো সম্ভব যদি আমরা ধরে নিই দুটো একই গতিতে নিচে পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে গেলেন না, একটা প্রিজমের ভিতর দিয়ে বর্ণহীন সূর্যের আলো পাঠিয়ে সেটাকে তার ভিতরের রংগুলিতে ভাগ করে দেখালেন। শুধু তাই না, আবার সেই ভাগ হয়ে যাওয়া রংগুলোকে দ্বিতীয় একটা প্রিজমের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে সেটাকে আবার বর্ণহীন সূর্যের আলোতে পাল্টে দিলেন। পরীক্ষাটি এত অকাট্য যে তার তত্ত্বটা নিয়ে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই ধরনের বিজ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত ছিলেন না এবং নিউটন যে তার তত্ত্ব নিয়ে তর্কবিতর্ক করার কোনো সুযোগই দিলেন না সে জন্যে তার ওপরে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, তাদের মনে হয়েছিল নিউটন যেন কোনোভাবে তাদের ঠকিয়ে দিয়েছেন!

1.2 নং ছবি : আধুনিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিলেন আইজাক নিউটন।

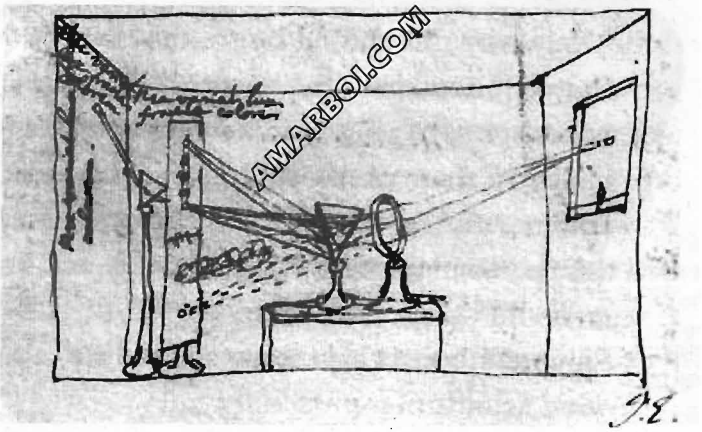

1.3 নং ছবি: নিউটনের নিজের হাতে আঁকা ছবি, একটি প্রিজম সূর্যের আলোকে সাত রংয়ে ভাগ করছে অন্য প্রিজম সেই ভাগ করা রংগুলোকে একত্র করে আবার বর্ণহীন আলোতে পাল্টে দিচ্ছে।

সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটাকে যত অপছন্দই করে থাকুন না কেন বর্তমান বিজ্ঞানচর্চা কিন্তু এভাবেই হয়। বিজ্ঞানীরা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করেন, প্রকৃতি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মে এই জগৎটিকে পরিচালনা করে সেই নিয়মগুলোকে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। গণিতের ভাষা থেকে নিখুঁত আর স্পষ্ট ভাষা কী হতে পারে? তাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির সূত্রগুলোকে গাণিতিক কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করা। "বস্তুর ভর আসলে শক্তি" না বলে বিজ্ঞানীরা আরো নিখুঁত গাণিতিক ভাষায় বলেন, "বস্তুর ভরের সাথে আলোর বেগের বর্গের গুণফল হচ্ছে শক্তি"।[২] বিজ্ঞানের এই সূত্রগুলো খুঁজে বের করা হয় পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ শুধু মাত্র চিন্তাভাবনা করে একটা সূত্র বের করে ফেলেন অন্য বিজ্ঞানীদের তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেটার সত্য মিথ্যা খুঁজে বের করতে হয়।

1.4 নং ছবি: কোপার্নিকাস প্রথমে বলেছিলেন, সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে সব গ্রহগুলো ঘুরছে।

পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানের কোনো রহস্য বুঝে ফেলার একটা উদাহরণ তৈরি করেছিলেন কোপার্নিকাস। যারা চন্দ্র এবং সূর্য কিংবা অন্য গ্রহ নক্ষত্রকে আকাশে উদয় এবং অস্ত হতে দেখেছে তারা ধরেই নিয়েছিল সবকিছুই পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। নিজের চোখে সেটা দেখছেন অস্বীকার করার উপায় কী? কিন্তু কোপার্নিকাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু লক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন আসলে ব্যাপারটি অন্যরকম— সূর্য রয়েছে মাঝখানে, তাকে ঘিরে ঘুরছে পৃথিবী এবং অন্য সবগুলো গ্রহ। প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে কোপার্নিকাস প্রথম যখন ঘোষণাটি করেছিলেন তখন সেটি তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। একশ' বছর পর গ্যালেলিও যখন সেটাকে গ্রহণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন তখন ধর্মযাজকরা হঠাৎ করে তার পিছনে লেগে গেলেন। তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে পৃথিবী সবকিছুর কেন্দ্র, সেই পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে ঘোষণা করা ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করার মতো। ভ্যাটিকানের পোপেরা সে জন্যে তাকে তখন ক্ষমা করেন নি। ব্যাপারটি প্রায় কৌতুকের মতো যে গ্যালেলিওকে ভ্যাটিকান চার্চ ক্ষমা করেছে মাত্র 1992 সালে। তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না— ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানের বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানের যে কোনো সূত্রকে যে-কেউ যখন খুশি প্রশ্ন করতে পারে, যুক্তি-তর্ক, পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে সেই সূত্রের সত্যতা তখন প্রমাণ করে দিতে হবে। কাজেই কেউ যদি বিজ্ঞান ব্যবহার করে ধর্মচর্চা করে কিংবা ধর্ম ব্যবহার করে বিজ্ঞানচর্চা করার চেষ্টা করে তাহলে বিজ্ঞান বা ধর্ম কারোই খুব একটা উপকার হয় না। গবেষণা করে দেখা গেছে যে, চতুরতার সাথে দুর্নীতি করা হলে আইনের সাথে কোনো ঝামেলা ছাড়াই বড় অংকের অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। এ-রকম একটি

২. আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বৈজ্ঞানিক তথ্য" উপস্থিত থাকার পরও আমরা কিন্তু সব সময়েই সবাইকে সৎভাবে বেঁচে থাকার একটি "অবৈজ্ঞানিক" উপদেশ দিই এবং নিজেরাও অবৈজ্ঞানিকভাবে সৎ থাকার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে বিজ্ঞান একমাত্র জ্ঞান নয়, যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায় না এ-রকম অনেক বিষয় আছে, আমরা কিন্তু সেগুলোর চর্চাও করি। বিজ্ঞানের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-দর্শন এ-রকম অনেক বিষয় আছে এবং সব মিলিয়েই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার এবং পৃথিবীর সভ্যতা। কাজেই সবকিছুকে বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে সেটিও সত্যি নয়।

1.5 নং ছবি : মাইকেলসন আর মোরলি একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন ইথার বলে কিছু নেই।

কোপার্নিকাস গ্রহ-নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিজ্ঞানীরা সব সময় এ-রকম পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। যেটা পর্যবেক্ষণ করতে চান সম্ভব হলে সেটি গবেষণাগারে তৈরি করে সেটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। একসময় মনে করা হতো সমস্ত বিশ্বজগৎ, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছু ইথার নামক অদৃশ্য এক বস্তুতে ডুবে আছে, পানিতে যেরকম ঢেউ তৈরি করা হয় আলো সেরকম ইথারের মাঝে তৈরি করা ঢেউ। বিজ্ঞানীরা তখন একটি চুলচেড়া পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, পরীক্ষার উদ্দেশ্য ইথারের মাঝে দিয়ে পৃথিবী কত বেগে ছুটে যাচ্ছে সেটা বের করা। মাইকেলসন (আলবার্ট এ মাইকেলসন) এবং মোরলীর (এডওয়ার্ড ডাব্লিউ মোরলী) এর পরীক্ষায় দেখা গেল ইথার বলে আসলে কিছু নেই। (অনেক কবি সাহিত্যিক অবশ্যি এখনো সেই খবরটি পান নি, তারা তাদের লেখালেখিতে এখনও ইথার শব্দটি ব্যবহার করে যাচ্ছেন!) ইথারের মতো এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা বিজ্ঞানীরা যেরকম একটা পরীক্ষা করে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছিলেন ঠিক সেরকম আরও অনেক ধারণাকে পরীক্ষা করে সত্যও প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীর নূতন বিজ্ঞান এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানচর্চার একটা বড় অংশ এখন গবেষণাগারের উপর নির্ভর করে। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান এখন একটি আরেকটির হাত ধরে অগ্রসর হচ্ছে, একটি ছাড়া অন্যটি এগিয়ে যাবার কথা আজকাল কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

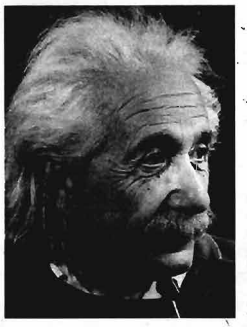

1.6 নং ছবি : আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক সূত্র বের করেছিলেন শুধুমাত্র চিন্তাভাবনা আর যুক্তিতর্ক দিয়ে।

পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অবশ্যি বিজ্ঞানীরা সব সময়েই যুক্তিতর্ক ব্যবহার করে প্রকৃতির রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করেন। বড় বড় বিজ্ঞানীদের এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তারা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন— যা হয়তো সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না। মাইকেলসন এবং মোরলী একটি চুলচেড়া পরীক্ষা করে ইথার নামক বস্তুটিকে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছিলেন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সেই একই কাজ করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজমের কিছু সূত্রকে সমন্বিত করার জন্যে তিনি তার জগদ্বিখ্যাত আপেক্ষিক সূত্র বের করেছিলেন, পুরাপুরি চিন্তা-ভাবনা এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে। তার আপেক্ষিক সূত্র সরাসরি ইথারকে বাতিল করে দিয়েছিল এবং মাইকেলসন মোরলীর পরীক্ষাটি ছিল তার প্রমাণ।

কাজেই বলা যেতে পারে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা এখন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যুক্তিতর্ক এই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ব্যাপারটি আমরা সবাই সরাসরি দেখতে পাই না কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহার বা প্রযুক্তি (টেকনোলজি)-কে কিন্তু বেশ সহজেই দেখতে পাই। এটি এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই প্রযুক্তির মোহ আমাদের অনেক সময় অন্ধ করে ফেলছে, আমরা অনেক সময় কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা প্রযুক্তি সেটা আলাদা করতে পারছি না। বিজ্ঞানের কৃতিত্বটা প্রযুক্তিকে দিচ্ছি, কিংবা প্রযুক্তির অপকীর্তির দায়ভার বহন করতে হচ্ছে বিজ্ঞানকে।

ভোগবাদী পৃথিবীতে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে আলাদা করে দেখা— তা না হলে আমরা কিন্তু খুব বড় বিপদে পড়ে যেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

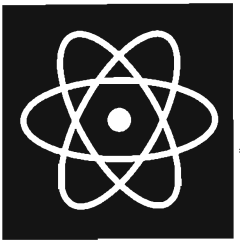

2. বিজ্ঞান বনাম প্রযুক্তি

মা এবং সন্তানের মাঝে তুলনা করতে গিয়ে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয়, কথাটা হচ্ছে "কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কখনো নয়।" সন্তানের জন্যে মায়ের ভালোবাসা দিয়েই একটা জীবন শুরু হয় তাই মায়ের উপর এত বড় একটা বিশ্বাস থাকবে বিচিত্র কী? কুপুত্র এবং কুমাতা নিয়ে এই কথাটা একটু পরিবর্তন করে আমরা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জন্যে ব্যবহার করতে পারি, কথাটি হবে এরকম, "কু-প্রযুক্তি হতে পারে, কু-বিজ্ঞান কখনো নয়।" যার অর্থ বিজ্ঞানটা হচ্ছে জ্ঞান আর প্রযুক্তিটা হচ্ছে তার ব্যবহার, জ্ঞানটা কখনোই খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তিটা খুব সহজেই ভয়ংকর হতে পারে। আইনস্টাইন যখন তার আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে লিখলেন $E = mc^2$ তখন তার বুক একবারও আতঙ্কে কেঁপে উঠে নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে যখন হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরে নিউক্লিয়ার বোমা এক মুহূর্তে কয়েক লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলল তখন সারা পৃথিবীর মানুষের বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। এখানে $E = mc^2$ হচ্ছে বিজ্ঞান আর নিউক্লিয়ার বোমাটা হচ্ছে প্রযুক্তি— দুটোর মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব।

2.1 নং ছবি : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিরোশিমা শহরে একটা নিউক্লিয়ার বোমা এক মুহূর্তে কয়েক লক্ষ লোককে মেরে ফেলেছিল।

AMARBOI.COM

প্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই একটা কুৎসিত উদাহরণ দিয়ে সবার মন বিষিয়ে দেয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু মানুষ ক্রমাগত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে গুলিয়ে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই দুটো বিষয়কে একটু জোর করে হলেও আলাদা করে রাখা ভালো। বিজ্ঞানের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে, আজকালকার ধর্মের বইগুলো দেখলেই সেটা বোঝা যায়। ধর্মীয় কোনো একটা মতকে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ফুটনোটে লেখা হয় "ইহা বিজ্ঞান মতে প্রমাণিত।" বিজ্ঞানের এই ঢালাও গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যবহার করে প্রযুক্তি যদি ছদ্মবেশে আমাদের জীবনের মাঝে জোর করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে তার থেকে আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিৎ।

2.2 নং ছবি : পৃথিবীর হাজার হাজার গাড়ি প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেন ব্যবহার করে তৈরি করছে কার্বন ডাই অক্সাইড।

এটি কেউ অস্বীকার করবে না, প্রযুক্তির কারণে আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা ধরা যাক, প্লেন গাড়ি জাহাজ করে আমরা চোঁখের পলকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাই। একসময় প্রকৃতির সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হতো আজকাল আমরা তার অনেকটাই আমাদের কব্জায় নিয়ে এসেছি। আজকাল আমদের দেশেই উচ্চবিত্ত মানুষেরা গরমের দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে শীতল হিমেল বাতাসে শরীরকে জুড়িয়ে নিতে পারেন। এ-রকম উদাহরণের কোনো শেষ নেই, জীবনকে সহজ করার জন্যে চমৎকার সব প্রযুক্তি, এর বিরুদ্ধে কারো কী কিছু বলার আছে? একটু খুটিয়ে দেখলে কেমন হয়?

AMARBOI.COM

প্লেন-গাড়ি-জাহাজ (কিংবা কলকারখানায়) আমরা জ্বালানী তেল বা গ্যাস ব্যবহার করি, সেটাকে পুড়িয়ে তার থেকে শক্তি বের করে এনে সেই শক্তিটাকে ব্যবহার করি। এই শক্তিটাকে ব্যবহার করার জন্যে আমাদের একটা মূল্য দিতে হয়। সেই মূল্যটার নাম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড। যখনই বাতাসে আমরা কিছু পোড়াই তখনই আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি করি। এটি কোনো বিচিত্র গ্যাস নয়, আমরা নিশ্বাসের সময় ফুসফুসে অক্সিজেন টেনে নিয়ে প্রশ্বাসের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিই। পৃথিবীর সব জীবিত প্রাণী নিশ্বাসে নিশ্বাসে অক্সিজেন টেনে নিয়ে, কিংবা কলকারখানা গাড়ি প্লেনের ইঞ্জিনে জ্বালানী তেল পুড়িয়ে একসময় পৃথিবীর সব অক্সিজেন শেষ করে ফেলবে তার আশঙ্কা নেই। তার কারণ পৃথিবীর জীবিত প্রাণীর জন্যে প্রকৃতি খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে, আমরা নিশ্বাসে যে অক্সিজেন খরচ করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে ফেলি, সুবজ গাছপালা সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে সালোক-সংশ্লোষণের ভেতর দিয়ে তাদের খাবার তৈরি করার জন্যে ব্যবহার করে। তাদের খাবার আসলে আমাদেরও খাবার, শুধু যে খাবার তাই নয় সালোক-সংশ্লেষণের সেই প্রকিয়ার ভেতর দিয়ে সবুজ গাছপালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে সেই অক্সিজেনটা আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অক্সিজনের জন্যে আমরা সবুজ গাছপালার কাছে অসম্ভব রকম ঋণী। সবুজ পৃথিবী শুধু যে দেখতে সুন্দর তা নয় (আমাদের চোখের রেটিনা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল এই সবুজ রংয়ে) আমাদের নিশ্বাসের নিশ্চয়তা আসে এই সবুজ গাছপালা থেকে।

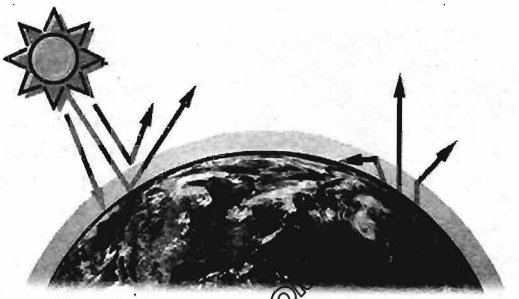

2.3 নং ছবি : কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে পুরো পৃথিবীটা এখন একটা বিশাল গ্রিন হাউজ, তাপ রশ্মি বায়ুমণ্ডলে আটকা পড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

AMARBOI.COM

পৃথিবীতে বেশি বেশি জ্বালানী পোড়ানোর কারণে অক্সিজেন কমে যাবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাবে সেটি অবশ্যি এখনো দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, দুশ্চিন্তার কারণ আসলে অন্য একটি বিষয়, যারা পৃথিবীর খোঁজখবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই সেই বিষয়টির কথা জানেন, বিষয়টি হচ্ছে গ্রীন হাউস এফেক্ট। গ্রীন হাউস জিনিসটির আমাদের দেশে সেরকম প্রচলন নেই। আমাদের দেশে তাপমাত্রা কখনোই খুব একটা বেশি কমে যায় না তাই শীতে গাছপালা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে (বা সবুজ রাখার জন্য) গ্রীন হাউস তৈরি করতে হয় না। শীতের দেশে গ্রীন হাউসের প্রচলন আছে, সেখানে বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা থাকলেও গ্রীন হাউসের ভেতরে গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে থাকে এটা একটা আরামদায়ক উষ্ণতা। গ্রীন হাউস ব্যাপারটি আসলে খুব সহজ— একটা কাচের ঘর। সূর্যের আলো কাচের ভেতর দিয়ে গ্রীন হাউসে ঢুকে কিন্তু বের হতে পারে না, তাপটাকে ভেতরে ধরে রাখে। প্রশ্ন উঠতে পারে কাচের ভেতর দিয়ে যেটা ঢুকে যেতে পারে সেটা তো বেরও হয়ে যেতে পারে— তাহলে ভেতরে আটকে থাকে কেন? তার কারণ আলো হিসেবে যেটা কাচের ভেতর দিয়ে গ্রীন হাউসে ঢুকে যায় সেটা ভেতরকার মাটি দেয়াল বা গাছে শোষিত হয়ে যায়। তারপর সেগুলো যখন বিকিরণ করে তখন সেটা বিকিরণ করে তাপ হিসেবে। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট, সেগুলো কাচের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে; তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লম্বা, সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কাচের ভেতর দিয়ে এত সহজে যেতে পারে না। তাই আলো হিসেবে শক্তিটুকু গ্রীন হাউসের ভেতরে ঢুকে তাপ হিসেবে আটকা পড়ে যায়।

মানুষ অনেকদিন থেকেই তাদের ঘরে বাড়িতে নার্সারীতে এ-রকম ছোট ছোট গ্রীন হাউস তৈরি করে এসেছে, কিন্তু গত এক শতাব্দীতে তারা নিজের অজান্তেই বিশাল একটা গ্রীন হাউস তৈরি করে বসে আছে। এই গ্রীন হাউসটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এবং সেখানে কাচের ঘর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। কাচ যেভাবে গ্রীন হাউসের ভেতরে সূর্যের আলোটাকে তাপে পরিণত করে সেটাকে আটকে রাখে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসও হুবহু সেই একই উপায়ে পৃথিবীতে তাপ আটকে রাখে। তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন মানুষের জ্বালানী ব্যবহার করার কারণে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 14 শতাংশ বেড়ে গেছে। তার কারণে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা যেটুকু হওয়া দরকার তার থেকে দুই কিংবা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন। মনে হতে পারে এটি আর এমন কী! কিন্তু আসলে এই দুই তিন ডিগ্রিই পৃথিবীর অনেক কিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে বিশাল পরিমাণ বরফ জমা হয়ে আছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা অল্প একটু বাড়লেই সেই বরফের খানিকটা গলে গিয়ে নিচু অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেবে। সবার আগে পানির নিচে তলিয়ে যাবে যেই দেশটি তার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ তার কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই দেশটির গড় উচ্চতা মাত্র বিশ ফুট। প্লেন গাড়ি জাহাজ আর বড় বড় কলকারখানায় জ্বালানী পুড়িয়ে বিলাসী জীবনযাপন করবে পাশ্চাত্যের বড় বড় দেশ আর তার জন্যে পুরো দেশকে পানির নিচে তলিয়ে দেবার মূল্য দেবে বাংলাদেশ, তার থেকে বড় অবিচার আর কী হতে পারে? প্লেন-গাড়ি-জাহাজ চালানোর মতো নিরীহ একটা প্রযুক্তি পৃথিবীতে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে কেউ কী খেয়াল করে দেখেছে?

AMARBOI.COM

2.4 নং ছবি : পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পৃথিবীর যে দেশগুলো সবার আগে পানির নীচে তলিয়ে যাবে তার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা হয়তো তার শুরুটা দেখতে শুরু করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে আরামদায়ক করার কথা বলতে গিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের কথা বলা হয়েছিল। শুধু যে ঘর তা নয়, ইরাকযুদ্ধের সময় আমরা জেনেছি সাজোঁয়া বাহিনীর জীপ ট্যাঙ্ক সবকিছুই এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, যুদ্ধ করার সময় সৈনিকদের আর গরমে কষ্ট করতে হয় না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় কিংবা এরোসলে থাকে যে গ্যাস তার নাম ক্লোরোফ্লোরোকার্বন সংক্ষেপে সি.এফ.সি.। নিরীহ নামের সি.এফ.সি. গ্যাস কিন্তু মোটেও নিরীহ নয়, মানুষের তৈরি এই বিপজ্জনক গ্যাসটি ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে তারপর উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে আমাদের প্রতিরক্ষার যে ওজোন আস্তরণ রয়েছে সেটাকে কুড়ে কুড়ে খেতে শুরু করেছে। ওজোন আমাদের পরিচিত অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। আমরা বাতাসের যে অক্সিজেনে নিশ্বাস নেই সেই অনুটি তৈরি হয়েছে দুটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে, আর ওজোন তৈরি হয়েছে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে। অক্সিজেন না হলে আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারি না কিন্তু ওজোন আমাদের জন্যে রীতিমতো ক্ষতিকর। কলকারখানা বা গাড়ির কালো ধোঁয়া থেকে অল্প কিছু ওজোন আমাদের আশপাশে আছে কিন্তু পৃথিবীর মূল ওজোনটুকু বায়ুমণ্ডলে 12 থেকে 30 মাইল উপর। ওজোনের খুব পাতলা এই আস্তরণটি সারা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে, সূর্যের আলোতে যে ভয়ংকর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি রয়েছে ওজোনের এই পাতলা আস্তরনটুকু সেটা শুষে নিয়ে আমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করে। ওজোনের এই পাতলা আস্তরণটা না থাকলে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে পৌঁছে আমাদের সর্বনাশ করে ফেলতো।

AMARBOI.COM

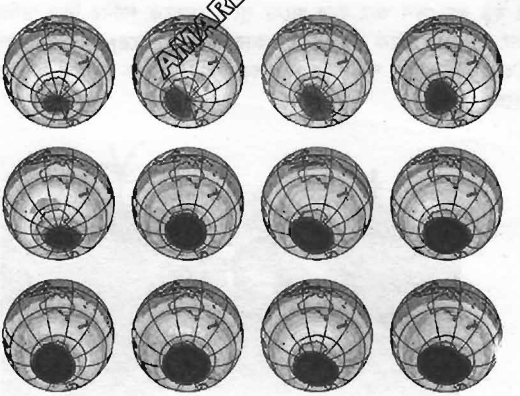

2.5 নং ছবি : অ্যান্টার্টিকার উপর ওজন স্তরের ফুটোটি বেড়ে ছবি, ১৯৬০ থেকে শুরু করে দুই বছর অন্তর অন্তর তোলা ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেই সর্বনাশটিই ঘটতে যাচ্ছে সি.এফ.সি দিয়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দিয়ে ভেসে ভেসে সি.এফ.সি যখন ওজোন আস্তরণে পৌঁছায় তখন একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সি.এফ.সি-কে ভেঙে তার ভেতর থেকে ক্লোরিন নামের একটা গ্যাসকে যুক্ত করে দেয়। এই ক্লোরিন গ্যাস ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে সেটাকে অক্সিজেনে পাল্টে দেয়। যে ওজোন আমাদের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করতো সেটা না থাকার কারণে পৃথিবীতে সেই ভয়ংকর রশ্মি এসে আঘাত করতে শুরু করেছে। এক শতাংশ ওজোন কমে গেলে পৃথিবীতে দুই শতাংশ বেশি আলট্রাভায়োলেট রশ্মি পৌঁছাবে আর পৃথিবীর মানুষের ত্বকে ক্যান্সার হবে পাঁচ শতাংশ বেশি। শুধু যে ক্যান্সার বেশি হবে তা নয়, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে— ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এ ধরনে রোগ হবে আরো অনেক বেশি। গাছপালাও দুর্বল হয়ে যাবে, সহজে বড় হতে চাইবে না। পৃথিবীতে ভয়াবহ একটা দুর্যোগ নেমে আসবে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ওজোনের আস্তরণটুকু ভয়াবহভাবে কমতে শুরু করেছে। শুধু যে কমতে শুরু করেছে তা নয় এন্টার্টিকার উপর ওজনের আস্তরণটি রীতিমতো ফুটো হয়ে গেছে— সেটি ছোট-খাটো ফুটো নয়, তার আকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। কী ভয়ংকর কথা! আমাদের জীবনযাত্রার একটু বাড়তি আরামের জন্যে এমন একটা প্রযুক্তি বেছে নিয়েছি যেটা পৃথিবীতে প্রাণী জগতের অস্তিত্বকে নিয়েই টানা দিয়ে বসেছে। কেউ যেন মনে না করে এটিই একমাত্র উদাহরণ— এ-রকম উদাহরণ কিন্তু আরো অনেক আছে, দিয়ে শেষ করা যাবে না।

বিজ্ঞান নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু প্রযুক্তি নিয়ে বড় বড় সমস্যা হতে পারে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানকে বিক্রি করা যায় না কিন্তু প্রযুক্তিকে বিক্রি করা যায়। আইনস্টাইন $E = mc^2$ বের করে একটি পয়সাও উপার্জন করেন নি (তার নোবেল প্রাইজটি এসেছিল ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের জন্যে) কিন্তু নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর প্রতিযোগিতায় সারা পৃথিবীতে কত বিলিয়ন ডলার হাতবদল হচ্ছে সেটা কেউ চিন্তা করে দেখেছে? প্রযুক্তি যেহেতু বিক্রি করা যায় তাই সেটা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা, বহুজাতিক কোম্পানিরা। পৃথিবীতে বহু উদাহরণ আছে যেখানে ব্যবসায়ীরা (বা কোম্পানিরা) তাদের টাকার জোরে একটা বাজে প্রযুক্তিকে মানুষের জীবনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাত্র কিছুদিন হলো আমরা ভিসিডি ডিভিডি দিয়ে ভিডিও দেখতে শুরু করেছি। এর আগে ভিডিও দেখার জন্যে আমরা ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ারে ভি.এইচ.এস. ক্যাসেট ব্যবহার করতাম। প্রথম যখন এই প্রযুক্তিগুলো বাজারে এসেছিল তখন দু ধরনের ভিডিও ক্যাসেট ছিল। একটা হচ্ছে বেটা যেটা ছিল আকারে ছোট, আধুনিক এবং উন্নত। অন্যটি হচ্ছে ভি.এইচ.এস. যেটা আকারে বড়, অনুন্নত এবং বদখত। কিন্তু ভি.এইচ.এস. ক্যাসেটটি ছিল শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানির এবং রীতিমতো জোর করে বাজারে ঢুকে সেটা উন্নত বেটা প্রযুক্তিটিকে বাজার ছাড়া করে ফেলল। প্রযুক্তির বেলায় দেখা যায় কোনটি উন্নত সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়, কোন কোম্পানির জোর বেশি সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসায়িক কারণে শুধু যে নিচু স্তরের প্রযুক্তি বাজার দখল করে ফেলে তা নয়, অনেক সময় অনেক আধুনিক প্রযুক্তিকেও ইচ্ছে করে বাক্সবন্দি করে রাখা হয়। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণটি টেলিভিশনকে নিয়ে। বর্তমান পৃথিবীতে টেলিভিশন দেখে নি সেরকম মানুষ মনে হয় একজনও নেই। সবারই নিশ্চয়ই টেলিভিশন নিয়ে একটা নিজস্ব মতামত আছে। তবে টেলিভিশনের যে বিষয়টি নিয়ে কেউ বিতর্ক করবেন না সেটি হচ্ছে তার আকারটি নিয়ে। টেলিভিশনের আকারটি বিশাল। টেলিভিশনের ছবি দেখা যায় সামনের স্ক্রীনটিতে, তাহলে শুধু সেই স্ক্রীনটাই কেন টেলিভিশন হলো না তাহলে সেটা জায়গা নিতো অনেক কম এবং আমরা ছবির ফ্রেমের মতো সেটাকে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারতাম। যারা এসব নিয়ে একটু-আধটু চিন্তা-ভাবনা করেছেন তারা জানেন টেলিভিশনের প্রযুক্তিটি তৈরি হয়েছে কেথড রে টিউব দিয়ে। এই টিউব পিছন থেকে টেলিভিশনের স্ক্রীনে ইলেকট্রন ছুড়ে দেয়, বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে সেই ইলেকট্রনকে নাড়া দাড়া করে টেলিভিশনের স্ক্রীনে ছবি তৈরি করা হয়। ইলেকট্রনকে আসার জন্যে স্ক্রীনের পিছনে অনেকখানি জায়গা দরকার, টেলিভিশনটা তাই ছোট হওয়া সম্ভব নয়।

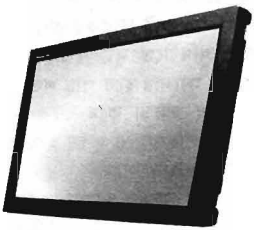

2.6 নং ছবি : ছবির ফ্রেমের মতো দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যায় এ-রকম টেলিভিশন আসার কথা ছিল সময়ের ত্রিশ বৎসর আগে।

AMARBOI.COM

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর.সি.এ. টেলিভিশন কোম্পানির একজন প্রযুক্তিবিদ একটা নূতন ধরনের টেলিভিশন আবিষ্কার করেছিলেন, সেখানে কেথড রে টিউব ব্যবহার করা হয় নি বলে টেলিভিশনটি ছিল পাতলা ফিনফিনে, ইচ্ছে করলেই দেওয়ালে ছবির ফ্রেমের মতো ঝুলিয়ে রাখা যেত। যুগান্ত কারী এই নূতন প্রযুক্তিটি মান্ধাতা আমলের অতিকায় টেলিভিশনগুলোকে অপসারণ করার কথা ছিল, কিন্তু সেটি ঘটে নি। আর.সি.এ. কোম্পানি ভেবে দেখল যে তারা প্রচলিত ধারার টেলিভিশন তৈরি করার জন্যে কোটি কোটি ডলার খরচ করে বিশাল ফ্যাক্টরি তৈরি করেছে। এখন এই নূতন ধরনের পাতলা ফিনফিনে টেলিভিশন তৈরি করতে হলে শুধু যে আবার কোটি কোটি ডলার দিয়ে নূতন ফ্যাক্টরি বসাতে হবে তা নয় সাথে সাথে আগের ফ্যাক্টরিটি অচল হয়ে যাবে। তারা ইতোমধ্যে প্রচলিত টেলিভিশনের একটা বাজার দখল করে রেখেছে সেটাও হাত-ছাড়া হয়ে যাবে— ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম অর্থনৈতিক ঝামেলা। সবকিছু চিন্তাভাবনা করে প্রযুক্তির এত চমৎকার একটা আবিষ্কারকে তারা আক্ষরিক অর্থে বাক্সবন্দি করে আবার আগের মতো পুরানো ধাঁচের টেলিভিশন তৈরি করতে লাগল। সেই বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের কেমন আশাভঙ্গ হয়েছিল আমি সেটা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় দুইযুগ পরে সেই নূতন প্রযুক্তিটি আবার নূতন করে আবিষ্কার করা হয়েছে, আমরা সেটা ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখতে শুরু করেছি। আগামী কিছুদিনের ভিতরে সেটি আবার টেলিভিশন আকারেও দেখতে পাব, তবে সময়ের বহু পরে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনাটি হয়েছে একচক্ষু হরিণের মতো। প্রযুক্তি সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক কথাই বলা হয়েছে কিন্তু কেউ যেন মনে না করে সেটাই একমাত্র কথা, অর্থাৎ বিজ্ঞানের তুলনায় প্রযুক্তিটি এত তুচ্ছ যে আমরা সব সময় সেটিকে শুধুমাত্র উপহাসই করব। প্রথমত, আমাদের বর্তমান এই সভ্যতাটি হচ্ছে প্রযুক্তির দেয়া একটি উপহার। বিজ্ঞানের গবেষণা করতে এখন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হয়, শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞানীদের সাথে সাথে একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে দেয়া হয়েছিল। তার কারণ যে যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষাটি করা হয়েছে তিনি তার যান্ত্রিক সমস্যাটির সমাধান করে দিয়েছিলেন বলে পরীক্ষাটি করা সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের চারপাশে প্রযুক্তির এত চমৎকার উদাহরণ আছে যে তার কোনো তুলনা নেই। আমরা সবাই ফাইবার অপটিক কথাটি শুনেছি। কাচ দিয়ে তৈরি চুলের মতো সূক্ষ্ম অপটিক্যাল ফাইবারের কোরটুকু এত ছোট যে সেটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়, এই ক্ষুদ্র একটিমাত্র কোরের ভেতর দিয়ে কয়েক কোটি মানুষের টেলিফোনে কথাবার্তা একসাথে পাঠানো সম্ভব। এই অসাধ্য সাধন তো প্রযুক্তিবিদেরাই করেছেন। অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে তথ্য পাঠানোর জন্যে আলোকে ব্যবহার করা হয়। আলোটি যেন কাচের ভেতরে শোষিত না হয়ে যায় সেজন্যে প্রযুক্তিবিদদের কাচটাকে স্বচ্ছ করতে হয়েছে। প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন তখন এক কিলোমিটারে আলো শোষিত হতো 1000 ডিবি। প্রযুক্তিবিদরা পরিশোধন করে সেটাকে এত স্বচ্ছ করে ফেললেন যে এখন এক কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবারে আলো শোষিত হয় মাত্র 0.25 ডিবি। কাচকে কতগুণ পরিশোধিত করতে হয়েছে সেটা যদি সংখ্যা দিয়ে লিখতে চাই তাহলে 1 এর পরে চারশত শূন্য বসাতে হবে! (1 এর পরে পাঁচটা শূন্য বসালে হয় লক্ষ, সাতটা শূন্য বসালে হয় কোটি কাজেই আমি যদি এটাকে কথায় বলতে চাই তাহলে বলতে হবে দশ কোটি কোটি কোটি কোটি ... মোট সাতান্নবার!) পৃথিবীর ইতিহাসে এ-রকম আর কোনো উদাহরণ আছে বলে আমার জানা নেই!

কাজেই প্রযুক্তিকে বা প্রযুক্তিবিদদের কেউ যেন হেনা-ফেলা না করে। আমাদের নূতন পৃথিবীর সভ্যতাটুকু তারা আমাদের উপহার দিয়েছেন। কেউ যেন সেটা ভুলে না যায়। শুধু মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে লোভী মানুষেরা আছে, অবিবেচক মানুষেরা আছে তারা অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি কিংবা অমানবিক প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীটাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলতে পারে, জঞ্জাল দিয়ে ভরে তুলতে পারে।

পৃথিবীটাকে জঞ্জালমুক্ত করার জন্যে আবার তখন আমাদের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের মুখের দিকেই তাকাতে হবে। কারণ শুধু তারাই পারবেন আমাদের সত্যিকারের পৃথিবী উপহার দিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

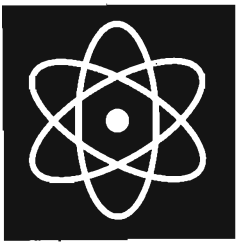

3. বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভাষা— গণিত

ধরা যাক একজন মানুষ কাজ করে প্রথম দিন এক টাকা উপার্জন করে এনেছে (আমরা জানি টাকার পরিমাণটা বেশি নয় কিন্তু যে ব্যাপারটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে টাকার পরিমাণটা গুরুত্বপূর্ণ নয়)। সেই মানুষটা দ্বিতীয় দিনে এনেছে 2 টাকা, তৃতীয় দিনে 3 টাকা। এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এনেছে যথাক্রম 4, 5, 6 ও 7 টাকা। এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি মানুষটি অষ্টম দিনে কত টাকা কামায় এনেছে তাহলে মোটামুটি সবাই বলবেন আট টাকা। এটি যুক্তিসঙ্গত একটা উত্তর। তার টাকা উপার্জনে একটা প্যাটার্ন আছে, সেই প্যাটার্নটি কী আমাদের বলে দেয়া হয় নি কিন্তু তার উপার্জনের ধারাটি থেকে সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ করে পিছনের প্যাটার্নটি অনুমান করার চেষ্টা করা। যথেষ্ট পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা না হলে এই প্যাটার্ন বা নিয়মটি আমরা পুরাপুরি ধরতে পারি না, ভুলও হতে পারে। বিজ্ঞান সেটি নিয়ে খুব মাথা ঘামায় না কারণ বিজ্ঞানের একটা সূত্র ঐশ্বরিক বাণীর মতো নয়, প্রয়োজনে সেটা পরিবর্তন করা যেতে পারে— প্রতিনিয়তই তা করা হচ্ছে।

আমাদের এই মানুষটির টাকা উপার্জনের বিষয়টি যদি একজন গণিতবিদকে বলে তাকে জিজ্ঞেস করা হতো তাহলে তিনি কিন্তু চট করে উত্তর দিতেন না। সম্ভবত ভুরু কুচকে বলতেন, "এর উত্তর আমি কেমন করে দেব? প্রথম সাতদিনের বিষয়টি আমাকে জানিয়েছ, প্রমাণ করেছ। অন্যগুলো তো কর নি!" আমরা সম্ভবত গলার রগ ফুলিয়ে তর্ক করতে চেষ্টা করব, বলব, "দেখতেই পাচ্ছি যতদিন যাচ্ছে তত টাকা উপার্জন করছে। কাজেই দিনের সংখ্যা যদি হয় n তাহলে টাকা উপার্জনের পরিমাণও হচ্ছে n." গণিতবিদ মৃদু হেসে বলতে পারেন, "কেন টাকা উপার্জনের পরিমাণ তো n + (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)(n-7) হতে পারে।" আমরা তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করব এই ফর্মুলাটি প্রথম সাতদিন যথাক্রমে 1 থেকে 7 দিলেও অষ্টম দিনে দেবে 5048, আমার কথা কেউ বিশ্বাস না করলে n এর জন্যে সংখ্যাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এটাই হচ্ছে গণিত এবং বিজ্ঞানের পার্থক্য, নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যাবেক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানের পরিবর্তন হতে পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণিতের সেই সুযোগ নেই। আমরা গণিতকে সব সময় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণ করতে চাই যেটা একবার প্রমাণিত হয়ে থিওরেম হিসেবে গৃহীত হয়েছে সেটাকে কেউ আর অপ্রমাণিত করতে পারবে না। গণিতের উপরে সে জন্যে আমাদের এত ভরসা আর বিজ্ঞানকে বোঝার জন্যে ব্যাখ্যা করার জন্যে তাই আমরা গণিতকে এত সাহস নিয়ে ব্যবহার করি।

গণিতের বেলায় যখনই কিছু প্রমাণ করা হয় সেটি সব সময়েই একটা পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত প্রমাণ কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র সে-রকম নয়। সেটি অল্প কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে এসেছে, নূতন পর্যবেক্ষণ, নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা নূতন চিন্তাভাবনা থেকে বিজ্ঞানের একটা সূত্র পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এটা কি বিজ্ঞানের একটা দুর্বলতা? আসলে সেটি মোটেও দুর্বলতা নয়, সীমাবদ্ধতা নয় বরং সেটাই হচ্ছে এর সৌন্দর্য্য বা শক্তি। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন প্রকৃতি যে নিয়মে চলছে সেই নিয়মটি সব সময়েই সহজ এবং সুন্দর, বারবার তারা সেটি দেখেছেন এবং তা বিশ্বাস করতে শিখেছেন। তারা সেই নিয়মটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অল্প কিছু পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে বিশাল একটি অজানা জগৎকে ব্যাখ্যা করে ফেলছেন সেটি যে পৃথিবীর মানব সম্পদায়ের জন্যে কত বড় একটি ব্যাপার সেটি অনুভব করা খুব সহজ নয়।

গণিতের সূত্রকে প্রমাণ করার কিছু চমৎকার পদ্ধতি আছে তার একটা হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন পদ্ধতি, ইংরেজি কন্ট্রাডিকশন শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে অসঙ্গতি এবং এই পদ্ধতিটি আসলেই গণিতের সূত্রকে প্রমাণ করার জন্যে অসঙ্গতিকে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো একটা সূত্রকে প্রমাণ করার জন্যে প্রথমে কিছু একটা ধরে নেয়া হয়; সেখান থেকে যুক্তিতর্ক দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটা অসঙ্গতির মাঝে হাজির হওয়া হয়— তখন বলা হয় প্রথমে যেটি ধরে নেয়া হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই ভুল তাই এই অসঙ্গতি! আমার মনে হয় একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে।

3.1 নং ছবি : ইউক্লিড প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্রমাণ করে গেছেন প্রাইম সংখ্যার কোনো শেষ নেই।

1 থেকে বড় যে পূর্ণ সংখ্যাকে 1 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে পুরাপুরি ভাগ করা যায় না সেই সংখ্যাগুলোকে বলে প্রাইম সংখ্যা। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... এগুলো হচ্ছে প্রাইম সংখ্যার উদাহরণ। 2 হচ্ছে সবচেয়ে ছোট প্রাইম সংখ্যা এবং সেটা একমাত্র জোড় প্রাইম। এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় প্রাইম সংখ্যাটিতে প্রায় দুই কোটি ডিজিট রয়েছে, ছোট ছোট ছাপাতে লিখলেও পুরো সংখ্যাটি লিখতে প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে। তবে এই প্রাইম সংখ্যার একটা বিশেষ বিশেষত্ব থাকায় এটাকে খুব ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেও লেখা যায়, তাহলে সেটা হবে $2^{32,582,657}-1$, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটা রূপ! গণিতবিদ এবং অন্যান্য উৎসাহী মানুষেরা ক্রমাগত নূতন নূতন প্রাইম সংখ্যা বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সংখ্যা যত বড় হয় প্রাইম সংখ্যা পাবার সম্ভাবনা তত কমে আসে কিন্তু তাই বলে প্রাইম সংখ্যা কখনই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না। ইউক্লিড দুই হাজার বছরেরও আগে এটা প্রমাণ করে গেছেন। কনট্রাডিকশন পদ্ধতির এই প্রমাণটি এত সহজ যে, যে কোনো মানুষই এটি বুঝতে পারবে। প্রমাণটি শুরু হয় এভাবে : ধরা যাক আসলে প্রাইম সংখ্যাগুলো অসীম সংখ্যাক নয়— অর্থাৎ, আমরা যদি সবগুলো প্রাইম সংখ্যা বের করতে পারি তাহলে দেখব একটা বিশাল প্রাইম সংখ্যা আছে এবং তার চাইতে বড় কোনো প্রাইম সংখ্যা নেই। সর্ববৃহৎ এবং সর্বশেষ এই প্রাইম সংখ্যাটি যদি P_n হয় তাহলে আমরা একটা মজার কাজ করতে পারি। পৃথিবীর যত প্রাইম সংখ্যা আছে তার সবগুলোকে গুণ করে তার সাথে 1 যোগ করে আমরা একটা নূতন সংখ্যা P তৈরি করতে পারি যেটা হবে:

$$P=P_1\times P_2\times P_3\times \ldots . P_n+1$$

একটু লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে এই নূতন সংখ্যাটিকে কিন্তু কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না। যে কোনো প্রাইম সংখ্যা P_1, P_2, P_3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হবে 1। যেসব সংখ্যা প্রাইম নয় সেগুলো দিয়ে ভাগ করার প্রয়োজন নেই কারণ সেই সংখ্যাগুলোও আসলে প্রাইম দিয়েই তৈরি (যেমন $14=2\times 7$, $30=2\times 3\times 5$, $32=2\times 2\times 2\times 2\times 2$)। যে সংখ্যাকে 1 ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়েই ভাগ দেওয়া যায় না সেটা হচ্ছে প্রাইম সংখ্যা, কাজেই ইউক্লিড দেখিয়ে দিলেন যে যদি আসলেই সর্ববৃহৎ এবং সর্বশেষ একটা প্রাইম সংখ্যা থাকে তাহলে তার থেকেও বড় একটা প্রাইম সংখ্যা তৈরি করা যায়। সরাসরি একটা কনট্রাডিকশন বা অসঙ্গতি! এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যে বলা যায় যে প্রথমে যে জিনিসটি ধরে আমরা শুরু করেছিলাম সেটিই ভুল অর্থাৎ সর্ববৃহৎ প্রাইম সংখ্যা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ প্রাইমের সংখ্যা অসীম!

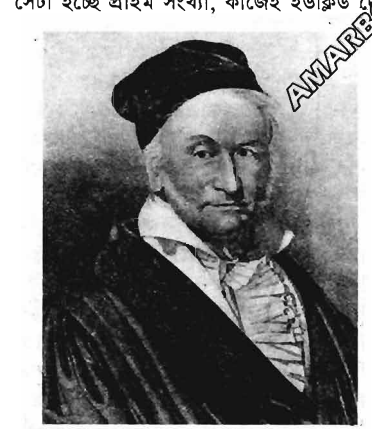
AMARBOI.COM

3.2 নং ছবি : জনশ্রুতি আছে কার্ল ফ্রেডারিক গাউস কথা বলতে শুরু করার আগে গণিত করতে শুরু করেছিলেন।

গণিতের আরো এক ধরনের প্রমাণ আছে যাকে বলা হয় ইনডাকশন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে সেটা বলার আগে পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ কার্ল ফ্রেডারিক গাউস নিয়ে একটা গল্প বলা যায়। জনশ্রুতি আছে যে, এই গণিতবিদ কথা বলতে শুরু করার আগে গণিত করতে শুরু করেছিলেন। স্কুলে তাকে নিয়ে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বিপদ হলো, তাকে যে অংকই করতে দেয়া হয় তিনি চোখের পলকে সেটা করে ফেলেন, শিক্ষকের আর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। একদিন আর কোনো উপায় না দেখে তার শিক্ষক তাকে বললেন খাতায় 1 থেকে 100 পর্যন্ত লিখে সেটা যোগ করে আনতে। তার ধারণা ছিল এটা দিয়ে গাউসকে কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখা যাবে— এতগুলো সংখ্যা খাতায় লিখতেও তো খানিকটা সময় লাগবে! গাউস কিন্তু চোখের পলকে উত্তর লিখে নিয়ে এলেন 5050! শিক্ষকের চক্ষু চড়কগাছ— জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কীভাবে করলে?" গাউস বললেন, "1 থেকে 100 যোগ করার সময় প্রথম 1 এবং শেষ 100 যোগ করলে হয় 101 দ্বিতীয় শুরু সংখ্যা 2 এবং দ্বিতীয় শেষ সংখ্যা 99 যোগ করলেও হয় 101, এ-রকম সবগুলো সংখ্যার জন্যেই সত্যি। তার অর্থ এখানে রয়েছে 50টি 101 অর্থাৎ, 50×101=5050, সেটাই হচ্ছে যোগফল"। শুনে শিক্ষকের নিশ্চয়ই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল!

এবারে আমরা সমস্যাটি নিজেদের করে দেখতে পারি। যদি 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ না করে 73 পর্যন্ত যোগ করি তাহলে যোগফল কত? কিংবা 1 থেকে 2083 পর্যন্ত যোগ করলে যোগফল কত? শেষ সংখ্যাটিকে যদি n ধরা হয় তাহলে যোগফল হচ্ছে n(n+1)/2, এটা যে সত্যি সেটা ছোটখাটো সংখ্যার জন্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারি কিন্তু এটা যে সব সময়েই সত্যি, বিশাল সংখ্যার জন্যেও সত্যি তার কী প্রমাণ আছে? এটা যে সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্যে তাহলে কী একটা একটা করে সবগুলো সংখ্যার জন্যে প্রমাণ করতে হবে?

আসলে সব সংখ্যার জন্যে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই n(n+1)/2 যে যে-কোনো n এর জন্যে সত্যি সেটি প্রমাণ করলেই যথেষ্ট। 1 থেকে n পর্যন্ত যোগ করলে যদি আমরা পাই n(n+1)/2 তাহলে 1 থেকে n+1পর্যন্ত যোগ করলে আমরা নিশ্চয়ই পাব (n+1)(n+2)/2 এবারে একই জিনিস অন্যভাবেও আমরা দেখতে পারি, যেহেতু 1 থেকে n পর্যন্ত যোগ করে n(n+1)/2 পাওয়া গেছে, তার সাথে আরো n+1যোগ করলেই আমরা 1 থেকে n+1 পর্যন্ত যোগফল পেয়ে যাব, সেটা হচ্ছে n(n+1)/2+(n+1)ছোট একটু এলজেবরা করলে দেখানো যায় সেটা হচ্ছে (n+1)(n+2)/2 অর্থাৎ, ঠিক আমাদের ফরমূলা। কাজেই আমাদের ফরমূলাটি যে সত্যি সত্যি ইনডাকশান পদ্ধতি দিয়ে সেটা দেখানো হয়েছে।

গণিতের সূত্র প্রমাণ করার এ-রকম পদ্ধতিগুলো আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার বছর থেকে গড়ে উঠেছে কিন্তু 1976 সালে এই পদ্ধতিতে একটা বড় ধাক্কা লেগেছিল, সেই ধাক্কাটি এখনো পুরাপুরি সামলে নেয়া যায় নি।

3.3 নং ছবি : প্রথমটিতে প্রয়োজন দুটি রং, দ্বিতীয়টিতে তিনটি রং, তৃতীয়টিতে আবার শুধুমাত্র দুটি রং। চতুর্থ ধরনের ম্যাপে চারটি ভিন্ন ভিন্ন রং প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল 1852 সালে যখন একজন হঠাৎ করে প্রশ্ন করলেন ম্যাপে রং করতে কয়টা রং দরকার? ম্যাপে পাশাপাশি দেশকে ভিন্ন রং দিয়ে আলাদা করা হয়, এবং সেই ম্যাপ যত জটিলই হোক না কেন দেখা গেছে সেটা রং করতে কখনোই চারটার বেশি রংয়ের প্রয়োজন হয় না (3.3নং ছবি) কিন্তু আসলেই কি তার কোনো প্রমাণ আছে?

1976 সালে কেনেথ এপিল এবং ওলফগ্যাং হেকেন নামে দুই আমেরিকান গণিতবিদ প্রমাণ করলেন যে চারটি রং দিয়েই যে কোনো ম্যাপ রং করা সম্ভব এবং তখন সারা পৃথিবীতে ভয়ানক হইচই শুরু হয়ে গেল প্রমাণটির কারণে নয় যে প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করেছেন তার কারণে। সমস্যাটির একটা বড় অংশ তারা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কিছু অংশ যেটা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব না সেগুলো তারা কম্পিউটার দিয়ে প্রমাণ করে ফেললেন! পৃথিবীর গণিতবিদরা পড়লেন বিপদে। গণিতের সূত্র প্রমাণ করার জন্যে হাজার হাজার বছর থেকে যে পদ্ধতিগুলো দাঁড়িয়েছে তাকে পাশ কাটিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রমাণ করা— এটা কোন ধরনের পাগলামো? তারা সেটা গ্রহণ করবেন, নাকি করবেন না?

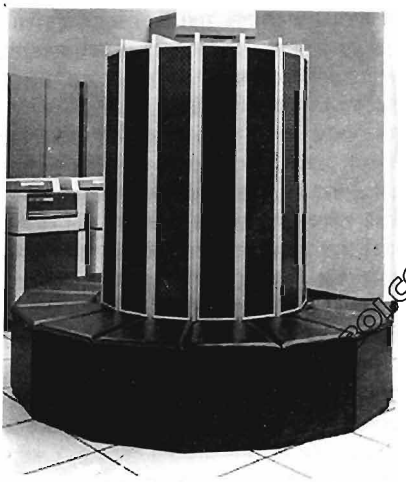

3.4 নং ছবি : সুপার কম্পিউটার, এ-রকম কোনো একটা যন্ত্র কি ভবিষ্যতে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় সমান হয়ে উঠতে পারবে?

গণিতবিদরা অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সেটি কিন্তু গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার একটি গাণিতিক সূত্রের প্রমাণে মানুষের পাশাপাশি একটা যন্ত্রকে স্থান দিতে হয়েছিল। ভবিষ্যতে কি কোনো একটা সময় আসবে যখন এই যন্ত্র মানুষকে পুরাপুরি অপসারণ করবে?

সেই উত্তর কেউ জানে না, যদিও প্রচলিত বিশ্বাস এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'না'!।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

4. একজন বিজ্ঞানী এবং তার গবেষণা প্রক্রিয়া

1885 সালের জুলাই মাসের চার তারিখ ফ্রান্সের একটি ছোট শহরে জোসেফ মাইস্টার নামের নয় বছরের একটা বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে তখন কোথা থেকে বিশাল এক কুকুর এসে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। বাচ্চাটিকে কুকুরটা সম্ভবত মেরেই ফেলতো, কাছাকাছি একজন মানুষ দেখতে পেয়ে কোনোমতে একটা লোহার রড দিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চাটার প্রাণ রক্ষা করল। আপাতত বাচ্চাটির প্রাণ রক্ষা হলো সত্যি কিন্তু বাচ্চাটির জন্যে যে ভয়ংকর একটা দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। এই পাগল কুকুরটা ভয়ংকর র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্কে ভুগছে, বাচ্চাটাকে যেভাবে আচড়ে কামড়ে কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করেছে তাতে বাচ্চাটিও যে এই রোগে মারা যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 1885 সালে জলাতঙ্কের চিকিৎসা ছিল না, এটি যে একটা ভাইরাস বাহিত রোগ সেটাও কেউ জানত না। এখনকার মানুষ যেমন জানে, তখনকার মানুষও জানত র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্ক রোগের মৃত্যু থেকে ভয়ংকর কোনো মৃত্যু হতে পারে না। জ্বর দিয়ে শুরু হয়, অস্বাভাবিক এক ধরনের বিষণ্নতা ভর করে সেটা পাল্টে যায় অনিয়ন্ত্রিত এক ধরনের উত্তেজনায়। গলার মাংসপেশীতে এক ধরনের খিঁচুনি শুরু হয়, মুখ থেকে ফেনা বের হতে শুরু করে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুক ফেটে যেতে চায় কিন্তু এক বিন্দু পানি খেলেই খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। শেষের দিকে পানি খেতে হয় না, পানি দেখলেই উন্মত্ত এক ধরনের খিঁচুনি ভর করে।

4.1 নং ছবি : র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্ক আক্রান্ত একটি কুকুর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার-পাঁচ দিন পর যখন জলাতঙ্ক রোগীর মৃত্যু হয় সেটাকে সবাই তখন আশীর্বাদ হিসেবেই নেয়।

জোসেফ মাইস্টারের মা তার ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে বললেন, তার কিছু করার নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে বাচ্চাটাকে প্যারিসে লুই পাস্তরের কাছে নেয়া যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র এই মানুষটিই যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে বাচ্চাটার জীবন রক্ষা করতে পারেন, শুধু তাহলেই বাচ্চাটি বাঁচতে পারে। যে বিষয়টি সবচেয়ে বিচিত্র সেটি হচ্ছে লুই পাস্তর কোনো ডাক্তার নন, তিনি একজন রসায়নবিদ। তার বয়স তখন তেষট্টি, স্ট্রোকে শরীরের অর্ধেক অবশ। জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছে গেছেন কিন্তু তখনও সারা দেশের মানুষের তার ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস!

4.2 নং ছবি : লুই পাস্তরকে দিয়েই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের শুরু হয়েছিল।

লুই পাস্তর খুব বড় একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। বলা যায়, তাকে দিয়ে মাইক্রোবায়োলজি বা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের শুরু হয়েছে। জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়ার অস্তিত্ব তার চাইতে ভালো করে কেউ জানে না কিন্তু তিনি এখন ভাইরাস নামের একটি অদৃশ্য শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন যেটা তখনো কেউ চোখে দেখে নি। বসন্ত রোগ বা জলাতঙ্ক রোগের কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছেন কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়েও সেটাকে দেখতে পাওয়া যায় নি।

1880 সালে যখন লুই পাস্তর তার অর্ধেক অবশ শরীর নিয়ে র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্ক রোগের উপর গবেষণা শুরু করেছেন তখন এটি সম্পর্কে মাত্র তিনটি বিষয় জানা ছিল, এক : র‍্যাবিজ আক্রান্ত পশুর লালায় এই ভাইরাসের অস্তিত্ব আছে, দুই : পশুর কামড়ে ক্ষতস্থান তৈরি হলে এই রোগের সংক্রমণ হয় এবং তিন : সংক্রমণের পর কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে এই রোগের উপসর্গগুলো দেখা যায়। এর বাইরে পুরোটাই একটা রহস্য।

লুই পাস্তর খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। প্রথমেই চেষ্টা করলেন জলাতঙ্কের কারণটি আলাদা করতে। একটা রোগ নিয়ে গবেষণা করতে হলে তার রোগীর প্রয়োজন তাই লুই পাস্তরের প্রথম কাজ হলো নিয়ন্ত্রিতভাবে পশুদের মাঝে জলাতঙ্ক রোগের সংক্রমণ করানো। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে র‍্যাবিজ আক্রান্ত হিংস্র পাগলা কুকুরের মুখ থেকে লালা সংগ্রহ করে সেটা দিয়ে খরগোশ বা কুকুরকে আক্রান্ত করার চেষ্টা করে দেখা গেল এই পদ্ধতিটা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তা ছাড়া, সেটি ছিল খুব সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার। একটা পশুর মাঝে রোগের উপসর্গ দেখা দিতে যদি মাসখানেক লেগে যায় তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা নিয়ে তো আর ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করা যায় না। দ্রুত আক্রান্ত করার একটা পদ্ধতি বের করতে হবে।

4.3 নং ছবি : র‍্যাবিজ ভাইরাস বহুদিন বিজ্ঞানীদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

লুই পাস্তুর চিন্তা করতে লাগলেন, রোগের উপসর্গ দেখে মনে হয় এটি স্নায়ুর রোগ, মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ আছে। জলাতঙ্ক আক্রান্ত পশুর লালা না নিয়ে যদি স্পাইনাল কর্ডের অংশবিশেষ সরাসরি পশুর মস্তিষ্কে ইনজেশান দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় তাহলে কী হয়? যেরকম চিন্তা সেরকম কাজ এবং লুই পাস্তুর আবিষ্কার করলেন তার ধারণা সত্যি। সরাসরি পশুর মস্তিষ্কে ইনজেকশান দিয়ে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে দ্রুত তিনি পশুকে র‍্যাবিজ রোগে আক্রান্ত করিয়ে দিতে পারছেন। এখন তিনি গবেষণার পরের ধাপে পা দিতে পারেন, রোগের কারণটিকে আলাদা করে বের করা।

এখানে এসে তিনি যেন এক শক্ত পাথরের দেয়ালের মাঝে ধাক্কা খেলেন। কিছুতেই এই অদৃশ্য কারণকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। একটা ব্যাক্টেরিয়াকে কৃত্রিম পুষ্টি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়, বংশবৃদ্ধি বা কালচার করা যায় কিন্তু এই অদৃশ্য পরজীবী প্রাণটিকে কোনোভাবেই ল্যাবরেটরির টেস্টটিউবে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। লুই পাস্তুর আবার খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো ভাবলেন যদি তাকে কৃত্রিম অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা না-ই যায়— তাকে তাহলে জীবন্ত কোথাও বাঁচিয়ে রাখা হোক। সেই জীবন্ত অংশটুকু হলো খরগোশের মস্তিষ্ক। আবার লুই পাস্তুরের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো, খরগোশের মস্তিষ্কে এই অদৃশ্য জীবাণু শুধু বেঁচে থাকে না আরও ভয়ংকর আরও সর্বনাশী হয়ে উঠে, ছয়দিনের মাঝে এই রোগ তার সর্বগ্রাসী উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয়।

লুই পাস্তুর এখন গবেষণার শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছেন, এমন একটা প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা যেটা দিয়ে এই রোগের প্রতিষেধক বের করা যায়। একদিন ল্যাবরেটরিতে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ করে দেখলেন তার একজন সহকারী জলাতঙ্ক আক্রান্ত একটা খরগোশের স্পাইনাল কর্ড কাচের ফ্লাস্কে ঝুলিয়ে রেখেছেন, কতদিন এই ভয়ঙ্কর জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে সেটাই হচ্ছে পরীক্ষার উদ্দেশ্য। লুই পাস্তুর কাচের ফ্লাস্কের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন, কিছুদিন আগেই মোরগের কলেরা রোগের ব্যাক্টেরিয়াকে অক্সিজেন দিয়ে দুর্বল করে ভ্যাক্সিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানেও সেটি কি করা যায় না? যে অদৃশ্য জীবাণুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু যার অস্তিত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই সেটাকে কী দুর্বল করে এর প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক বিজ্ঞানী তখন কাজে লেগে গেলেন। খরগোশের স্পাইনাল কর্ডে বেঁচে থাকা জীবাণুকে অক্সিজেন দিয়ে দুর্বল করতে লাগলেন। প্রতিদিন সেখান থেকে একটা অংশ নিয়ে সেটাকে গুঁড়ো করে সুস্থ খরগোশের মাথার ইনজেকশন দিতে শুরু করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই দিন যেতে লাগল এই ভয়ংকর জীবাণু ততই দুর্বল হতে শুরু করল, বারোদিন পর জীবাণু এত দুর্বল হয়ে গেল যে, সেটা সুস্থ প্রাণীকে সংক্রমণ করতেই পারল না!

এখন আসল পরীক্ষাটি বাকী, এই প্রক্রিয়ায় সত্যিই কি জলাতঙ্কের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব? লুই পাস্তুর পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। একটা কুকুরের মস্তিষ্কে প্রথমে বারো দিনের দুর্বল জীবাণু প্রবেশ করানো হলো। তারপর দিন এগারো দিনের জীবাণু তারপর দিন দশ দিনের জীবাণু। এভাবে প্রত্যেক দিনই আগের থেকে একটু বেশি ভয়ংকর জীবাণু কুকুরের মস্তিষ্কে ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। বারো দিনের দিন একেবারে খাঁটি টগবগে জীবাণু কুকুরের মস্তিষ্কে ইনজেকশন দেয়া হলো কিন্তু এতদিনে কুকুরটির দেহে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক তৈরি হয়ে গেছে। এই ভয়ংকর জীবাণু নিয়েও সেটি বহাল তবিয়তে বেঁচে রইল। লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক বের করেছেন তবে মানুষের জন্যে নয় পশুর জন্যে।

4.4 নং ছবি : জোসেফ মাইস্টার, র‍্যাবিজ ভাইরাস আক্রান্ত যে শিশুটির প্রাণ প্রথমবারের মতো রক্ষা করেছিলেন লুই পাস্তুর।

ঠিক এ-রকম সময়ে নয় বছরের জোসেফ মাইস্টারকে নিয়ে তার মা এলেন লুই পাস্তুরের কাছে, আকুল হয়ে লুই পাস্তুরকে বললেন তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে। লুই পাস্তুর খুব চিন্তার মাঝে পড়ে গেলেন, নয় বছরের এই বাচ্চাটির শরীরে নিশ্চিতভাবেই জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু ঢুকে গেছে, একজনের শরীরে জীবাণু ঢোকার পর তার শরীরে কী প্রতিষেধক তৈরি করা যাবে? যে প্রক্রিয়া কখনো কোনো মানুষের শরীরে পরীক্ষা করা হয় নি সেটি কি একটা শিশুর শরীরে পরীক্ষা করা যায়?

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি পরীক্ষাটি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে দুই সপ্তাহ পুরানো জীবাণু তারপর তেরো দিনের তারপর বারো দিনের। এভাবে যতই দিন যেতে লাগল ততই আগ্রাসী জীবাণু বাচ্চাটির শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। একেবারে শেষ দিন তার শরীরে জলাতঙ্ক রোগের যে জীবাণু ঢোকানো হলো সেটি অন্য যে কোনো পশু বা মানুষকে এক সপ্তাহের মাঝে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে! সেই সময়টা সম্ভবত ছিল লুই পাস্তুরের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়— তিনি খেতে পারেন না, ঘুমাতে পারেন না। লুই পাস্তুরের মাথায় শুধু একটা চিন্তা ছেলেটি কি বাঁচবে না মারা যাবে?

ছেলেটি মারা যায় নি। লুই পাস্তুরের চিকিৎসায় পৃথিবীর প্রথম জলাতঙ্ক রোগীটি বেঁচে উঠল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে লুই পাস্তুরের এই অবিস্মরণীয় অবদানটি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোসেফ মাইস্টার তার প্রাণ বাঁচানোর কারণে সারা জীবন লুই পাস্তুরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। সে বড় হয়ে লুই পাস্তুরের ল্যাবরেটরির দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব নিয়েছিল। নাৎসি জার্মানি যখন ফ্রান্স দখল করে নেয় তখন নাৎসি বাহিনী লুই পাস্তুরের ল্যাবরেটরি দখল করতে আসে। জোসেফ মাইস্টার গেটের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে ল্যাবরেটরি রক্ষা করার চেষ্টা করে।

জার্মান সেনাবাহিনীর গুলিতে জোসেফ মাইস্টারের মৃত্যু হওয়ার আগে সে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5. একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা

1992 সালের 31 অক্টোবর, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলিওকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। সবাই নিশ্চয়ই এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইবে গ্যালিলিও একজন বিজ্ঞানী মানুষ, তিনি কী এমন অপরাধ করেছিলেন যে ক্যাথলিক চার্চের তাকে শাস্তি দিতে হয়েছিল? আর শাস্তি যদি দিয়েই থাকে তা হলে তাকে ক্ষমা করার প্রয়োজনটাই কী? আর ক্ষমা যদি করতেই হয় তাহলে তার জন্যে সাড়ে তিনশত বৎসর অপেক্ষা করতে হলো কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরগুলোও প্রশ্নের মতোই চমকপ্রদ। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছিলেন পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যকে ঘিরে ঘুরে, ক্যাথলিক চার্চের মনে হয়েছিল সেটা বাইবেল বিরোধী বক্তব্য এবং সেজন্যে তারা গ্যালিলিওকে শাস্তি দিয়েছিল!

এখন আমরা খুব সহজেই স্বীকার করে নিই যে— পৃথিবীটা চ্যাপ্টা নয়, পৃথিবীটা গোল। যদিও দেখে মনে হয় চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা পূর্বদিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়— আসলে সে-রকম কিছু ঘটে না, পৃথিবীটা নিজ অক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে আমাদের সে-রকম মনে হয়। শুধু তাই নয় যদিও আমরা দেখছি পৃথিবীটা স্থির সূর্যটাই উঠছে এবং নামছে আসলে সেটা সত্যি নয়। বিশাল সূর্যটাকে ঘিরেই ছোট পৃথিবীটা ঘুরছে। কিন্তু একসময় সেটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাও একটা ভয়ংকর রকমের অপরাধ ছিল।

আসলে ঝামেলেটি পাকিয়ে রেখেছিলেন অ্যারিস্টটল এবং টলেমির মতো দার্শনিক আর গণিতবিদরা। তারা বিশ্বাস করতেন পৃথিবীটাই সবকিছুর কেন্দ্র এবং সবকিছুই পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। তারা সেই সময় এত মহাজ্ঞানী ছিলেন যে, কেউ তাদের মতবাদকে অবিশ্বাস করেন নি। মোটামুটি সেই সময়েই অ্যারিস্টকাস নামে একজন অ্যারিস্টটল এবং টলেমির মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে কিন্তু কেউ তার কথাটাকে এতটুকু গুরুত্ব দেয় নি।

অ্যারিস্টটল আর টলেমির ভুল ধারণা পৃথিবীর মানুষ প্রায় আঠারোশত বৎসর পর্যন্ত বিশ্বাস করে বসেছিল। টলেমির ব্যাখ্যাটি ছিল জটিল, যারা আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5.1 নং ছবি : টলেমি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে সূর্য এবং অন্যসব গ্রহ-নক্ষত্র তার চার পাশে ঘুরে।

করেন তাদের কাছে গ্রহগুলোর গতিবিধি ব্যাখ্যা করাটি ছিল সবচেয়ে কষ্টকর। এই ভুল ধারণাটি প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন কোপার্নিকাস। তিনি দেখালেন যদি পৃথিবীর বদলে সূর্যকে কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দেয়া যায় তাহলে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ব্যাখ্যা করা হয়ে যায় একেবারে পানির মতো সহজ। সবকিছু ব্যাখ্যা করে কোপার্নিকাস তার বইটি লিখেছিলেন 1530 সালে কিন্তু সেই বইটি প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অনেক ভয়ে ভয়ে বইটি ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয় 1543 সালে! কথিত আছে বইটি যখন কোপার্নিকাসের কাছে আনা হয় তখন তিনি সংজ্ঞাহীন এবং মৃত্যুশয্যায়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বইটি প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, বইটির প্রকাশক কোপার্নিকাসের অনুমতি না নিয়েই বইয়ের ভূমিকায় লিখে দিয়েছেন যে এই বইয়ে যে বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি সত্যি নয়। গণনার সুবিধার জন্যে এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি, এর সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই! ধর্মযাজক এবং চার্চকে ভয় পেয়েই এই কাজটি করা হয়েছিল সেটি বলাই বাহুল্য। কোপার্নিকাসের এই জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারটি কিন্তু সবার চোখের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল দুটি কারণে— প্রথমত, বিষয়বস্তুটি এত অবিশ্বাস্য যে সেটা কেউই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয়ত, কোপার্নিকাস বইটি লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায় এবং ল্যাটিন তখন জানত খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। গ্যালিলিওর কারণে কোপার্নিকাসের মৃত্যুর 73 বছর পরে তার বইটির দিকে প্রথমে সবার নজর পড়ে এবং ক্যাথলিক চার্চ সাথে সাথে 1616 সালে বইটাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। এই যুগে আমরা রাজনৈতিক কারণে বা অশ্লীলতার কারণে বইকে নিষিদ্ধ হতে দেখেছি কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করেছে বলে বই নিষিদ্ধ করার বিষয়টি তখন এমন কিছু বিস্ময়কর ছিল না।

গ্যালিলিওর জন্ম হয় 1558 সালে এবং মৃত্যু হয় 1642 সালে— যে বৎসর নিউটনের জন্ম হয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে যারা গড়ে তুলেছিলেন তাদের মাঝে গ্যালিলিও ছিলেন অন্যতম। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সাথে সাথে তার জ্যোতির্বিজ্ঞানেও খুব আগ্রহ ছিল। তখন টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এর গুরুত্বটি কেউ ধরতে পারে নি, দূরের জিনিসকে কাছে দেখার একটা মজার খেলনা ছাড়া এর আর কোনো গুরুত্ব ছিল না। গ্যালিলিও যখন জানতে পারলেন টেলিস্কোপ বলে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে যেটা দিয়ে

5.2 নং ছবি : টলেমির সৌরজগৎটা ছিল অসম্ভব জটিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5.3 নং ছবি : কোপার্নিকাসের সৌরজগৎটি ছিল সহজ এবং সুন্দর।

দূরের জিনিস কাছে দেখা যায় তখনই তিনি বুঝে গেলেন ওটার সত্যিকার ব্যবহার কী হতে পারে। অনেক খাটাখাটুনি করে তিনি একটা টেলিস্কোপ তৈরি করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখা শুরু করলেন। তিনি চাঁদের খানাখন্দ দেখলেন, বৃহস্পতির চাঁদ দেখলেন, শুক্রের কলা দেখলেন, এমনকি সূর্যের কলঙ্কও দেখলেন। (গ্যালিলিও তখন জানতেন না সূর্যের দিকে সরাসরি তাকানো যায় না, সূর্যের আলোতে খালি চোখে দেখা যায় না সে রকম অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। তাই সূর্য পর্যবেক্ষণের কারণে জীবনের শেষভাবে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।) টেলিস্কোপকে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তিনি যে সব জিনিস দেখেছেন সেগুলো নিয়ে তিনি 1610 সালে একটা বই লিখলেন। এই বইটিতে আসলে কোপার্নিকাসের মতবাদকে সমর্থন করা হয়েছিল এবং এতদিন যে কোপার্নিকাসের কথা কেউ জানত না, গ্যালিলিওর কারণে সেটি সবাই জানতে পারল। যার পরিণাম হলো ভয়াবহ। কোপার্নিকাসের বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং গ্যালিলিওকে বলা হলো তিনি যেন এইসব মতবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।

5.4 নং ছবি : গ্যালেলিওর কারণে কোপার্নিকাসের মতবাদটি প্রথমবারের মতো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সেই যুগে ওরকম একটা বই লেখা ছিল খুব সাহসের কাজ। তিনি যখন তার বইটি প্রকাশ করেছেন তার মাত্র দশ বৎসর আগে জিওর্দানো ব্রুনো নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ব্রুনোর অপরাধ তিনি কোপার্নিকাসের মতবাদ বিশ্বাস করতেন। ব্রুনোকে তার বিশ্বাসের জন্যে প্রথমে আট বৎসর জেলে আটকে রাখা হয়েছিল এবং পুড়িয়ে মারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রুনোকে চাপ দেয়া হয়েছিল তিনি যেন কোপার্নিকাসের মতবাদকে ত্যাগ করে বাইবেলের মতবাদে ফিরে আসেন। ব্রুনো রাজি হন নি। শুধু যে রাজি হন নি তা-ই নয় বিচারকদের দিকে তাকিয়ে শ্লেষভরে বলেছিলেন, "বিচারক মহোদয়রা আমাকে শাস্তি দেয়ায় আমি যেটুকু ভয় পাচ্ছি আপনারা মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছেন!" (গ্যালেলিওকে ক্ষমা করলেও ব্রুনোকে কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ এখনও ক্ষমা করে নি!)

এ-রকম একটা পরিবেশে কোপার্নিসাকের মতবাদ প্রচার করা খুব সাহসের ব্যাপার। তবে চার্চ নিষেধ করে দেয়ার কারণে গ্যালিলিও কয়েক বছর একটু চুপচাপ থাকলেন। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5.5 নং ছবি : কোপার্নিকাসের মতবাদ বিশ্বাস করতেন বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

তার এক পুরানো বন্ধু পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন, গ্যালিলিও ভাবলেন এটাই তার সুযোগ। তিনি তখন আরেকটা বই লিখলেন, বইটি তিনজন মানুষের কথোপকথন হিসেবে লেখা, একজন টলেমির মতবাদ বিশ্বাস করে (পৃথিবী হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র), আরেকজন কোপার্নিকাসের মতবাদ বিশ্বাস করে (সূর্য হচ্ছে সৌর জগতের কেন্দ্র) এবং তৃতীয় জন একজন নিরপেক্ষ মানুষ। (আমাদের সৌভাগ্য আজকাল বিজ্ঞানের বই এভাবে আলাপচারিতা হিসেবে লিখতে হয় না। যেটা সত্যি সেটা কাটখোট্টা ভাষায় লিখলেও জার্নালগুলো ছাপিয়ে দেয়।) গ্যালিলিওর এই বইটি লেখা হয় ইতালীয় ভাষায়, বইয়ে কোপার্নিকাসের সমর্থকের তুখোড় যুক্তির কাছে টলেমির সমর্থক বারবার অপদস্ত হয় এবং এই বইটির কারণে গ্যালিলিও ধর্মযাজকদের বিষ নজরে পড়লেন।

1633 সালে ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ধর্মোদ্রোহিতার অভিযোগ দিয়ে ডেকে পাঠাল। গ্যালিলিও তখন বৃদ্ধ, প্রায় অন্ধ। এই বৃদ্ধ জ্ঞান তাপসকে তিনদিন একটি টর্চার সেলে অত্যাচার করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত হাঁটু ভেঙে জোড় হাতে মাথা নিচু করে তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। পোপ এবং ধর্মযাজকদের সামনে তিনি যে লিখিত বক্তব্য পড়েন সেটি ছিল এরকম:

"আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বার্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি, সশরীরে বিচারের জন্যে এসেছি এবং বিখ্যাত ও সম্মানিত ধর্মযাজক এবং ধর্মবিরুদ্ধ আচরণের অপরাধে অপরাধী হয়ে বিচারকদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ করেছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান এবং প্রচার করা হয়েছে আমি তা বিশ্বাস করি, আগেও করেছি, ভবিষ্যতেও করব।

আমাকে বলা হয়েছিল সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল এই মতবাদটি মিথ্যা এবং ধর্মগ্রন্থ বিরোধী, আমাকে এই মতবাদ সমর্থন এবং প্রচার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছিল।

5.6 নং ছবি : ক্যাথলিক চার্চ 1633 সালে ধর্মোদ্রহিতার জন্যে গ্যালেলিওর বিচার করে। তার অপরাধ তিনি কোপার্নিকাসের দেয়া সৌরজগতের মতবাদটি বিশ্বাস করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরেও আমি এই মতবাদকে সমর্থন করে একটি বই লিখেছিলাম এবং সঙ্গত কারণেই সাধারণের মনে সন্দেহ হতে পারে আমি খ্রিস্টধর্ম বিরোধী। সকলের মন থেকে সন্দেহ দূর করার জন্যে আমি শপথ করে বলছি যে এই ভুল, মিথ্যা এবং ধর্মবিরুদ্ধ মত ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছি। আমি আরও শপথ করে বলছি যে, এ ধরনের বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলব না। শপথ নিয়ে আরও প্রতিজ্ঞা করছি আমাকে প্রায়শ্চিত্যের জন্যে যে নির্দেশ দেয়া হবে আমি সেটা হুবহু পালন করব। আমি যদি এই শপথ আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহলে আমার জন্যে যে সব নির্যাতন এবং শাস্তির ব্যবস্থা আছে আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করব।"

পৃথিবীর ইতিহাসে একজন বিজ্ঞানী এবং তার বিজ্ঞানচর্চার উপর ধর্মীয় মৌলবাদের এর চাইতে বড় নির্যাতনের আর কোনো উদাহরণ আছে বলে জানা নেই। ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলিওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। তবে তার বয়স, স্বাস্থ্য এসবের কথা বিবেচনা করে আমৃত্যু নিজের ঘরে আটকে রাখা হয়। তার বইটিও নিষিদ্ধ ঘোষণার করা হয় এবং 1835 সালের আগে সেই বইটি আর নূতন করে ছাপা হয় নি। শুধু তাই নয় গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর তাকে মর্যাদার সাথে সমাহিত না করে খুব সাদাসিধেভাবে কবর দেয়া হয়।

মহামতি গ্যালিলিও গ্যালিলির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল সেটি বুঝতে ক্যাথলিক চার্চের সময় লেগেছিল মাত্র সাড়ে তিনশত বৎসর। পৃথিবীর কত বড় বড় মনীষীর হাঁটুর সমান মেধা নিয়ে শুধুমাত্র ধর্মের লেবাস পরে তাদের উপর নিপীড়ন করার উদাহরণ শুধু যে ক্যাথলিক চার্চে ছিল তা নয় অন্য ধর্মেও ছিল। শুধু যে অতীতে ছিল তাই নয় এখনও আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

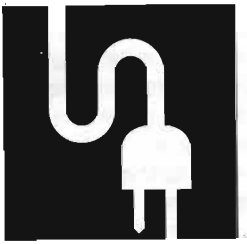

6. তথ্যপ্রযুক্তি

ছয় সাত বছর আগের কথা। আমি যুক্তরাষ্ট্রের বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে একটা সার্কিট ডিজাইন করছি। সেখানে একটা আই.সি. ব্যবহার করব তাই আই.সি.-টার কোন পিন কোন কাজ করে জানা দরকার হয়ে পড়ল। আই.সি.র সেই তথ্যগুলো যে মোটা বইটাতে আছে সেটা আমার ঘরে শেলফের উপরের র‍্যাকে। আমি দাঁড়িয়ে বইটি শেলফ থেকে নামিয়ে সেটা খুলে আই.সি.টার তথ্যগুলো পেয়ে যেতে পারি কিন্তু আমি সেটি না করে অনেকটা অন্যমনস্কভাবে আমার সামনে রাখা কম্পিউটারে কিছু অক্ষর টাইপ করলাম। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আই.সি.টার পিন আউট সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি ডাইনলোড করে নিলাম। সার্কিট ডিজাইনে সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করার সময় আমি হঠাৎ একটু চমকে উঠে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কী করেছি? তথ্যটি আমার নাগালের ভেতরে, উঠে দাঁড়ালেই নেয়া যায় সেই তথ্যটি সেখান থেকে না নিয়ে আমি নিয়েছি হাজার হাজার মাইল দূরের কোনো এক সার্ভার থেকে? হাতের কাছে রাখা একটি বই থেকে তথ্য নেয়া আর কয়েক হাজার মাইল দূরের কোনো এক কোম্পানির সার্ভারের তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য নেয়া এখন একই ব্যাপার?

বলা যেতে পারে, এই ছোট ঘটনাটির পর আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিলাম যে— আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা সভ্যতার একটি নূতন ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি। তথ্যপ্রযুক্তি নামে যে কথাটি শুনতে শুনতে আমাদের সবার কানের পোকা নড়ে যাবার অবস্থা— সত্যিই সেটি এসেছে এবং বলা যেতে পারে বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষকে কোনো-না-কোনোভাবে স্পর্শ করছে।

তথ্যপ্রযুক্তি নামে পৃথিবীব্যাপী একটি নূতন ধরনের "বিপ্লব" এর পিছনে রয়েছে একটি যন্ত্র এবং এই যন্ত্রটির নাম কম্পিউটার। শুধু কম্পিউটারের কারণে এই বিপ্লবটি হয় নি, তার সাথে আরো যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়েছে, তবে কম্পিউটার বিষয়টি না থাকলে এটি ঘটতো না। কম্পিউটার নামটি এক সময় সম্ভবত যথাযথ ছিল কারণ এটি প্রথমে দাঁড়া করানো হয়েছিল হিসেব করার (comput) জন্যে। এখন এই যন্ত্রের এই নামটি আর যথাযথ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

6.1 নং ছবি : তথ্যপ্রযুক্তি নামে পৃথিবীতে যে নূতন একটি বিপ্লব ঘটে চলেছে তার পিছনে রয়েছে যে যন্ত্রটি তার নাম কম্পিউটার।

কম্পিউটারের খুঁটিনাটির ভেতরে না গিয়ে বলা যায় এটি হচ্ছে একটা সহায়ক যন্ত্র (tool) বা টুল। স্ক্রু ড্রাইভার একটা টুল যেটা দিয়ে কোনো জায়গায় স্ক্রু লাগানো যায় বা স্ক্রু তুলে ফেলা যায়। স্ক্রু ড্রাইভার ছাড়া স্ক্রু লাগানো বা তোলা খুব কঠিন, ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়— স্ক্রু তোলা বা লাগানো ছাড়া স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে অন্য কোনো কাজ করা যায় না। এটা হচ্ছে টুলের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ একটা কাজ করার জন্যে সেটা তৈরি হয় এবং সেই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ সেটা করতে পারে না। সেই হিসেবে ঝাঁটা একটা টুল, চামচ একটা টুল। ঝাঁটার কাজ চামচ দিয়ে করা যাবে না, সে-রকম চামচের কাজও ঝাঁটা দিয়ে করা যাবে না।

কম্পিউটার হচ্ছে একমাত্র টুল যেটা একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যে তৈরি হয় নি। এটা দিয়ে কী কাজ করা যেতে পারে সেটা নির্ভর করে একজনের সৃজনশীতার উপরে। বলা হয়ে থাকে মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে ছোট্ট যন্ত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছে সেটি হচ্ছে ভয়েজার 1 এবং 2 মহাকাশযান। পৃথিবী থেকে 1977 সালে শুরু করে সেটি একটি একটি গ্রহের পাশে দিয়ে গিয়েছে এবং সেই গ্রহটির পাশে দিয়ে যাবার সময় তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ভয়েজার 1 এবং 2-এর পুরো নিয়ন্ত্রণে ছিল একটা কম্পিউটার, 1977-এর প্রযুক্তিতে সে-সময় যে কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছিল সেটি বর্তমান কম্পিউটারের তুলনায় একটি হাস্যকর খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই হাস্যকর খেলনা জাতীয় কম্পিউটারটি ভয়েজার 1 এবং 2 কে নিখুঁতভাবে গ্রহমণ্ডলীর ভেতর দিয়ে নিয়ে সৌরজগতের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই উদাহরণটি হচ্ছে সম্ভবতঃ কম্পিউটারের ব্যবহারের একটি সুন্দর উদাহরণ।

খারাপ উদাহরণও আছে, কম্পিউটার ব্যবহার করে পৃথিবীতে আজকাল বড় বড় অপরাধ করা শুরু হয়েছে। ইলেকট্রনিক অর্থ বিনিময় শুরু হবার সাথে সাথে নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়ার প্রচলন হয়েছে। সংখ্যাটি যত বড় তার নিরাপত্তা তত বেশি। তবে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার জন্যে বিশাল সংখ্যা এক ধরনের যন্ত্রণার মতো তাই সেই (PIN) নম্বরগুলো খুব বড় নয়। সাধারণভাবে সেটি অনুমান করা সহজ নয়, তাই অপরাধীরা কম্পিউটারকে বসিয়ে দেয় সেই নম্বরগুলোকে খুঁজে বের করতে। একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

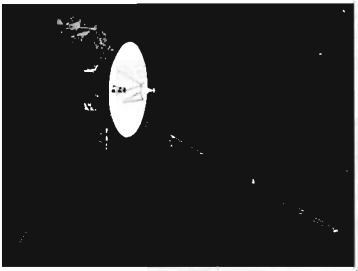

6.2 নং ছবি : ভয়েজার 1 এবং 2 মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট যন্ত্র হিসেবে সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করার গৌরব অর্জন করতে পারে।

মানুষের পক্ষে যেটা অসম্ভব একটা কম্পিউটারের জন্যে সেটা ছেলে-খেলা। তাই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সেই গোপন নম্বর বের করে কোটি কোটি ডলার চুরি করা হচ্ছে! এটি হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহার করে অপকর্ম করার একটি উদাহরণ!

কম্পিউটার ব্যবহারের প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে এই দুটি উদাহরণের ভেতরে বাইরে আরো অসংখ্য উদাহরণ। এর শেষ কোথায় হবে সেটি অনুমান করা কঠিন, অনুমান করা যায় মানুষের সৃজনশীলতাই শুধু মাত্র এর শেষ খুঁজে বের করতে পারবে। তাই একটি সহায়ক যন্ত্র বা টুল হয়েও কম্পিউটার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভাগ খোলা হয়, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী সেটি নিয়ে পড়াশোনা করে। বিজ্ঞানী আর গবেষকরা তার উন্নতির জন্যে শ্রম দেন, ব্যবসায়ীরা সেটা ব্যবহার করে ব্যবসা করেন এবং সারা পৃথিবীর মানুষ সভ্যতাকে একটা নূতন পর্যায়ে হাজির হতে দেখেন।

কোনো রকম খুঁটিনাটিতে না গিয়ে আমরা যদি কম্পিউটারকে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে বলা যায় এর দুটি অংশ: একটি হচ্ছে প্রসেসর অন্যটি মেমোরি। প্রসেসরে হিসেব-নিকেশ করা হয়, মেমোরিতে তথ্যগুলোকে সাময়িকভাবে রাখা যায়। প্রথম কম্পিউটার তৈরি হবার পর যতদিন যাচ্ছে ততই একদিকে প্রসেসরের উন্নতি হচ্ছে অন্যদিকে একটি প্রসেসরের সাথে অনেক বেশি মেমোরি যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার কারণে সুফলটা সরাসরি ভোগ করছে কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রতি কয়েক বছরেই কম্পিউটারের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অন্য কোনো ক্ষেত্রে এরকম উন্নতি দেখা গিয়েছে কেউ দাবি করতে পারবে না।

এই বিষয়টি মানুষকে হঠাৎ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের কর্মপদ্ধতি এক নয়। কম্পিউটার কাজ করে ডিজিটাল সিগনাল দিয়ে, এখানে প্রসেসর আর মেমোরি দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। মানুষের মস্তিষ্কের সংযোগকে বলা হয় নিউরাল সংযোগ, সেখানে প্রসেসর আর মেমোরী একই জায়গায়। তারপরেও বিজ্ঞানীরা হিসেব করে মানব মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করেন এবং আমাদের পরিচিত কম্পিউটারকে মানুষের মস্তিষ্কের সমান ক্ষমতায় পৌঁছুতে কতদিন লাগতে পারে সেটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে থাকেন। কম্পিউটারের ক্ষমতা যে হারে বাড়ছে সেটি দেখে অনুমান করা হয় আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই সে ধরনের একটি কম্পিউটার দেখতে পাব। তারপরের প্রশ্নটি গুরুতর, সত্যি সত্যি যদি সে-রকম কিছু তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায় তাহলে কী সেখানে মানুষের ভাবনা-চিন্তা বা অস্তিত্বের একটা বীজ বপন করা যাবে? বিজ্ঞানীরা সে ব্যাপারে এখনো দ্বিধাভিভক্ত। কেউ কেউ বলেন যাবে, কেউ কেউ বলেন যাবে না! আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ বংশধর হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

6.3 নং ছবি : ভয়েজার থেকে তোলা শনিগ্রহ এবং তার উপগ্রহদের ছবি।

AMARBOI.COM

তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ভূমিকা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন নেই। কম্পিউটার বলতেই আমাদের চোখের সামনে যে মনিটর, কী বোর্ড বা সি.পি.ইউ এর ছবি ভেসে উঠে সেটা তার একমাত্র রূপ নয়। ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে গাড়ি জাহাজ বা প্লেন প্রযুক্তির এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে এটি জায়গা করে নেয় নি। যে বিষয়টি একসময় প্রায় অসম্ভব একটি বিষয় ছিল এখন সেটি সহজ একটি ব্যাপার। পৃথিবীর সকল কম্পিউটারকে যুক্ত করে কম্পিউটারের একটা বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে অনেক কিছু করা সম্ভব তার সব আমরা এখনো দেখি নি। যেটি দেখে আমরা সবাই অভ্যস্ত সেটাকে ইন্টারনেট বলি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা নূতন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে কয়েকটি বিষয়কে বলতে হলে ইন্টারনেট হবে তার একটি। ইন্টারনেট তার প্রাথমিক নতুনত্বের উত্তেজনার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, আগামী দশকের ভেতর তার নতুনত্বটুকু ফুরিয়ে যাবার পর আমরা যে তার স্থায়ী ভূমিকাটি দেখতে পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানবসভ্যতায় সেটি কী অবদান রাখবে সেটি দেখার জন্য পৃথিবীর মানুষ কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে।

পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা পৃথিবীর সকল মানুষের সমান অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করে গেছেন। আমরা ধারণা তারা যদি এখন পৃথিবীতে ফিরে আসতেন তাহলে ইন্টারনেট দেখে খানিকটা সান্ত্বনা পেতেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা, অনেক রাষ্ট্রনায়ক, অনেক দার্শনিক যেটি করতে পারেন নি পৃথিবীর বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা সেটা করে ফেলেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী মানুষের কাছে এখন যে তথ্যভাণ্ডার পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে সাধারণ মানুষের কাছেও এখন সেই তথ্যভাণ্ডার। পৃথিবীর খুব সাধারণ একজন মানুষও এখন তার প্রতিবাদ, তার ক্ষোভ বা আনন্দকে এখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে দিতে পারে। পৃথিবীর মানুষের এত ক্ষমতার কথা কি কেউ কখনও চিন্তা করেছিল?

নূতন কিছু নিয়ে উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক বিষয়। তথ্য প্রযুক্তি নিয়েও সেটা হয়েছে। ভোগবাদী মানুষ এর সাথে জড়িত। অর্থবিত্তকে নিয়ে প্রয়োজন থেকে বেশি মাথা ঘামিয়েছে। যে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদেরা এটাকে গড়ে তুলেছে তাদেরকে যথাযথ সম্মান না দিয়ে যারা এটাকে নিয়ে ব্যবসা করেছে সে-রকম মানুষকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছে। কিন্তু এই সকল উচ্ছ্বাস একসময় কমে আসবে, চোখ ধাঁধানো অর্থবিত্তের কুয়াশা কেটে যাবার পর আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সত্যিকার রূপটি দেখতে পাব। সেটা দেখার জন্যেই পৃথিবীর অনেক মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

সেটি কী কেউ জানে না। আমার ধারণা সেই ভূমিকাটি হবে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে তার অবদানটুকু পৃথিবীর ইতিহাস সেটি আগে কখনো ঘটে নি। অজানাকে জানার জন্যে মানুষের হাতে এখন যে বিশাল অস্ত্র আছে তার কথা কী কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেছিল?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

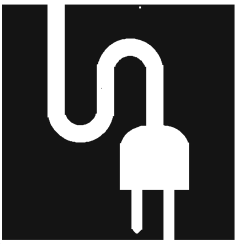

7. ফাইবার অপটিক্স

"ফাইবার অপটিক্স" বিষয়টি কী ভালোভাবে না জানলেও আমাদের দেশের মানুষ "ফাইবার অপটিক্স" কথাটির সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহের মূলধারার সাথে বহুদিন আগে যোগাযোগ করে ফেলেছে, সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবহার করে সেই যোগাযোগটি করতে আমদের বহুকাল লেগে গেছে। যখন বিষয়টি খুব সহজ ছিল তখন সরকারি নির্বুদ্ধিতার কারণে সেটা নেয়া হয় নি। গত এক দশক থেকে দেশের মানুষের চাপে সরকার "নিচ্ছি" "নেবো" করছে, শুনে শুনে আমরা কখনো ক্লান্ত, কখনো হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই যোগাযোগটি হয়েছে এখনো সেটি বিশ্বাস হতে চায় না। আমাদের দেশের ইন্টারনেট যোগাযোগ হতো ভিস্যাট দিয়ে। সারা দেশে হয়তো শ খানেক ভিস্যাট ছিল অথচ এখন একটি অপটিক্যাল ফাইবার দিয়েই লাখ খানেক ভিস্যাটের সমান তথ্যবিনিময় করা যেতে পারে, তাই আমরা সবাই যে ফাইবার অপটিক্স নিয়ে একটু অস্থির হয়েছিলাম তাতে অবাক হবার কী আছে?

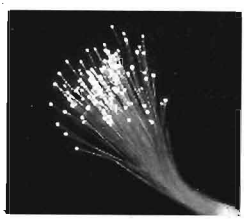

7.1 নং ছবি : কাচের অত্যন্ত সূক্ষ তন্তু বা ফাইবার দিয়ে আলো পাঠানো হয়।

ফাইবার শব্দটির অর্থ তন্তু এবং অপটিক্স হচ্ছে আলোসংক্রান্ত বিজ্ঞান, কাজেই ফাইবার অপটিক্স কথাটি দিয়ে কোনো সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে আলো আনা নেয়ার বিজ্ঞানকে বোঝানোর কথা। তবে সাধারণ অর্থে আমরা ফাইবার অপটিক্স বলতে কাচের সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে তথ্য পাঠানোর প্রযুক্তিটিকে বুঝিয়ে থাকি। তথ্য আদান-প্রদানের অন্যান্য পদ্ধতি থেকে এটা ভিন্ন কারণ এখানে সেই কাজটি করার জন্যে আলো ব্যবহার করা হয়।

আলো ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাত্র কিছুদিন আগে এক রাতের ট্রেনে আমি একজন স্মাগলারকে দেখেছি, সে তার হাতের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে এবং নিভিয়ে তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের একটা সংবাদ দিল! ফাইবার অপটিক্স ব্যবহার করে তথ্য পাঠানোর মূল বিষয়টা অনেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেরকম— আলো জ্বালিয়ে এবং নিভিয়ে তথ্য পাঠানো। তবে সেটা করা হয় অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। স্মাগলার যেখানে তার আলোটা সেকেন্ডে একবার জ্বালাতে বা নেভাতে পারে ফাইবার অপটিক্সের লেজার রশ্মি সেটা করে সেকেন্ডে হাজার কোটি বার থেকে বেশি (দশ বিলিওন)! স্মাগলারের টর্চ লাইটের আলো যায় সোজা, সামনে দেয়াল থাকলে সেই আলো আটকে যায়, দেয়াল ভেদ করে যেতে পারে না। ফাইবার অপটিক্সে সেটা যায় সূক্ষ্ম কাচের তন্তু দিয়ে, সেই কাচের তন্তু দেয়ালে ঘরবাড়ি এমনকি সমুদ্র মহাসমুদ্র পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে।

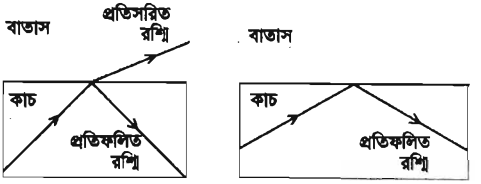

7.2 নং ছবি : ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে পারে।

তথ্য পাঠানোর এই প্রক্রিয়ায় যে সূক্ষ্ম কাচের তন্তু ব্যবহার করা হয় তাকে বলে অপটিক্যাল ফাইবার। যে বিজ্ঞানী প্রথম অনুমান করেছিলেন তথ্য পাঠানোর জন্যে কাচের তন্তু বা অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা যেতে পারে নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। জানালার বা ছবির ফ্রেমে কাচ দেখে আমরা ধারণা করেছি কাচ একটি স্বচ্ছ জিনিস, সেটি স্বচ্ছ তার কারণ কাচটি পাতলা। আমরা যদি কাচের একটা গুণ নিই তাহলে আবিষ্কার করব কাচ আসলে তেমন স্বচ্ছ নয়। সাধারণ কাচের ভেতর দিয়ে আলো পাঠালে মাত্র বিশ মিটার যেতে যেতেই তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ শোষিত হয়ে যায়। এ-রকম একটা জিনিস দিয়ে একদিন শত শত কিলোমিটার দূরে তথ্য পাঠানো যেতে পারে বিষয়টি আগে থেকে অনুমান করতে পারেন শুধু সত্যিকারের একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।

তথ্য পাঠানোর জন্যে কাচের স্বচ্ছতা বাড়ানোর কাজে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদরা কাজ শুরু করে একটা অভাবনীয় কাজ করে ফেললেন। তারা কাচকে এমনই স্বচ্ছ করে ফেললেন যে আলোর শতকরা নিরানব্বই ভাগ শোষিত হওয়ার জন্যে বিশ মিটার নয় এখন যেতে হয় দুইশ' কিলোমিটার! মানুষ কোন কিছুকে একগুণ বা দ্বিগুণ উন্নত করতে পারলেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। সেই হিসেবে এই উন্নতি হচ্ছে দশ হাজার গুণ! পৃথিবীর ইতিহাসে এ-রকম উদাহরণ খুব বেশি নেই।

কাচকে স্বচ্ছ করার পর তার ভেতর দিয়ে আলো পাঠানোর আগে আরো একটা প্রশ্ন এসে যায় সেটা হচ্ছে এই স্বচ্ছ কাচের ভেতর আলো আটকা থাকবে কেন? আলো তো সরল রেখায় যায় কাচের তন্তু একটু বাঁকা হলেই তো আলো কাচের দেয়ালে এসে আঘাত করে বের হয়ে যাবে। আলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হলে তাকে তো কাচের তন্তুর ভেতরে আটকে রাখতে হবে, সেটা করা হবে কেমন করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

7.3 নং ছবি : মাটির নিচে বা সমুদ্রের নিচে দিয়ে যে অপটিক্যাল ফাইবার নেয়া হয় তার ভেতরে বাইরে নানা আবারণ থাকে। মাঝখানে থাকে শক্ত স্টিলের পাত।

আসলে এই ব্যাপারটি খুব কঠিন নয়, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন নামে একটা প্রক্রিয়া এই কাজটিকে খুব সহজ করে দিয়েছে। বিষয়টি 7.2 নং ছবিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় আলো বেঁকে যায়। 7.2 নং ছবির প্রথম অংশে সেটা দেখানো হয়েছে কাচ এবং বাতাসের জন্যে। খানিকটা কাচ ভেদ করে বাতাসে চলে গেছে এবং খানিকটা প্রতিফলিত হয়ে কাচের ভেতরেই ফিরে এসেছে। এখন কোনোভাবে যদি আলোকরশ্মিটা আরো বাঁকা করে পাঠানো যায় তাহলে দেখা যাবে একটা নির্দিষ্ট কোণ থেকে বেশি হলে কোনো আলোই আর কাচ ভেদ করে বাতাসে যেতে পারছে না, পুরোটাই কাচের ভিতরে ফিরে আসছে। ঘন মাধ্যমে থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলো যখন বের হতে না পেরে পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে সেটাকে বলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। অপটিক্যাল ফাইবারে আলো আটকা পড়ে থাকে এই কারণে, অস্বাভাবিক স্বচ্ছ হওয়ার পরেও আলো বের হতে পারে না।

AMARBOI.COM

অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে ব্যবহার করার জন্যে সেটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা হয়। অনেকেই হয়তো জানে না যে অপটিক্যাল ফাইবার আসলে চুল থেকেও সূক্ষ্ম! এত সূক্ষ্ম কাচ অত্যন্ত ভঙ্গুর বলে তার উপরে প্লাস্টিকের একটা আবরণ থাকে এবং সে কারণে সেটাকে হয়তো সুতোর মতো মোটা দেখায়। তবে সেটাকে ব্যবহার করার জন্যে তার উপরে আরো নানারকম আবরণ দেয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা টেবিল ল্যাম্পের ইলেকট্রিক তারের মতো আকার নেয়। মাটির নিচে দিয়ে বা সমুদ্রের নিচে দিয়ে যে অপটিক্যাল ফাইবার নেয়া হয় সেগুলো অবশ্যি রীতিমতো রাক্ষুসে ক্যাবল। তার ভিতরে বাইরে নানা ধরনের আবরণ থাকে, পুরো ক্যাবলটাকে শক্ত করার জন্যে ভেতরে শক্ত স্টীলের পাত পর্যন্ত ঢুকিয়ে রাখা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাইবার অপটিক্সে যে কাচের তন্তু ব্যবহার করা হয় তার দুটি অংশ। ভেতরের অংশটি কোর বা কেন্দ্র এবং বাইরের অংশটি ক্ল্যাড বা বহিরাচ্ছাদন। আলো যেন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে অপটিক্যাল ফাইবার আটকা থাকতে পারে সে জন্যে সব সময়েই ক্ল্যাড থেকে কোরের প্রতিসারংকে বেশি হয়।

তথ্যবিনিময় করার জন্যে ফাইবার অপটিক্স কমিউনিকেশান্সে দুই রকম ফাইবার ব্যবহার করা হয়। এক ধরনের ফাইবারের কোর হচ্ছে 50 মাইক্রন তার নাম মাল্টিমোড ফাইবার। অন্য আরেক ধরনের ফাইবারের কোর আরো অনেক ছোট, 10 মাইক্রনের কাছাকাছি, তার নাম সিংগল মোড ফাইবার। কোরের বাইরে ক্ল্যাডের আচ্ছাদন দিয়ে দুই ধরনের ফাইবারকেই 125 মাইক্রনের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে। 7.4 নং ছবিতে এই দুই ধরনের ফাইবারকে দেখানো হয়েছে। মাল্টিমোড ফাইবারে আলোকরশ্মি নানাভাবে যেতে পারে কিন্তু সিংগল মোড ফাইবারে সেটি যেতে পারে মাত্র এক ভাবে, ফাইবারগুলোর নামকরণটি হয়েছেও এই কারণে। যদি দীর্ঘ দূরত্বে যেতে হয় এবং তথ্যবিনিময় করতে হয় অনেক বেশি তাহলে সব সময়েই সিংগল মোড ফাইবার ব্যবহার করতে হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ফাইবারগুলো সিংগল মোড। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যে সাবমেরিন ক্যাবল বাংলাদেশে আসছে সেটিও সিংগল মোড। সিংগল মোডের, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি জটিল তার খরচও বেশি। যদি ছোট খাট দূরত্বে যেতে হয় তাহলে মাল্টিমোড ফাইবার ব্যবহার করা যায়। আমাদের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক তৈরি করার সময় মাল্টিমোড ফাইবার ব্যবহার করা হয়েছে, ক্যাম্পাস ছোট বলে দূরত্ব বেশি নয়— সেটি একটি কারণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে অর্থের টানাটানি— সেটি আরেকটি কারণ।

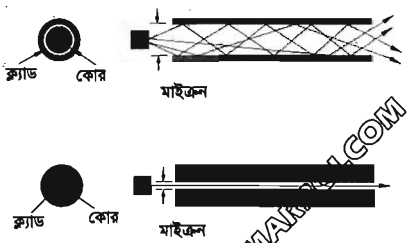

7.4 নং ছবি : মাল্টিমোড ফাইবারের ভেতর দিয়ে অনেক ধরনের রশ্মি যেতে পারে, সিংগেল মোড ফাইবারের কেন্দ্র দিয়ে শুধু এক ধরনের রশ্মি যেতে পারে।

এতক্ষণ আমরা শুধু কাচের তন্তু বা অপটিক্যাল ফাইবারের কথা বলেছি, এর ভেতর দিয়ে কী ধরনের আলো পাঠানো হয় সেটি নিয়ে কোনো কথা বলি নি। যেহেতু আলোর কথা বলা হচ্ছে একটা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন আলোর রংটা কী? লাল নীল হলুদ নাকি অন্য কিছু? মজার ব্যাপার হচ্ছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। তার কারণ ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশান্সে যে আলো ব্যবহার করা হয় সেটি দৃশ্যমান আলো নয়, আমরা যেটা চোখেই দেখতে পাই না সেটার আবার রং কীভাবে হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়। আলো আসলে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। যে কোন তরঙ্গের একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে কাজেই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গেরও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করা নেই, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে শুরু করে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈঘ্য যখন 0.4 থেকে 0.7 মাইক্রনের ভেতর হয় শুধু মাত্র তখন আমরা সেটা দেখতে পাই, অন্য কখনো দেখতে পাই না। 7.5 নং ছবিতে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্যে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে কী নামে ডাকা হয় সেটা দেখানো হয়েছে। দৃশ্যমান আলোর পাশে যে ইনফ্রারেড আলো রয়েছে সেটি ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশান্সে ব্যবহার করা হয়। ইনফ্রারেড আলোর ব্যাপ্তি বেশ বড়, তার পুরোটুকু ব্যবহার করা যায় না, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1.3 থেকে 1.5 মাইক্রন পর্যন্ত ছোট অংশটাকে ব্যবহার করা হয়।

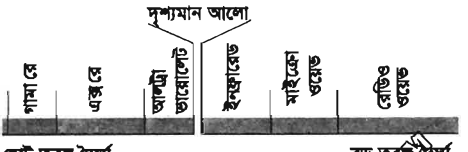

7.5 নং ছবি : বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন নাম

ফাইবার অপটিক্স কমিউনিকেশান্সে ইনফ্রারেড আলোটা দেয়া হয় লেজার দিয়ে। সত্তরের দশকে লেজারের প্রযুক্তিটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। একদিন লেজার অন্যদিকে ফাইবার এই দুটি প্রযুক্তি একই সাথে গড়ে উঠে পৃথিবীকে তথ্য আদান প্রদানের যে দরজাটি খুলে দিয়েছে প্রযুক্তির ইতিহাসে সেটি সব সময় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। আর সেই খোলা দরজা দিয়ে সম্ভাবনার যে আলো এসে পরেছে পৃথিবীকে সেটি সারা জীবনের জন্যে পাল্টে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. অক্সিজেন : নিত্যকালের সঙ্গী

একটু যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যায় আমরা আসলে অত্যন্ত নাজুক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে জটিল বিষয়টি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক, সেটাকে করোটির ভেতরে সাবধানে রেখে শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সাবধানে একটা 'সিস্টেম' দাঁড় করানো হয়েছে। সিস্টেমটা চালু রাখার জন্যে আমাদের দিনে কয়েক বার খেতে হয়। না খেয়ে কতদিন থাকা যায়— ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই পরীক্ষা অনেকবার হয়ে গেছে।

মেক্সিকোর ভূমিকম্পের পর কয়েক জন নবজাতক শিশুকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে নয়দিন পর উদ্ধার করা হয়েছিল, আমার জানামতে সেটাই হচ্ছে দীর্ঘ সময় কিছু না খেয়ে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় রেকর্ড। কোনো পানীয় কিংবা কোনো খাবার না খেয়ে মানুষ কয়েক দিন বেঁচে থাকতে পারলেও নিশ্বাস না নিয়ে সে কিন্তু কয়েক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের মিনিটে বিশ থেকে ত্রিশবারের মতো নিশ্বাস নিতে হয়। নিশ্বাস নেবার অর্থ হচ্ছে বাইরের বাতাসকে বুকের ভেতরে ফুসফুসে টেনে নেয়া। বাতাসে অনেক ধরনের গ্যাস রয়েছে তার মাঝে সবচেয়ে বেশি রয়েছে নাইট্রোজেন, শতকরা 77 ভাগ। অক্সিজেন রয়েছে শতকরা 21 ভাগ, এই দুই মিলেই শতকরা আটানব্বই ভাগ। বাকি দুই ভাগ এসেছে আরও অনেক গ্যাস থেকে, সেগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, আরগন, হিলিয়াম, নিওন, ক্রিপ্টন, জিনন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন ঋতু বা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বাতাসে সব সময় খানিকটা জলীয় বাষ্প থাকে। আরগন হিলিয়াম, আর নিওন হচ্ছে পুরাপুরি নিষ্ক্রীয় গ্যাস আবার কার্বন মনোঅক্সাইড সবচেয়ে বিষাক্ত গ্যাসগুলোর একটি। বাতাসে এদের পরিমাণ খুব কম তাই আমরা বেঁচে থাকি।

৪.১ নং ছবি : বাতাসের শতকরা 21 ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্বাস নেবার সময় সবগুলো গ্যাসই আমাদের বুকের ভেতর টেনে নিই কিন্তু ব্যবহার করি শুধুমাত্র অক্সিজেনকে। এই অক্সিজেনই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। একজন মানুষ যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেক সময় তার নিজে থেকে নিশ্বাস নেবার ক্ষমতা থাকে না তখন তাকে আলাদা করে অক্সিজেন দিতে হয়। অনেক সময় সময়ের আগে শিশুদের জন্ম হয়ে যায়, তার শরীর তখন পুরাপুরি গঠিত হয় নি। প্রথম প্রথম ইনকুবেটরে রাখতে হয়। ইনকুবেটরে তাদের নিশ্বাস দেবার জন্যে যে বাতাস দেয়া হয় সেখানে অক্সিজেন থাকে অনেক বেশি শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ। নিশ্বাস নিতে খুব সমস্যা এ-রকম নবজাতকদের একেবারে পুরাপুরি শতকরা একশভাগ অক্সিজেনের মাঝে রেখে দেওয়ারও নজির আছে, তবে সেটি করতে হয় খুব সাবধানে। কারণ, কম অক্সিজেন যে-রকম বিপজ্জনক, প্রয়োজন থেকে বেশি অক্সিজেনও ঠিক সেরকম বিপজ্জনক। রক্তে বেশি অক্সিজেন চলে গেলে চোখের শিরা-উপশিরা ফেটে গিয়ে নবজাতকদের চোখের দৃষ্টির বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

8.2 নং ছবি : সময়ের আগে শিশুর জন্ম হয়ে গেলে অনেক সময় বেশি অক্সিজেন দিয়ে তাদের ইনকুবেটরে রাখতে হয়।

আমরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি বলে এই গ্যাসটিকে খুব আপন একটা গ্যাস হিসেবে ধরে নিয়েছি। কিন্তু যদি একটাকে শুধুমাত্র রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম তাহলে অত্যন্ত সভয়ে এই গ্যাসটাকে বিবেচনা করতে হতো। প্রকৃতিতে যত উপাদান আছে তার মাঝে সবচেয়ে বেশি বিক্রিয়া করতে পারে যে কয়টি গ্যাস আছে তার মাঝে অক্সিজেন একটি। কঠিন লোহার মতো ধাতু জং পড়ে শেষ হয়ে যায় সেটাও অক্সিজেনের কারণে। যখনই দেখি আগুন জ্বলছে সেটি আর কিছুই নয় সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের বিক্রিয়া। এ-রকম ভয়ংকর বিক্রিয়াশীল একটা গ্যাস আমরা আমাদের শরীরে শক্তি তৈরি করার জন্যে ব্যবহার করি, সেটা প্রকৃতির জন্যে একটা বিশাল কৃতিত্বের ব্যাপার। আমরা যেটাকে বলি "পোড়া" তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অক্সিডেশান অর্থাৎ, অক্সিজেনের সাথে সংযোগ। পোড়ানো বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা ঘটে খুব দ্রুত কিন্তু সেটা আস্তে আস্তেও ঘটতে পারে। লোহার জং ধরা হচ্ছে তার উদাহরণ, সেটা অক্সিডেশান কিন্তু সেটা কয়েকমিনিটের মাঝে ঘটে না সেটা ঘটতে সময় নেয়। আপেল কেটে রেখে দিলে তার মাঝে একটা লালচে রং চলে আসে সেটাও অক্সিডেশান। কাগজ পুরানো হলে সেটা বাদামি রং নেয় সেটাও অক্সিডেশান। এই অক্সিজেশানগুলো হয় খুব ধীরে ধীরে। আগুন ধরে কিছু পুড়ে যাবার সময় অক্সিডেশানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে প্রচণ্ড তাপ বের হয় তার কথা আমরা সবাই জানি যখন সেটা ধীরে ধীরে হয় তখনও কিন্তু তাপ বের হয় কিন্তু সেটা খুব কম বলে আমরা ধরতে পারি না।

৪.3 নং ছবি : আগুন হচ্ছে অক্সিজেনের বিক্রিয়া।

আমাদের শরীরে শক্তি তৈরি করার জন্যে অক্সিডেশান হয় এবং সেটাও দাউদাউ করে আগুন জ্বলার মতো হয় না সেটা হয় খুব ধীরে ধীরে। আমরা যখন নিশ্বাস নেই তখন ফুসফুসের ভেতর যে বাতাসটুকু ঢুকে তার অক্সিজেনটুকু ফুসফুসের বিশেষ ধরনের টিস্যুর মাধ্যমে রক্তের লোহিত কণিকার উপর চেপে বসে। লোহিত কণিকা সেই অক্সিজেনকে বহন করে নিয়ে যায় শরীরের সর্বত্র। একেবারে আনাচে কানাচে। আমরা যা খাই সেগুলোও শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, লোহিত কণিকা দিয়ে বহন করে আনা অক্সিজেন সেই খাবারকে অক্সিডেশান করে। বাইরে জৈব পদার্থ পোড়ালে সব সময়েই কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়, শরীরের ভেতরে সেটা ঘটে। অক্সিডেশন করে শক্তির জন্ম দেবার পর, সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবার লোহিত কণিকা ফুসফুসে ফেরত আনে। আমাদের প্রশ্বাসের সাথে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে আসে। এবং নিশ্বাস আর প্রঃশ্বাসের এই সমন্বয় বজায় না রাখলে আমরা কয়েক মিনিটের মাঝে মারা পড়ব।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন। প্রতিমুহূর্তে আমরা এবং আমাদের মতো অন্যান্য প্রাণীরা নিশ্বাসের সাথে সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেটাকে শরীরে ব্যবহার করে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিচ্ছি। শুধু যে আমরা অক্সিজেন ব্যবহার করি তা নয়, গাড়ি কলকারখানা যন্ত্রপাতি সবজায়গাতেই কয়লা, তেল, গ্যাস পুড়িয়ে শক্তি তৈরি করার সময় অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় এবং সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে আসে। তাহলে অত্যান্ত সঙ্গত প্রশ্ন পৃথিবীর অক্সিজেন কি ধীরে ধীরে কমে আসছে? এমন একটা কি সময় আসবে যখন পৃথিবীতে আমাদের নিশ্বাস নেবারও অক্সিজেন থাকবে না?

আমাদের প্রকৃতি আসলে অত্যন্ত কৌশলী, প্রাণিজগৎ যেন অক্সিজেনের অভাবে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্যে ক্রমাগত অক্সিজেন তৈরি করার একটা বিশাল প্রাকৃতিক ফ্যাক্টরি তৈরি করে রেখেছে। সেই ফ্যাক্টরির নাম হচ্ছে গাছ। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না, গাছ পারে। তারা মাটি থেকে পানি, বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড আর আকাশ থেকে সূর্যের আলো নিয়ে একটা জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া করে নিজের খাবারটা নিজে তৈরি করে নেয়। এই খাবার তৈরি করার প্রক্রিয়ায় খানিকটা বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে আসে। সেই মহামূল্যবান বর্জ্য পদার্থটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে অক্সিজেন। আলোকে নিয়ে সংশ্লেষণ করে খাবার তৈরি করার এই চমকপ্রদ প্রক্রিয়াটির একটা চমকপ্রদ নাম আছে, সেটা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ গাছ সালোক সংশ্লেষণ করে ক্রমাগত অক্সিজেন তৈরি করে যাচ্ছে বলে আমাদের অক্সিজেনের অভাব হয় না। আমরা যখন আহতুক একটা গাছ কেটে ফেলি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা তখন আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অক্সিজেনের সরবরাহ হতে (যত কমই হোক) একটু হস্তক্ষেপ করছি। আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমরা অন্য যা কিছুর উপর নির্ভর করি না কেন, সবার উপরে কিন্তু গাছ।

৪.৪ নং ছবি : গাছ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে আমাদের অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়।

অক্সিজেন শুধু যে আমাদের নিশ্বাসে প্রয়োজন হয় তা নয়, তার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যারা একটু হলেও বিজ্ঞান পড়েছে তারা জানে পৃথিবীর সবকিছু তৈরি হয়েছে বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এই বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থের একটা হচ্ছে অক্সিজেন। মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণু একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে অনু, আর সেগুলিই হচ্ছে পৃথিবী কিংবা সৃষ্টি জগতের মূল উপাদান। পানির অনুতে আছে দুটো হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেনের পরমাণু। সেরকম অক্সিজেনের অনুতে আছে দুটো অক্সিজেনের পরমাণু। এটাই অক্সিজেনের মূল রূপ এবং প্রকৃতিতে এভাবেই অক্সিজেন থাকে, একসঙ্গে দুটো অক্সিজেনের পরমাণু।

RBOI.COM

তবে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি (বা আলট্রা ভায়োলেট রে) এই অক্সিজেনে একটা বিচিত্র কাণ্ড ঘটাতে পারে, অক্সিজেনের অনুকে ভেঙে দুটো পরমাণুতে আলাদা করে ফেলতে পারে। আলাদা হয়ে যাওয়া পরমাণু কাছাকাছি একটা অক্সিজেন অনুর সাথে যুক্ত হয়ে হঠাৎ একটা নূতন রূপ নিয়ে নেয়। যেটাতে থাকে দুটোর বদলে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। তখন সেটাকে আর অক্সিজেন বলে না সেটাকে বলে ওজোন। এমনিতে ওজোন আমাদের জন্যে খুব ক্ষতিকর, ফুসফুসের বারোটা বাজিয়ে দেয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপরে খুব সূক্ষ্ম ওজোনের একটা আস্তরণ রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে আসছে। তার কারণ ওজোন খুব ভালোভাবে অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করতে পারে। যে অক্সিজেন পৃথিবীর প্রাণিজগৎকে নিশ্বাস নিতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে তারই একটা ভিন্ন অনু আবার বায়ুমণ্ডলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আমাদেরকে অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে আসছে। কোনো একটা গ্যাসের প্রতি যদি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রশ্ন আসে, নিশ্চিতভাবেই সেটা হবে অক্সিজেন!

তবে মানব জাতি খুব দায়িত্বশীল নয়। পৃথিবীতে আরাম আয়েশে থাকার জন্যে তারা যে এয়ারকন্ডিশন, ফ্রিজ বা নানা ধরনের স্প্রে তৈরি করেছে তার ভেতরে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সি.এফ.সি) নামে এক ধরনের গ্যাস তৈরি করে। সেই গ্যাসটি যখন মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় তখন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে। প্রথমে সূর্যালোক ক্লোরোফ্লোরোকার্বনকে ভেঙে তার ভেতর থেকে ক্লোরিন নামে ভয়ংকর বিক্রিয়াশীল একটা গ্যাসকে আলাদা করে ফেলে। সেই ক্লোরিন তখন ওজোন গ্যাসকে আক্রমণ করে তাকে সাধারণ দুই পরমাণুর অক্সিজেন অনুতে পাল্টে দেয়। নিশ্বাস নেবার জন্যে এই অক্সিজেন কাজে লাগতে পারে কিন্তু সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মিকে সেটা আটকাতে পারে না। পৃথিবীর অবিবেচক মানুষের কারণে এই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে এবং বিজ্ঞানীরা আতঙ্ক নিয়ে আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে যে সূক্ষ্ম ওজোনের স্তর ছিল সেটা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। শুধু যে ক্ষয় হচ্ছে তা নয় জায়গায় জায়গায় বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। যার ফলে পৃথিবীর মানুষ ভয়ংকর অতি বেগুনি রশ্মিতে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে— চামড়ার ক্যান্সার তার প্রথম লক্ষণ। ভবিষ্যতে আরও কী হবে আমরা সেটা এখনো জানি না।

বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে অনেকদিন থেকেই চেচামেচি করছেন, আমরা আশা করছি পৃথিবীর অবিবেচক মানুষ একদিন বিজ্ঞানীদের চেচামেচি শুনে পৃথিবীটাকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসবেন!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

9. জীবনের নীল নকশা

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বলেছিলেন, তুমি যদি বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব তোমার কজের বুয়াকে বোঝাতে না পার তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপারটি তুমি নিজেই বোঝ নি! কাজের বুয়া কিংবা মহিলাদের বুদ্ধিমত্তাকে উপহাস করার জন্যে কথাটি বলা হয় নি, বিজ্ঞানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও যে বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো বোঝা সম্ভব সেই বিষয়টাকে এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো প্রায় সময়েই আশ্চর্য রকম সহজ এবং সরল— এটি কোন দুর্ঘটনার নয়। প্রকৃতি জটিলতা পছন্দ করে না, সে সবচেয়ে সহজ এবং সুন্দর উপায়ে সবকিছু গড়ে তুলেছে। বিজ্ঞানীরা সেটা খুঁজে বের করছেন এবং তাদের মাথার ভেতর সব সময়েই এটা কাজ করে যে, বিজ্ঞানের যে অজানা জটিল বিষয়টি নিয়ে এখন তারা হাবুডুবু খাচ্ছেন, যখন তার সমাধানটি তারা পাবেন সেটি হবে আশ্চর্য রকম সহজ এবং সরল। প্রাচীনকালে মানুষ ধরে নিয়েছিল চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সবকিছু পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে (ধর্মগ্রন্থে সেটা লেখা আছে, কার ঘাড়ে দুটি মাথা সেটি অস্বীকার করবে?) সে সময়কার বিজ্ঞানীরা যখন চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো ঠিক কিভাবে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে বের করার চেষ্টা করছিলেন তখন তাদের মাথা খারাপ হবার অবস্থা। চাঁদ এবং সূর্যের বিষয়টা নিয়ে সমস্যা নেই কিন্তু গ্রহগুলোর গতিপথের কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, কখনো সেটা যাচ্ছে জোরে, কখনো আস্তে। শুধু তাই নয় কখনো-কখনো একদিকে খানিকটা গিয়ে আবার গতিপথ পাল্টে উল্টো দিকে ফিরে আসছে! কারো সাথে কারো মিল নেই, সব মিলিয়ে একটা বিশাল জগাখিচুড়ি। চাঁদ সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্রের এই জটিল গতিবিধি ব্যাখ্যা করা পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের জন্যেও ছিল অসম্ভব একটি ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত কোপার্নিকাস যখন বললেন আসলে পৃথিবী নয় সূর্যকে ঘিরে সব গ্রহগুলো ঘুরছে, সাথে সাথে প্রায় চোখের পলকে সব জটিলতা দূর হয়ে গেল। বিজ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষ একই সাথে অবাক হয়ে দেখল সবকিছুর মূলে আছে মহাকর্ষ বল, সেই মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে সূর্যকে ঘিরে সবগুলো গ্রহ ঘুরছে! খুব সহজ-সরল একটি বিষয়, কাজের বুয়ারাও সেটা বুঝবেন।

জীবিত প্রাণীর মূল ব্যাপারটিও সেরকম আশ্চর্য রকম সহজ এবং সরল। একটা জীবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

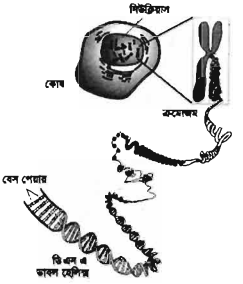

9.1 নং ছবি : একটা কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে সাজানো থাকে ক্রমোজম, সেই ক্রমোজম হচ্ছে ডি.এন.এ.-র কুণ্ডলী যার ভেতরে জীবনের নীল নকশা লুকানো থাকে।

প্রাণী কীভাবে জন্ম হবে এবং বিকশিত হবে তার একটা নীল নকশা থাকে। ক্ষুদ্র একটা জীবাণু থেকে শুরু করে মানুষের মতো জটিল একটা প্রাণীর সবার ভেতরেই সেই নীল নকশাটি একই প্রক্রিয়ায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই তথ্যটিই কী আমাদের অবাক করে দেয় না? একটা নীল নকশা মানে কিছু তথ্য, কিছু নির্দেশ। সেগুলো আমরা আগে রাখতাম কাগজে লিখে, আজকাল রাখি কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ কিংবা সিডি রমে। আপাতঃদৃষ্টিতে পুরো বিষয়টাকে অনেক জটিল মনে হলেও তথ্য সংরক্ষণের সময় সেটা রাখার জন্যে আশ্চর্য রকম সরল একটা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার নাম বাইনারী পদ্ধতি এবং সেটা করার জন্যে 1 এবং 0 এই দুটি অংককে ব্যবহার করা হয়। জীবিত প্রাণীরা তাদের নীল নকশার তথ্য সংরক্ষণ করার জন্যে প্রায় এ-রকম একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছে "ডি.এন.এ" এর ডাবল হেলিক্সে সেই তথ্য রাখা হয় মাত্র চার ধরনের বেস পেয়ার দিয়ে, শর্ট কাটে তাদের নাম হচ্ছে A, C, G এবং T। শুধু তাই নয় ডি.এন.এ-তে A এর বিপরীতে থাকে সব সময় T এবং C এর বিপরীতে থাকে G। যারা পৃথিবীর একটু খোঁজখবর রাখে তারা নিশ্চয়ই জানে বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট হচ্ছে মানব জিনোম প্রজেক্ট, কেউ যদি আক্ষরিক অর্থে সেটি দেখতে চায় তাহলে সে দেখবে ATCGCCTGATTCCGT এ-রকম মাইলের পর মাইল চার অক্ষরের সাড়ি। এটি হচ্ছে মানব দেহের নীল নকশা, এর মাঝে লুকিয়ে আছে মানব দেহের সকল রহস্য!

মানুষ কিংবা অন্য যে কোনো জীবিত প্রাণীর জন্যেই এই নীল নকশাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো খুব যত্ন করে সংরক্ষণ করা দরকার। তাই জীবিত প্রাণী এগুলো সংরক্ষণ করার জন্যে যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছে সেটি খুবই চমকপ্রদ। শরীরের বিশেষ কোনো এক জায়গায় বিশেষ যত্ন করে না রেখে সেটাকে শরীরের লক্ষ লক্ষ কোষের প্রত্যেকটা

9.2 নং ছবি : ডি.এন.এ.-র ডাবল হেলিক্সে সকল তথ্য রাখা হয় মাত্র চার ধরনের বেস পেয়ার দিয়ে। সেগুলো হচ্ছে A, C, G এবং T

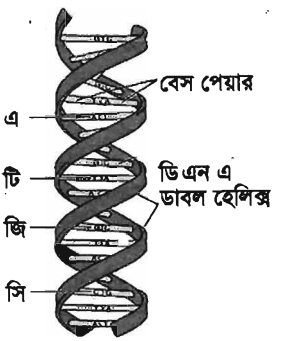

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর রেখে দেয়া হয়েছে। শরীরের যে কোষের জন্যে যে নির্দেশটি প্রয়োজন সে তার প্রয়োজনমত হাতের কাছে নীল-নকশা থেকে সেটি পেয়ে যাচ্ছে।

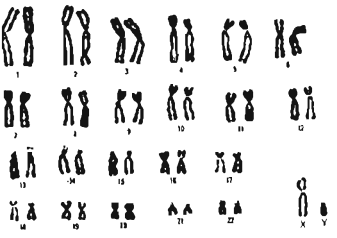

9.3 নং ছবি : মানুষের রয়েছে 23 জোড়া ক্রমোসোম। 23 তম ক্রমোজম দুটি যদি হয় XX সেটি হবে মেয়ে, যদি হয় XY তাহলে সেটি হবে ছেলে।

একটি জীবিত কোষের নিউক্লিয়াসের যেখানে এই নীলনকশাকে রাখা হয় তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ক্রোমোজম। ফ্রুট ফ্লাই নামক পতঙ্গের ক্রোমোজম হচ্ছে 4 টি, বিড়ালের 34 টি এবং মানুষের 46 টি। কেউ যেন মনে না করে যে প্রাণী যত উন্নত তার ক্রোমাজমের সংখ্যা তত বেশি, কারণ কুকুরের ক্রোমোজমের সংখ্যা মানুষ থেকে বেশি, 78 টি।

অল্প কয়েকটা প্রাণীর ক্রোমোজমের সংখ্যা বলা হয়েছে বলে কেউ হয়তো আলাদাভাবে লক্ষ করে নি যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেগুলো জোড় সংখ্যাক। মানুষের বেলাতেও তাই, মোট ক্রোমোজমের সংখ্যা 46 হলেও সেটি আসলে 23 জোড়া ক্রোমোজম এবং প্রকৃতির সহজ-সরল নিয়মে সন্তানের 23 জোড়া ক্রোমোজমে 23 টি আসে বাবার কাছ থেকে বাকি 23 টি আসে মায়ের কাছ থেকে। 9.3 নং ছবিতে মানুষের 23 জোড়া ক্রোমোজমকে দেখানো হয়েছে, কেউ যদি একটু মনোযোগ দিয়ে ছবিটা লক্ষ করে তাহলে তার কাছে ছবিটার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। প্রথমত, দেখা যাচ্ছে ক্রোমোজমগুলোকে সাজানোর সময় বড় থেকে ছোট ক্রোমোজমে সাজানো হয়েছে। এটি সহায়েতই তালিকাভুক্তি করার ব্যাপার এর মাঝে কোন বিজ্ঞান নেই। একটা কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে যখন ক্রোমোজেমগুলো থাকে তখন কিন্তু সেগুলো এ-রকম সাজানো গোছানো থাকে না, ডি.এন.এ. তন্তুগুলো খোলা অবস্থায় পুরো নিউক্লিয়াসের ভেতরে এলোমেলো অবস্থায় থাকে। শুধুমাত্র কোষ বিভাজনের সময় সাময়িকভাবে এগুলো ছোট এবং মোটা হয়ে আসে, সেগুলো তখন আলাদাভাবে দেখা সম্ভব হয়। ছবির ক্রোমোজমগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমরা যে জিনিসটি দেখব সেটা হচ্ছে 23 জোড়া ক্রোমোজমের সবগুলো এক ধরনের জোড়া, তাদের নামকরণ করা হয়েছে 1, 2, 3। এ-রকম সংখ্যা দিয়ে, শুধুমাত্র শেষ জোড়াটিকে 23 নম্বর না বলে বলা হয়েছে XY। শুধু তাই নয় X এবং Y দেখতে ভিন্ন। বিশাল X ক্রোমোজমের পাশাপাশি Y রীতিমতো ক্ষুদ্র এবং খর্বকায়। আমরা আগেই বলেছি 23 জোড়া ক্রোমোজমের একটি এসেছে বাবার কাছ থেকে অন্যটি মায়ের কাছ থেকে। যার অর্থ XY এই জোড়ার ভেতরে একটি বাবার অন্যটি মায়ের। কাউকে যদি অনুমান করতে বলা হয় কোনটি বাবা থেকে এসেছে আমি নিশ্চিত সে বলবে বৃহদাকৃতি X ক্রোমোজমটি বাবার, আমরা পুরুষশাসিত সমাজে থাকি যা কিছু বড়, যা কিছু ক্ষমতাশালী সেটাকেই পুরুষের সাথে তুলনা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসি। প্রকৃতপক্ষে Y ক্রোমোজমটি এসেছে বাবার কাছ থেকে। একজন মানুষের প্রত্যেকটা কোষের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসে এই তেইশ জোড়া ক্রোমোজম রয়েছে এবং এর মাঝেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই মানুষটির দেহ গঠনের নীল নকশা। কারো নীল-নকশায় যদি কালো চুলের নির্দেশনা থাকে তাহলে সে হবে কালো চুলের মানুষ, যদি নীল নকশায় নীল চোখের নির্দেশনা থাকে তাহলে সে হবে নীল চোখের মানুষ। যদি গায়ের রং শ্যামলা হওয়ার নির্দেশনা থাকে তাহলে সে জন্ম নেবে কোমল শ্যামলা রং নিয়ে। আবার কোনো দুর্ভাগ্যের কারণে যদি তার নীল নকশায় থাকে হেমোফিলিয়া রোগের নির্দেশনা নিয়ে তাহলে সে অবধারিতভাবে বড় হবে হেমোফিলিয়া রোগ নিয়ে। শুধু যে চুল বা চোখের রঙ বা গায়ের রঙ এবং কখনো-কখনো দুরারোগ্য রোগের নির্দেশনা এই ক্রোমোজমের ভেতর ডি.এন.এ.র সুদীর্ঘ তন্তুতে লুকিয়ে থাকে তা নয় একজন মানুষ পুরুষ হবে না মেয়ে হবে তাও থাকে এই ক্রোমোজমগুলোর ভেতরে, আরও স্পষ্ট ভাবে। একজন মানুষ যদি পুরুষ হয় তাহলে তার 23তম জোড়ার ক্রোমোজমগুলো হয় X এবং Y যেরকম এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটি যদি পুরুষমানুষের না হয়ে একটি মেয়ের ক্রোমোজম হতো তাহলে 23 তম জোড়ার দুটিই হতো একই ধরনের, সেখানে থাকত XX ! খুব সঙ্গত কারণেই এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে মেয়েরা পচ্ছে দুটি দীর্ঘ X ক্রোমোজম অথচ ছেলেরা পাচ্ছে একটি দীর্ঘ X এবং একটি রীতিমতো বেটেখাটো Y ক্রোমোজম তাহলে কী বলতে হবে ছেলেদের প্রতি প্রকৃতি খানিকটা অবিচার করেছে? কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়, আমরা আমাদের চারপাশে অনেক টাকমাথার পুরুষ দেখেছি কিন্তু কখনো কী কোনো টাকমাথার মহিলা দেখেছি? এর কারণটাও লুকিয়ে আছে X এবং Y ক্রোমোজমের ভেতর।

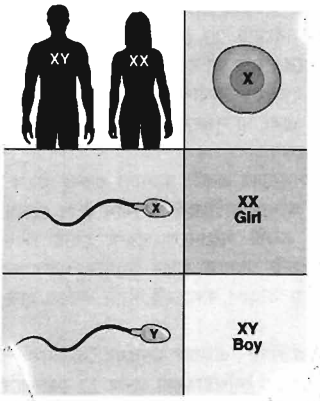

9.4 নং ছবি : মায়ের ক্রমোজম শুধু X বাবার ক্রমোজম XY দুটিই থাকতে পারে। বাবার Xটি গেলে সন্তান হয় মেয়ে, Yটি পেলে সন্তান হয় ছেলে।

AMARBOI.COM

এর মাঝে বেশ কয়েক বার বলা হয়ে গেছে মানব দেহের প্রত্যেকটা কোষে 23 জোড়া ক্রোমোজম থাকে, আসলে কথাটা পুরাপুরি সত্য নয়। সন্তান জন্মের জন্যে পুরুষের শুক্রাণু এবং মেয়েদের ডিম্বাণুতে থাকে ঠিক অর্ধেক— অর্থাৎ 23টি করে ক্রোমোজম। নারী দেহের কোষের 23 জোড়া ক্রোমোজমকে দুইভাগে ভাগ করে 23টি আলাদা করে ডিম্বাণু তৈরি করা হয় বলে আমরা বলে দিতে পারি সেখানে 1 থেকে 22 পর্যন্ত 22টি ক্রোমোজম এবং একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

X সব মিলিয়ে 23 টি ক্রোমোজম থাকবে। কিন্তু পুরুষের বেলায় ? তাদের তো X এবং Y দুটিই আছে, তাহলে তাদের শুক্রাণুতে কী X না Y ক্রোমোজম, কোনটি থাকবে? উত্তরটি সহজ। তাদের সাধারণ কোষ থেকে আলাদা করে দুটি তৈরি হয় বলে শুক্রাণুতে X এবং Y দুটিই থাকতে পারে। কাজেই তাদের শুক্রাণুর অর্ধেকের মাঝে থাকে X ক্রোমোজম বাকি অর্ধেকে থাকে Y ক্রোমোজম। মায়ের গর্ভে সন্তানের জন্মের সময় যদি ডিম্বাণুর সাথে X ক্রোমোজমের শুক্রাণু মিলিত হয় তাহলে সন্তানেরা সর্বমোট 23 জোড়া ক্রোমোজমের 23 জোড়াটি হয় XX অর্থাৎ সন্তান ঝন্ম নেয় মেয়ে হিসেবে। যদি তা না হয়ে শুক্রাণুটিতে থাকে Y ক্রোমোজম তাহলে সন্তানের 23 তম জোড়াটি হয় XY অর্থাৎ সন্তান জন্ম হয় পুরুষ হিসেবে। যেহেতু অন্য সবগুলো ক্রোমোজমই বাবার এবং মা দুজনের কাছ থেকেই এসেছে তাই সন্তানেরা মাঝে বাবা এবং মা দুজনেরই ছাপ পাড়ে।

আমাদের দেশে এখনো অনেকের মাঝে ছেলে-সন্তানের একটা আলাদা গুরুত্ব থাকে। ইতিহাসে পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে না পারার জন্যে অনেক নারীকেই অপমান এবং হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে একটি সন্তানকে পুরুষ হবার জন্যে প্রয়োজনীয় Y ক্রোমোজমটি মেয়েদের থাকে না, সেটি আসতে পারে শুধুমাত্র পুরুষদের ভেতর থেকে! কাজেই কাউকে যদি দায়ী করতেই হয় তাহলে বাবাকেই দায়ী করতে হবে, কোনোভাবেই মা'কে নয়।

এবারে আমরা আরো একটা মজার জিনিস দেখতে পারি। একজন মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো এই 23 জোড়া ক্রোমোজমে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম 22 জোড়াতে পড়েছে সেগুলোর একটা সুবিধা আছে, প্রত্যেকটাই দুটো করে থাকার কারণে কোনো একটাতে সমস্যা থাকলে অন্যটা থেকে পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু সেই সমস্যাটি যদি আসে X ক্রোমোজম থেকে তাহলে মেয়েরা তাদের দ্বিতীয় X ক্রোমোজম থেকে সেটা পুষিয়ে নিতে পারে, ছেলেরা পারে না। টাক মাথা সেরকম একটা ব্যাপার, মেয়েদের একটি X ক্রোমোজমে টাক পড়ার নির্দেশনা থাকলেও ক্ষতি নেই অন্য X ক্রোমোজমে সেই বিপদটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে। ছেলেরা পারে না। তাই আমাদের চারপাশে এত টাক মাথা পুরুষমানুষ, টাক মাথা মেয়ে একজনও নেই!

সব ব্যাপারে পুরুষেরা মেয়েদের উপর একটা সুবিধে নেবে প্রকৃতি মনে হয় সেটা পছন্দ করে না তাই তাদেরকে ছোট একটা শিক্ষা দেবার জন্যে সম্ভাব্য এ-রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

10. একটি জীবাণুর বক্তৃতা

আমরা জানি জীবাণুরা কথা বলতে পারে না, বক্তৃতাও দিতে পারে না। যদি পারতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই সভা-সেমিনারে এ-রকম একটা বক্তৃতা দিতো : আমার প্রিয় জীবাণু বন্ধুগণ, আজকে আমার বক্তব্য শুনতে আসার জন্যে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই আমাদের অতীত ঐতিহ্যের কথা জানেন, সেই সৃষ্টির আদিকালে আমাদের জন্ম এবং বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে সফল একটি জীবনধারার সৃষ্টি করতে পেরেছি। পৃথিবীতে নানা ধরনের জীবন রয়েছে। আমাদের মতো আকারে ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে শুরু করে আমাদের থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি গুণ বড় মানুষ নামের স্তন্যপায়ী প্রাণীও এই পৃথিবীতে রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর কথা না বলে মানুষ নামক এই প্রাণীটির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করছি কারণ তারা সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের ভেতরে "গণহত্যা" সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আপনারা নিরুৎসাহিত হবেন না, অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করুন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমাদের সংগ্রামী ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু ভাইয়েরা এই পৃথিবীর দুইকোটি দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। 1346 থেকে 1352 সালের ভেতরে ইউরোপের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ আমাদের বুবোনিক প্লেগ জীবাণু ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কোনো কোনো শহরের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষকে তারা সাফল্যের সাথে হত্যা করতে সম্ভব হয়েছিল। 1880 সালে আমাদের যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ভাইয়েরা শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভেতর দিয়ে আদিবাসী স্থানীয় বাসিন্দাদের

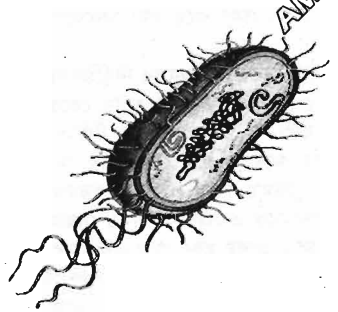

10.1 নং ছবি : ব্যাক্টেরিয়া হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে সফল একটি জীবনধারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর ছড়িয়ে পড়ে তাদের শতকরা দশ জনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। আপনাদের অনুপ্রাণিত করার জন্যে আমি এ-রকম অসংখ্যা উদাহরণ দিতে পারি সেটি না করে আমি আমার মূল বক্তব্য ফিরে যাই।

10.2 নং ছবি : কলেরা একসময় গ্রামের পর গ্রামের উজার করে দিতো।

প্রিয় বন্ধুগণ, বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা একটি উন্নত জীবনধারায় পরিণত হয়েছি। আমরা আমাদের পুষ্টি এবং বংশ বিস্তারের জন্যে মাঝে মাঝেই অত্যান্ত কৌশলে মানুষ নামক স্তন্যপায়ী প্রাণীটির দেহ ব্যবহার করে থাকি। যেহেতু মানুষের এই দেহ আমাদের অন্ন বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় আমরা তাই তাদেরকে শুরুতেই হত্যা করতে চাই না। তাহলে আমরা আমাদের অন্ন এবং বাসস্থান হারাবো। আমরা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই যেন তারা আমাদের বংশধরদের অন্য মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। যত দ্রুত তারা আমাদের বংশধরদের অন্য মানুষে ছড়িয়ে দেবে আমরা তত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারব এবং যারা যত সাফল্যের সাথে এটা করতে পেরেছে তারা বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে তত দীর্ঘজীবী হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুগণ, একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে অনেক সময় আমাদের কিছুই করতে হয় না, মানুষের লোভ এবং নির্বুদ্ধিতা দিয়েই আমাদের বংশ বিস্তারের কাজটি হয়েছে। আমাদের প্রিয় সালমোনিলা ব্যাক্টেরিয়া ডিম বা মাংসকে আক্রান্ত করে চুপচাপ বসে থাকে, মানুষ সেটি খেয়ে সালমোনিলাকে নিজের শরীরে গ্রহণ করে। ঠিক সেভাবে শূকরের মাংসের ভেতর দিয়ে টেনিকনোসিস এবং কাঁচা মাছের (সুশি) ভেতর দিয়ে এনিসাকিয়াসিস মানুষের শরীরে বংশবিস্তারের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিউগিনির পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা কুরু নামের বিচিত্র ব্যাধিটির ভাইরাস গ্রহণ করে অন্য মানুষকে কেটে কুটে খাওয়ার মাধ্যমে।

প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা মনে করবেন না আমাদের সকলেই মানুষের নির্বুদ্ধিতার উপর ভরসা করে অপেক্ষা করে থাকি। আমরা একটি রোগাক্রান্ত মানুষের শরীর থেকে অন্য মানুষের শরীরে যাবার জন্যে অনেক সময় মশা মাছি বা উকুনের মতো কীট-পতঙ্গকে ব্যবহার করি। উদাহরণ দেবার জন্যে আপনাদের মনে করিয়ে দেয়া যায় আমাদের সুপরিচিত মশা, মাছি এবং টাইফাস জীবাণু তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই কীট-পতঙ্গগুলোকে আমাদের বংশ বিস্তারের জন্যে ব্যবহার করছে। রোগাক্রান্ত একজনকে কামড় দেয়ার সময় এই কৌশলী জীবাণুগুলো মশা, মাছি বা উকুনের লালায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তারা যখন অন্য সুস্থ মানুষকে কামড় দেয় সেই লালার ভেতর দিয়ে সুস্থ মানুষটির শরীরে প্রবেশ করে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা মনে করবেন না বংশ বিস্তারের জন্যে আমরা শুধুমাত্র তুচ্ছ কীট-পতঙ্গের উপর নির্ভর করে থাকি। সেটি সত্যি নয়, আমাদের সবচেয়ে সৃজনশীল জীবাণু বন্ধুরা মানুষকেই এই কাজে ব্যবহার করে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিফিলিসের জীবাণুর কথা বলা যায়, একজন মানুষকে আক্রান্ত করে সে তার শরীরের সবচেয়ে গোপনীয় অংশে ঘা সৃষ্টি করে সেখানে লক্ষ লক্ষ জীবাণু নিয়ে অপেক্ষা করে। এবং এই দগদগে ঘা অন্য মানুষের সংস্পর্শে আসা মাত্রই সেখানে অপেক্ষারত আমাদের সৃজনশীল সিফিলিস্ জীবাণু বন্ধুরা ঝাপিয়ে পড়ে। সুস্থ মানুষটির শরীরে বাসস্থান সৃষ্টি করে, বংশ বিস্তার শুরু করে।

10.3 নং ছবি : সিফিলিস ইতিহাসে সব সময়েই একটি ভয়ংকর রোগ।

কুচক্রী মানুষ আমাদের প্রিয় বসন্ত (স্মল পক্স) রোগের ভাইরাসটিকে পৃথিবীর মানুষের ভেতর থেকে অপসারণ করে এখন কিছু ল্যাবরেটরিতে বন্দি করে রেখেছে। তারা সেখান থেকে মুক্ত হতে পারছে না, আজকের এই সভায় আমরা গভীর মমতার সাথে এই বন্দি ভাইরাসদের কথা স্মরণ করছি। প্রিয় বন্ধুগণ! যখন এই ভাইরাসগুলো মানুষের শরীরে বসবাস করতো, বংশবিস্তার করতো তখন তারা মানুষের শরীরে ফুসকুড়ির সৃষ্টির করতো এবং সেখানকার তরল বা পূঁজে বাসস্থান তৈরি করে বাসবাস করতো। ফুসকুড়ি থেকে তৈরি ক্ষতের মাধ্যমে আমাদের সৃজনশীল ভাইরাসগুলো একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো। প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা সম্ভবত জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গরা স্থানীয় আদিবাসীদের হত্যা করার জন্যে বসন্ত রোগীর ব্যবহৃত কম্বলগুলো উপহার হিসেবে তাদের কাছে পাঠাত। আদিবাসীরা সরল বিশ্বাসে এই কম্বলগুলো গ্রহণ করতো, ব্যবহার করতো এবং বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়তো।

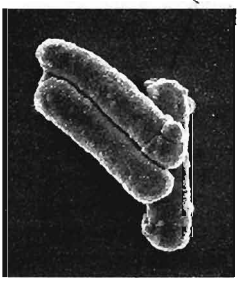

10.4 নং ছবি : টাইফয়েড এখন অনেকটাই আয়ত্বের মাঝে চলে এসেছে।

AMARBOI.COM

আমাদের প্রিয় জীবাণু বন্ধুরা বংশ বিস্তারের জন্যে আরও নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করে থাকে। সর্দি কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা হুপিং কাশির জীবাণুরা মানুষের ভেতরে ক্রমাগত হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে তরল নির্গমন এই ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। তার কারণে একজন রোগাক্রান্ত মানুষকে ঘিরে অসংখ্য জীবাণু ভেসে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং একজন সুস্থ মানুষ ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেই তাকে আক্রান্ত করা সম্ভব হয়। এই মুহূর্তে আমি যদি আমাদের কলেরা জীবাণুর গৌরব গাথার কথা না বলি তাহলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে

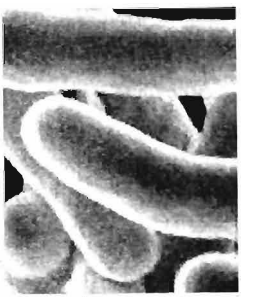

10.5 নং ছবি : যক্ষ্মাকে এক সময় বলা হতো রাজরোগ কারণ এর কোনো চিকিৎসা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

10.6 নং ছবি : বসন্তরোগ মানুষ পৃথিবী থেকে সরিয়ে ল্যাবরেটরিতে আটকে ফেলতে পেরেছে।

যাবে। এই দুঃসাহসী জীবাণু একজন মানুষের দেহে সাফল্যের সাথে আশ্রয় নিতে পারলেই তাকে বমি এবং ডায়রিয়াতে বাধ্য করে। তার শরীর থেকে বের হওয়া বর্জ্য পদার্থে আমাদের দুঃসাহসী কলেরা জীবাণু আশ্রয় নেয় এবং প্রথম সুযোগ এই এলাকার পানি সরবরাহকে দখল করে নেয়। কলেরা জীবাণুতে টইটুম্বর এই পানি যখন একজন সুস্থ মানুষ পান করে সাথে সাথে আমাদের দুঃসাহসী কলেরার জীবাণু তার শরীরটি দখল করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। ইদানীং আমাদের কলেরা জীবাণুর বড় কোনো সাফল্যের কথা জানা না থাকলেও অতীতে সেটি ছিল ঈর্ষণীয় একটি গৌরব গাঁথা।

তবে আমার মনে হয় জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিজ ভাইরাসের জীবনকাহিনী সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। এই ভাইরাস যখন কুকুরকে আক্রান্ত করে তখন কুকুরের ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি অপ্রকৃতস্থ হয়ে সুস্থ মানুষকে কামড় দিতে শুরু করে কারণ আমাদের কৌশলী জলাতঙ্ক ভাইরাস কুকুরের লালার মাঝে স্থান করে নেয় এবং যখন জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুর একটি সুস্থ মানুষকে কামড় দেয় প্রকৃতপক্ষে সে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৌশলী জলাতঙ্ক ভাইরাসকে বংশ বিস্তারের জন্যে অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তর করার দায়িত্বটুকু পালন করছে, তার বেশি কিছু নয়।

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা শুনে অবাক হবেন, আমরা যখন অত্যন্ত কৌশলে বংশবিস্তার করার জন্যে একজন মানুষের আচার ব্যবহার, শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন করি, মানুষ সেটাকে মনে করে রোগের উপসর্গ। তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কোটি কোটি বৎসরের প্রচেষ্টায় আমরা এই কৌশলগুলো আয়ত্ত করেছি।

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা মনে করবেন না, আমাদের বংশবিস্তারের এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ। মানুষের শরীর প্রতিনিয়ত আমাদের বংশবিস্তারে বাধা দিতে চেষ্টা করছে। আমরা যখনই একজন মানুষের শরীরে অবস্থান নেই, মানুষের শরীর প্রায় সব সময়েই তার দেহের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে তুলে। এই উঁচু তাপমাত্রার কারণে আমাদের প্রিয় জীবাণু বন্ধুদের অনেক সময়েই অকাল মৃত্যু ঘটে থাকে। মানুষ অনেক সময়েই বুঝতে পারে না আমাদের আক্রমণের জন্যে তার দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা সেটাকে বলে জ্বর এবং নানাভাবে এই জ্বর কমানোর চেষ্টা করে।

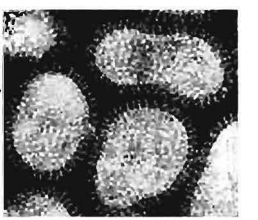

10.7 নং ছবি : বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শুধুমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়েই দুই কোটি দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

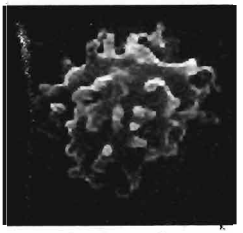

10.8 নং ছবি : মানুষের শরীরের শ্বেত কণিকা প্রতিমুহূর্তে রোগ জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করছে।

মানুষেরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে শুধু যে তাদের দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলে তাই নয়, অনেক সময়েই তার দেহের শ্বেত কণিকাগুলোকে আমাদের প্রতিরোধ করার জন্যে লেলিয়ে দেয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আমাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। যখন প্রতিরোধ করতে পারে তখন তাদের শরীরে আমাদের প্রতিরোধ করার জন্যে বিশেষ প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যায়, ভবিষ্যতে তখন আমরা বিশেষ সুবিধে করতে পারি না। প্রিয় বন্ধুগণ! মানুষের দেহের এই চাতুর্যপূর্ণ চক্রান্তকে আমরা মাথা নিচু করে মেনে নিই নি। আমাদের সংগ্রামী সর্দিকাশির ভাইরাসের কথা আমরা গর্ব করে বলতে চাই। তাদের পরাস্ত করে যখন শরীরে একধরনের প্রতিষেধক বা এন্টিবডি তৈরি হয় তখন আমাদের এই সর্দিকাশির সংগ্রামী ভাইরাসেরা তাদের রূপ পরিবর্তন করে ফেলে। যখন তারা নূতন করে মানুষকে আক্রমণ করে তখন আগের প্রতিষেধক কোনো কাজে আসে না। তাই মানুষের শরীরে একবার জলবসন্ত হাম বা মাম্পস হলে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে যায় এবং সে আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয় না। কিন্তু মানুষের শরীর এখনোই সর্দিকাশিকে পরাস্ত করতে পারে নি।

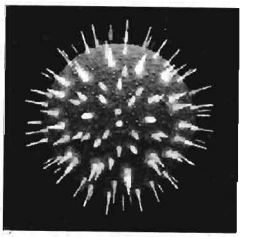

10.9 নং ছবি : পৃথিবীর মানুষের এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এইচ.আই.ভি. ভাইরাস—এইডস রোগের কারণ।

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শুনেছেন সে জন্যে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধু এইডস ভাইরাসের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এই ভাইরাস মানুষের শরীরে বসে মানুষের নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেই ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে। শুধু তাই নয় এই প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ভাইরাস মায়ের শরীরে অবস্থান নিতে পারলে তার গর্ভের সন্তানের দেহে পর্যন্ত আক্রান্ত করতে পারে। পৃথিবীর মানুষ এই ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা। সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে মানুষ তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতির মাঝে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করছে! আমাদের সাথে এই সংগ্রাম চলবেই তো, দেখা যাক কে বিজয়ী হয়।[১]

১. Guns, Germs and Steel, Jared Diamond এর বই থেকে সংগ্রহিত তথ্য ব্যবহৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

11. মস্তিষ্কের ডান বাম

আমার একজন ছাত্র একবার মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে মারা গিয়েছিল। ডাক্তাররা তাকে বাচাঁনোর সব রকম চেষ্টা করলেও আমাদেরকে বলেছিলেন সে বেঁচে গেলেও কখনো দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে না, মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখার কাজে ব্যবহৃত হয় তার সেই অংশটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডাক্তারদের আশঙ্কা সত্যি কি না সেটা আমরা কখনো জানতে পারি নি কারণ হতভাগ্য ছাত্রটি কখনো জ্ঞান ফিরে পায় নি।

11.1 নং ছবি : মানুষের মস্তিষ্ক তিনটি স্তরে বিভক্ত, উচ্চতম বা নিওকর্টেক্স অংশটুকুই আমাদের মানুষ হিসেবে আলাদা করেছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশবিশেষ বিশেষ কাজ ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো অংশ দেখার কাজে, কোনো অংশ শোনার কাজে, কোনো অংশ স্পর্শের অনুভূতির জন্যে। এমনকি কারো কারো দুর্ঘটনার কারণে আরও কিছু বিচিত্র ব্যাপার জানা গেছে, মস্তিষ্কের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পুরাপুরি একজন নীতিবান সৎ মানুষ দুর্নীতিবাজ দুশ্চরিত্র হয়ে গিয়েছিল! কাজেই মস্তিষ্কের রহস্য বোঝা এখনো শেষ হয় নি, খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে সেরকম সম্ভাবনাও নেই।

খুব সরলভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে দেখলে সেটাকে 11.1 নং ছবির মতো দেখা যেতে পারে। ছবিটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্কে তিনটি স্তর। ভেতরের স্তরটি নাম রেপ্টিলিয়ান ব্রেন, নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন সরীসৃপ যুগ ছিল তখন এই অংশটি গড়ে উঠেছে। এই অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষুধা বা ভয়ের মতো জৈবিক বা পাশবিক অনুভূতি। বিবর্তনের কারণে যখন প্রাণিজগতের আরো উন্নতি হয়েছে তখন ধীরে ধীরে রেপ্টিলিয়ান ব্রেনের উপরে লিম্বিক ব্রেন গড়ে উঠেছে। লিম্বিক ব্রেন আমাদের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমার দুঃখ-কষ্ট-ভালোবাসা-ক্রোধ এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভূতিগুলো এই অংশটুকু থেকে জন্ম নেয়। (লিম্বিক ব্রেনের একটা বড় অংশের নাম এমিগডালা, যেটা যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।) লিম্বিক ব্রেনের উপরে রয়েছে নিওকর্টেক্স বা উচ্চতর ব্রেন। মানুষের চিন্তা মনন, বুদ্ধিমত্তা বা নান্দনিক চেতনা সবকিছুর জন্ম হয় নিওকর্টেক্সে। এই নিওকর্টেক্সই আমাদের মানুষ হিসেবে আলাদা স্থান করে দিয়েছে।

11.2 নং ছবি : নিওকর্টেক্স বা উচ্চতর মস্তিষ্ক বাম এবং ডান গোলার্ধে বিভক্ত। বাম গোলার্ধ যুক্তিবাদী, ডান গোলার্ধ হচ্ছে কল্পনার জগৎ।

নিওকর্টেক্স বা উচ্চতর ব্রেন দুই ভাগে বিভক্ত। একটা বাম গোলার্ধ অন্যটি ডান গোলার্ধ। এটি এমন কিছু বিচিত্র নয়, কারণ আমাদের প্রায় সবকিছুই দুটি করে— আমাদের হাত দুটি, পা দুটি, চোখ, ফুসফুস কিডনী দুটি, কাজেই মস্তিষ্কের সবচেয়ে বিকশিত অংশটিও দুই ভাগে ভাগ থাকবে তাতে অবাক হবার কী আছে? তবে এখানে যে জিনিসটি বিচিত্র সেটি হচ্ছে মস্তিষ্কের এই বাম এবং ডান গোলার্ধ একজন মানুষের চরিত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। একেবারে এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে বাম গোলার্ধ হচ্ছে যুক্তি এবং বিশ্লেষণের জন্যে (critical analysis) এবং ডান গোলার্ধ হচ্ছে অর্ন্তজ্ঞান (intution) এর জন্যে। মস্তিষ্কের এই দুটি গোলার্ধ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দায়িত্ব পালন করলেও তারা একেবারে আলাদা নয়। এই দুটি আলাদা গোলার্ধ কর্পাস কেলুসাম নামে এক ধরনের নিউরাল তন্তু দিয়ে যুক্ত। অর্থাৎ, বাম এবং ডান গোলার্ধের মাঝে যোগাযোগ আছে এবং একজন মানুষ একই সাথে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে আবার নিজের অর্ন্তজ্ঞানও খানিকটা ব্যবহার করতে পারে।

মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে যুক্তিবাদী চিন্তা এবং বিশ্লেষণ ছাড়াও ভাষা, নিয়ম, পদ্ধতি, গণিত, পরিমিতি বোধ এই বিষয়গুলোও নিয়ন্ত্রণ করে। আবার ডান গোলার্ধে রয়েছে একটা বস্তুকে দেখে তার জ্যামিতিক বা ত্রিমাত্রিক রূপ বোঝার শক্তি, দার্শনিক চিন্তা, অবচেতন এবং উপমা বা কল্পনার জগৎ অনুভব করার ক্ষমতা। বাম গোলার্ধে সবকিছু ঘটে পরপর, ডান গোলার্ধে সামগ্রিকভাবে একসাথে। একেবারে ভিন্ন ধরনের দুটি মননশীল প্রক্রিয়া দুই গোলার্ধে আলাদা আলাদাভাবে ঘটে এবং কর্পাস কেলুসামের সেতু দুধরনের প্রক্রিয়ার মাঝে একটা সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। কাজেই যে মানুষটির ভেতর কল্পনার একটা জগৎ রয়েছে, জীবন সম্পর্কে দার্শনিকভাবে চিন্তা করে সেই একই মানুষ জীবনের খুঁটিনাটি হিসেবগুলোও করে সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারপরেও আমরা কিন্তু একজন মানুষের মাঝে তার মস্তিষ্কের একটা গোলার্ধের প্রাধান্য খুঁজে পাই। যাদের ভেতর বাম গোলার্ধের প্রাধান্য বেশি তারা অত্যন্ত হিসেবী এবং সতর্ক। যার ভেতরে ডান গোলার্ধের প্রাধান্য সে একটু কল্পনাপ্রবণ, অর্ন্তজ্ঞানের উপর একটু বেশি নির্ভরশীল মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

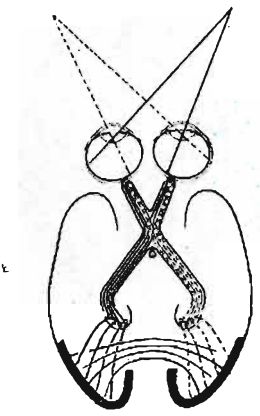

11.3 নং ছবি : মানুষের শরীরের ডান পাশের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের বাম পাশের অংশ, বাম পাশের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের ডান পাশের অংশ।

মানুষের মস্তিষ্কের বাম এবং ডান গোলার্ধ যে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুব চমৎকার গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাটি করা সম্ভব হয়েছে কিছু দুর্ভাগা মানুষের কারণে। এই মানুষগুলো মৃগী রোগাক্রান্ত এবং তাদের অবস্থা এতই ভয়ানক যে প্রতি ঘণ্টায় কয়েক বার মৃগী রোগের খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। কোনো উপায় না দেখে মস্তিষ্কের ডাক্তাররা অনেক চিন্তাভাবনা করে তাদের মস্তিষ্কের বাম এবং ডান গোলার্ধের যে যোগসূত্র সেই কর্পাস ফেলুসামটিকে কেটে দিলেন। এর ফলে তাদের মৃগী রোগের খিঁচুনির সমস্যা প্রায় পুরাপুরি মিটে গেল এবং আপাতঃদৃষ্টিতে তাদেরকে পুরাপুরি স্বাভাবিক মানুষ মনে হতে লাগল। কিন্তু কর্পাস কেলুসাম কেটে দেয়ার কারণে বাম গোলার্ধ এবং ডান গোলার্ধের মাঝে আর কোনো যোগাযোগ রইল না। তাদের মস্তিষ্কে দুটো গোলার্ধই আছে কিন্তু সেগুলো আর একসাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে না। সেগুলো কাজ করে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে।

এই মানুষগুলোকে আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ মনে হলেও তাদের ভেতর কিছু অস্বাভাবিক বিষয় লক্ষ করা গেল। সেই অস্বাভাবিক বিষয়গুলো বোঝার জন্যে আরেকটা বিষয় জানা দরকার, মানুষের শরীরের ডানদিকের অংশ— হাত, পা, চোখের ডান পাশের দৃশ্যমান এলাকা, নাকের ডান অংশের গন্ধ নেবার ক্ষমতা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের বাম দিকের গোলার্ধ। ঠিক সেরকম তার শরীরের বাম দিকের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ডানদিকের অংশ। এবারে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগুলোর কথা বলা যেতে পারে। তারা দ্বিখণ্ডিত মস্তিষ্কের এই মানুষগুলোকে ত্রিমাত্রিক কিছু ছবি দেখিয়ে সেগুলো আঁকতে বললেন, একবার বাম হাতে আরেকবার ডান হাতে। আমরা আগেই বলেছি মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধ ত্রিমাত্রিক রূপ বুঝতে পারে ডান গোলার্ধ বাম হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই দেখা গেল বাম হাত দিয়ে মানুষগুলো বেশ সুন্দর করে ত্রিমাত্রিক ছবি একেঁছে। আবার সেই একই মানুষ যখন ডান হাত দিয়ে সেই একই ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে (যদিও সে ডান হাত দিয়েই সবকিছু করে) দেখা গেল কিছুই আঁকতে পারছে না। তার ডান হাতটি নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ সেটি ত্রিমাত্রিক রূপ ধরতে পারে না। যেহেতু মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের

11.4 নং ছবি : মস্তিষ্কের ডান এবং বাম অংশ দ্বিখণ্ডিত করে দিলে মানুষ কিছু-কিছু বিচিত্র কাজ করে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে সব যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে তাই এক গোলার্ধ আর অন্য গোলার্ধকে সাহায্য করতে পারছে না। দ্বিখণ্ডিত মস্তিষ্কের মানুষগুলোকে নিয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ পরীক্ষাটি ছিল এ-রকম (11.4নং ছবি): তার সামনে বাম চোখের দৃষ্টি সীমার মাঝে "বই" লেখা শব্দ রেখে মানুষটাকে জিজ্ঞেস করা হলো এখানে কী লেখা আছে? মানুষটাকে পুরাপুরি বিভ্রান্ত দেখা গেল, সে দেখছে শব্দটা বই কিন্তু সেটা বলতে পারছে না। কারণ, যেহেতু বাম চোখের দৃষ্টি সীমার মাঝে সেটা গিয়েছে মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধে, কিন্তু মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধে ভাষার ব্যাপারটি নেই তাই মানুষ "বই"য়ের মতো পরিচিত শব্দটাও মুখে বলতে পারছে না। তখন তাকে বলা হলো শব্দটা লেখো মানুষটা বাম হাতে পরিষ্কার লিখে ফেলল "বই"। যেহেতু সেটা মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধে আছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করছে বাম হাত তাই বাম হাতে লেখা তার জন্যে কোনো সমস্যা নয়। দ্বিখণ্ডিত মস্তিষ্কের এই মানুষটি শব্দটি লিখতে পারে কিন্তু বলতে পারে না!

যে বিজ্ঞানী মানুষের ডান এবং বাম মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করে এই বিষয়গুলো আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম রজার স্পেরী, তিনি তার এই কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মস্তিষ্কের বাম এবং ডান গোলার্ধের এই চমকপ্রদ বিষয়গুলো কিন্তু আমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ধারণা করা হয় আমাদের সচেতন সময়ে বাম গোলার্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা যখন ঘুমাই তখন বাম গোলার্ধ দমিত হয়ে থাকে। হঠাৎ করে যদি কাউকে ঘুম থেকে জাগানো হয়, দেখা যায় সে পরিষ্কার জানে কী বলতে হবে কিন্তু কথা বলতে পারে না! ভাষার নিয়ন্ত্রণ বাম গোলার্ধে ঘুমের মাঝে সেটা দমিত ছিল তাই হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণটা নিতে পারছে না। পুরাপুরি জেগে ওঠার পরেই শুধু একজন মানুষ গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

AMARBOI.COM

ধারণা করা হয় আদিকালে নিওকর্টেক্সের দুই অংশই একই ধরনের দায়িত্ব পালন করতো। বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে দুই গোলার্ধ যুক্তিতর্ক এবং অবচেতন মনের অন্তর্জ্ঞানসংক্রান্ত কাজ এই দুটি দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছে। বাম গোলার্ধ একটু বেশি হিসেবি, ডান গোলার্ধ একটু বেশি কল্পনা প্রবণ। নূতন পৃথিবীতে চেষ্টা করা হচ্ছে সফল মানুষকে তাদের মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধকেই সুষম উপস্থাপন করে সমন্বয় করা শিখতে।

তা হলেই হয়তো তারা সত্যিকার মানুষ হতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12. বুদ্ধিমত্তা : মস্তিষ্কের ভেতরে এবং বাইরে

প্রাণিজগতে সবারই কমবেশি বুদ্ধিমত্তা রয়েছে— মানুষ হিসেবে আমাদের বুদ্ধিমত্তা সবচেয়ে বেশি। এই বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আমরা কী করতে পারি চারপাশে তাকালেই সেটা চোখে পড়ে। তার সবগুলোই যে খুব ভালো সেটা খুব জোর দিয়ে বলা যাবে না। যেমন আমাদের এই বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই আমরা সমস্ত পৃথিবীটাকে অনেকবার ধ্বংস করে ফেলার মতো অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করে মহানন্দে বসে আছি। তবে মানুষের শুভ বুদ্ধির ওপরে আমাদের বিশ্বাস আছে, শেষ পর্যন্ত মানব জাতি সভ্যতার পথ ধরে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে এটা আমরা সব সময়েই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

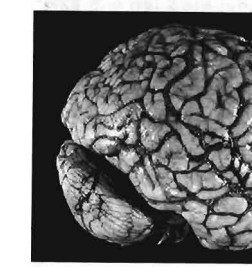

12.1 নং ছবি : মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন দেড় লিটারের মতো, এর ওজন দেড় কেজির কাছাকাছি।

আমাদের কিংবা অন্য প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা শরীরের যে জৈবিক অংশ থেকে আসে সেটাকে আমরা বলি মস্তিষ্ক। "অমুকের কলিজা খুব শক্ত" "অমুকের হৃদয়টা খুব নরম" কিংবা "অমুকের বুকে খুব কষ্ট" এ-রকম কথাবার্তা বলে আমরা মানুষের চরিত্র বা অনুভূতির জন্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের নাম ব্যবহার করলেও আসলে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজি থেকে একটু কম (1375 gm)। মস্তিষ্কের ঘনত্ব শরীরের অন্যান্য টিস্যুর মতো পানির ঘনত্বের কাছাকাছি। কাজেই মস্তিষ্কের আয়তন দেড় লিটারের মতো (1375cc)। অর্থাৎ, মাঝারি মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতলে মানুষের পুরো মস্তিষ্কটা এঁটে যায়।

তবে সব মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন সমান নয়। পূর্ব দেশীয় মানুষের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে পশ্চিম দেশীয় মানুষ থেকে বড়। আবার পুরুষের মাস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12.2 নং ছবি : কবি বায়রনের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল অনেক বড়।

মহিলাদের মস্তিষ্ক থেকে বড়। তবে আয়াতনের এই পার্থক্যটুকু কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীতে আয়তনে বড় মস্তিষ্কের মানুষের মাঝে রয়েছেন কবি বায়রন বা ইভান তুর্গনেভ (2,200 gm)। তবে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ব্যবহারে পৃথিবী থেকে একজনকে বেছে নিতে হলে যে মানুষটিকে বেছে নিতে হবে তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, তার মস্তিষ্ক কিন্তু বায়রন বা তুর্গনেভের মতো বড় ছিল না। আবার পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ থেকেও বেশি প্রতিভাবান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক আনাতলি ফ্রান্সের (Anatolc Frana) মস্তিষ্কের আয়তন ছিল রীতিমতো ছোট (মাত্র 1100 gm)— বায়রনের অর্ধেক। কাজেই একজন মানুষের মস্তিষ্কের আয়াতন বা ওজন যেটুকু হওয়া উচিৎ, তার চাইতে দুই একশ গ্রাম বেশি বা কম হলে সেটা বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য সৃষ্টি করে না, সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

একটা বড় প্রাণী হলে তার বড় শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে তুলনামূলকভাবে একটা বড় মস্তিষ্ক দরকার আবার প্রাণীটা ছোট হলে তার ছোট শরীরের নিয়ন্ত্রণের জন্যে মস্তিষ্কটা ছোট হলেই চলে। কাজেই মস্তিষ্কের প্রকৃত পরিমাণ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেটি তার শরীরের ওজনের কত অংশ। গবেষকরা পৃথিবীর সকল প্রাণীর মস্তিষ্কের ওজনকে শরীরের ওজন দিয়ে ভাগ দিয়ে একটা চমকপ্রদ তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। তারা দেখেছেন প্রাণিজগতকে সুনির্দিষ্টভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে পড়ে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি, অন্যভাগে পড়ে মাছ এবং সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী। সব সময়েই দেখা গেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদের মস্তিষ্কের আকার মাছ এবং সরিসৃপ থেকে প্রায় দশগুন বেশি। গবেষকদের এই তথ্য ছাড়াও আমরা কিন্তু এই তথ্যের কথা অনুমান করতে পারতাম। অনেক মানুষই সঙ্গী হিসেবে কুকুর কিংবা বেড়াল পুষে। সার্কাসে বাঘ, ভালুক, হাতি, ঘোড়া এমন কি পাখিদের ট্রেনিং দিয়ে খেলা দেখানো হয়। মাছ কিংবা সরীসৃপদের ট্রেনিং দিয়ে খেলা দেখানোর কোনো রেওয়াজ নেই। আমাদের দেশে সাপুড়েরা সাপের 'খেলা' দেখায় কিন্তু সেটা কোনো বুদ্ধির খেলা নয়। সাপুড়েরা ঝাঁপি থেকে তাদের বের করে এবং সাপগুলো ফণা তুলে বসে থাকে, এই পর্যন্তই। পৃথিবীর অনেক বিনোদন কেন্দ্রে ডলফিন এবং তিমি মাছ খেলা

12.3 নং ছবি : কথা সাহিত্যিক ইভান তুর্গনেভের মস্তিষ্কটি ছিল সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বড়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12.4 নং ছবি : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক আনাতলী ফ্রান্সের মস্তিষ্ক ছিল খুবই ছোট, কবি বায়রনের মস্তিষ্কের অর্ধেক।

দেখায় কিন্তু সেগুলোকে মাছ বলা হলেও আসলে তারা মাছ নয়, আসলে সেগুলো স্তন্যপায়ী প্রাণী।

একটা প্রাণীর শরীরের তুলনায় তার মস্তিষ্ক কত বড় সেটা বুদ্ধিমত্তার একটা পরিমাপ হতে পারে জানার পর স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটা প্রথমে আসে সেটা হচ্ছে কোন প্রাণী এই তালিকায় সবার আগে? কার মস্তিষ্ক তার শরীরের তুলনায় সবচেয়ে বড়? উত্তরটা অনুমান করা খুব কঠিন নয়— প্রাণীটা হচ্ছে মানুষ। এদিক দিয়ে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রাণী হচ্ছে ডলফিন। সম্ভবত এটা মোটেও কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে ডলফিনের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নাবিক এবং জাহাজীদের মাঝে অসাধারণ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। অতি সাম্প্রতিক সুনামির সময়েও ডলফিনদের বুদ্ধি ব্যবহার করে কিছু মানুষের প্রাণরক্ষার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে।

পৃথিবীর অতিকায় প্রাণীদের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ব্লু হোয়েল এবং অবলুপ্ত প্রাণীদের মাঝে হচ্ছে ডাইনোসর। ডাইনোসর সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী তাই তাদের মস্তিষ্কের আকার ছোট হওয়ারই কথা কিন্তু ব্লু হোয়েল জাতীয় তিমিদের তুলনায় তার মস্তিষ্ক একশ গুণ ছোট। মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সেটা প্রায় সাড়ে ছয়গুণ বড়, এই তিমিরা তাদের এত বড় মস্তিষ্ক দিয়ে কী করে সেটা অনেকের কাছেই রহস্য। তাদের কী চিন্তা করার ক্ষমতা আছে? দূরদৃষ্টি আছে? দুঃখ বা ভালোবাসার মতো উন্নত অনুভূতি আছে? মাঝে মাঝেই যে তিমি মাছেরা দল বেঁধে সমুদ্রের তীরে বালুবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয় তার পিছনে কী কোনো বেদনা বা বিষণ্নতা কাজ করে? কে তার উত্তর দেবে!

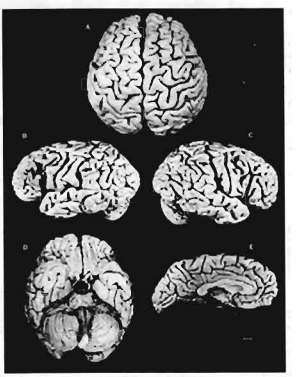

12.5 নং ছবি : সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক তার মৃত্যুর পর কেটে সরিয়ে নেয়া হয়। মস্তিষ্কটির বিভিন্ন ছবি, সেটি কিন্তু মোটেও অস্বাভাবিক বড় আকারের ছিল না।

মস্তিষ্কের আয়াতন বা ওজন নিয়ে কথা বলতে চাইলেই তার ভেতরকার তথ্য বা বুদ্ধিমত্তাকে কোন একধরনের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছে করে। মানুষের মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরণের সংখ্যা হচ্ছে দশ বিলিওন (এক হাজার কোটি)। এই নিউরনগুলো অন্য নিউরনের সাথে যে যোগসূত্র দিয়ে যুক্ত তার নাম হচ্ছে সিনাপ্স। প্রতিটি নিউরণের গড়ে এক হাজারটি করে সিনাপ্স রয়েছে এবং সেই এক হাজার সিনাপ্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে প্রত্যেকটি নিউরন আরো এক হাজার নিউরনের সাথে যোগাযোগ রাখে। আজকাল কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে তথ্যকে আমরা বিট (bit) হিসেবে গুণতে শিখেছি। কোনো একটা তথ্যকে যদি একটি "হ্যাঁ" কিংবা একটি "না" দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে একটি বিট। কাজেই আমরা যদি ধরে নিই সিনাপ্স সংযোগ শুধু মাত্র 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' দিয়ে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয় তাহলে যেহেতু মোট সিনাপ্সের সংখ্যা হচ্ছে দশ হাজার বিলিওন (দশ লক্ষ কোটি) কাজেই মস্তিষ্কের রাখা তথ্যের পরিমাণও হবে দশ হাজার বিলিওন বিট বা কম্পিউটারের ভাষায় এক টেরা বাইট।

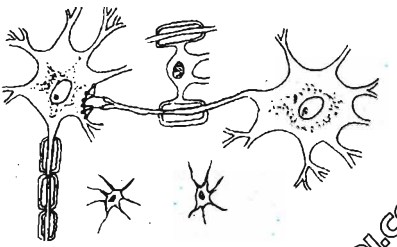

12.6 নং ছবি : মস্তিষ্কের নিউরনের সংখ্যা দশ বিলিওন এক নিউরন অন্য নিউরনের সাথে যোগাযোগ করে থাকে দিয়ে।

এটি বেশি কিংবা কম সেই বিষয়ে যাবার আগে আমরা অন্য একটা বিষয় দেখতে পারি। যদি মাথায় শুধু একটা সিনাপ্স থাকত তাহলে পুরো মস্তিষ্ক শুধু দুটো অবস্থায় থাকতে পারতো (একটি হচ্ছে 'হ্যাঁ' অন্যটি হচ্ছে 'না')। যদি সিনাপ্স সংখ্যা হতো দুই তাহলে মস্তিষ্কের সম্ভাব্য অবস্থা হতে পারতো চার যেমটি 'হ্যাঁ' দ্বিতীয়টি 'হ্যাঁ,' প্রথমটি 'হ্যাঁ' দ্বিতীয়টি 'না', প্রথমটি 'না' দ্বিতীয়টি 'হ্যাঁ এবং প্রথমটি 'না' দ্বিতীয়টিও 'না')। সিনাপ্সের সংখ্যা যদি হতো তিন তাহলে মস্তিষ্কের সম্ভাব্য অবস্থা হতো আট। এভাবে আমরা দেখাতে পারি সিনাপ্স সংখ্যা যখন দশ হাজার বিলিওন তখন আমাদের মস্তিষ্কের সম্ভাব্য অবস্থার মোট সংখ্যা হচ্ছে 10^{39}, ছোট একটুখানি জায়গায় লিখে ফেললেও সংখ্যাটি অনেক বড়, আমাদের এই সৃষ্টিজগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত অনু-পরমাণু আছে এটি তার থেকেও বড়। মানুষের মস্তিষ্ক এই অচিন্ত্যনীয় সংখ্যক অবস্থায় মাঝে যেতে পারে। একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় কখনোই তার সকল সম্ভাবনাগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। সব মানুষের মস্তিষ্কেই অসংখ্য অজানা অবস্থাগুলো রয়ে যায় তাই প্রত্যেকটা মানুষই এত স্বতন্ত্র এত ভিন্ন। মানুষের মাঝে তাই এত রহস্য। মনে রাখতে হবে কম্পিউটারে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরে শুধু 'হ্যাঁ' 'না' এই দুটি পর্যায় থাকতে পারে বলে আমরা সিনাপ্সের বেলাতেও তাই ধরেছি। মানুষের সিনাপ্সে ট্রানজিস্টরের সীমাবদ্ধতা নেই, সেগুলোকে শুধু 'হ্যাঁ' 'না' এই দুই পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় না, প্রতিটি সংযোগ আরো বেশি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে পারে। কাজেই মস্তিষ্কের প্রকৃত অবস্থার সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

মানুষের মস্তিষ্কের সাথে কম্পিউটারের তুলনা করা এক অর্থে ছেলেমানুষি একটি প্রক্রিয়া হলেও সেটা যখন শুরু করা হয়েছে সেটাকে আরো একটু এগিয়ে নেয়া যায়। আমরা যদি তথ্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংরক্ষণের ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক চীপস বা ইন্টেগ্রেটেড সার্কিটের সাথে মস্তিষ্কের তুলনা করি তাহলে দেখব আমরা প্রতি একক আয়াতনে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এখনো দশ হাজার গুণ পিছিয়ে আছি। অন্যভাবে বলা যায় মানুষের মস্তিষ্কে যেটুকু আয়াতনে যতটুকু তথ্য রাখা যায়, ইন্টোগ্রটেড সার্কিটে একই পরিমাণ তথ্য রাখতে হলে তার জন্যে জায়গা লাগবে দশ হাজার গুণ বেশি!

বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে প্রাণীর মাঝে পরীক্ষা করে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষের জন্যে আশাব্যঞ্জক তথ্য পেয়েছেন। তারা দেখেছেন একটা প্রাণীকে যদি খুব সাদামাটাভাবে রাখা হয় তাহলে তার মস্তিষ্কও হয় সাদামাটা। কিন্তু প্রাণীটাকে যদি খুব উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে নানারকম সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে রাখা হয় তাহলে তার মস্তিষ্কের গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। তার মস্তিষ্কের সিনাপ্সের মাঝে নূতন নূতন সংযোগ তৈরি হতে থাকে। আমরা মানুষের মেধা বলে একটা কথা ব্যবহার করি, সেই 'মেধা' শব্দটি দিয়ে আমরা যদি চিন্তাভাবনা বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকি তাহলে বুঝতে হবে একজন মানুষ যেটুকু মেধা নিয়ে জন্ম নিয়েছে তাকে ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না। সে ক্রমাগত তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে নূতন কিছু শিখে তার নিউরনের নূতন সিনাপ্স সংযোগ বাড়াতে পারে, অন্য কথায় বলা যায় তার মেধা বাড়াতে পারে।

আমরা জানি সব প্রাণীই এক ধরনের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বড় হয়। বাঘ যখন হরিণ শিকার করে তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, মাকড়াশা যখন জাল বুনে সেখানেও সে তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। আরও ক্ষুদ্র প্রাণী বা জীবাণু যখন অন্য কোনো প্রাণীকে আক্রমণ করে তখনও সে তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে। যে সব প্রাণীর মস্তিষ্ক রয়েছে তাদের বুদ্ধিমত্তার বড় অংশ থাকে মস্তিষ্কে কিন্তু যাদের মস্তিষ্ক নেই সেই জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা থাকে কোথায়? সেগুলো থাকে তাদের জীনস এর মাঝে ডি.এন.এ সাজানো নিওক্লিওটাইডে। এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা তথ্য কিন্তু কম নয়। একজন মানুষের শরীরের একটি ক্রমোজমে প্রায় 5 বিলিওন নিওক্লিওটাইডের জোড়া। A,T,C এবং G এই চার ধরনের নিউক্লিওটাইড দিয়ে 20 বিলিওন বিটস তথ্য রাখা সম্ভব। মানুষে মস্তিষ্কের মাঝে রাখা তথ্যের তুলনায় সেটি মোটেও কম নয়। তবে এই তথ্যগুলো নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায় না, বাড়ানো যায় না, কমানো যায় না। প্রকৃতির নীল নকশা অনুযায়ী এটা পাকাপাকিভাবে রেখে দেয়া হয়েছে।

প্রাণিজগৎ বিবর্তনের মাঝে দিয়ে এ-রকম অবস্থায় পৌঁচেছে। একটা সময় ছিল যখন প্রাণিজগতের পুরো বুদ্ধিমত্তাটাই ছিল এই জিন্স বা ডি.এন.এ.র ভেতরে। ধীরে ধীরে প্রাণিজগতের মাঝে মস্তিষ্কের বিকাশ হলো এবং এই মস্তিষ্কে বুদ্ধিমত্তার জন্ম হতে শুরু করল। আজ থেকে প্রায় একশ মিলিওন (দশ কোটি) বছর আগে প্রথমবারের মতো একটা প্রাণীর মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা তার ডি.এন.এ.তে রাখা বুদ্ধিমত্তাকে অতিক্রম করে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবর্তনের পরিমাপে নিঃসন্দেহে সেটা ছিল খুব বড় একটা মাইলফলক। ধীরে ধীরে সরীসৃপের জন্ম হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী এলো এবং একসময় মানুষের জন্ম হলো।

বুদ্ধিমত্তার হিসেবে মানুষ কিন্তু অন্যসব প্রাণী থেকে একটি বিষয়ে একেবারে আলাদা। মানুষ হচ্ছে প্রথম প্রাণী যে তার বুদ্ধিমত্তার জন্যে শুধুমাত্র তার মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের অনেক বুদ্ধিমত্তা তার মস্তিষ্কের বাইরে, বইপত্রে, কাগজে জার্নালে। অনেক তথ্য কম্পিউটারে, লাইব্রেরিতে, ইন্টারনেটে। একটা প্রাণী যখন বুদ্ধিমত্তার জন্যে হঠাৎ করে শুধুমাত্র তার মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল না থাকে সে মস্তিষ্কের বাইরে থেকে বুদ্ধিমত্তা সংগ্রহ করতে পারে তখন পুরো বিষয়টা অন্যরকম হয়ে যায়।

এ-রকম একটা প্রাণীর বিবর্তন কেমন করে অগ্রসর হয় আমরা আজ সেটা বলতে পারব না। আজ থেকে লক্ষ বৎসর পরের মানুষ সেটা সে খুব কৌতূহলী হয়ে দেখবেন সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

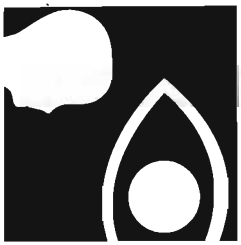

13. ঘুমের কলকব্জা

আমাদের জীবনে যে কয়টা নিয়মিত বিষয় রয়েছে ঘুম হচ্ছে তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি। আমাদের সবার প্রত্যেকদিন ঘুমাতে হয়। কেউ একটু বেশি ঘুমায় কেউ একটু কম। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ঘুমটাকে সময় নষ্ট বলে মনে করতেন তাই তিনি রাতে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতেন। আবার বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলতেন রাতে যদি তিনি দশ ঘণ্টা না ঘুমান তিনি ঠিক করে কাজ করতে পারেন না। যেহেতু চব্বিশঘণ্টার মাঝে সবাইকে একবার হলেও ঘুমাতে হয় তাই সবারই জানা উচিত তার আসলে কতটুকু ঘুমের দরকার। দেখা গেছে যার যেটুকু ঘুমের দরকার সে যদি তার থেকে কম সময় ঘুমায় তাহলে সে হয়তো এক দুই ঘণ্টা সময় বাচিয়ে ফেলে ঠিকই কিন্তু আসলে খুব একটা লাভ হয় না। কম ঘুমানোর কারণে সে সারা দিন ঘুমঘুম ভাব নিয়ে থাকে, তার মাঝে সতেজ উৎফুল্ল ভাবটা থাকে না, খিটখিটে মেজাজ হয়ে থাকে বলে সে আসলে যতটুকু কাজ যত সুন্দরভাবে করতে পারতো তার কিছুই পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবেষণা করে দেখেছে কম ঘুমনোর কারণে গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে সেই দেশে বছরে প্রায় দুই লক্ষ একসিডেন্ট হয়ে মানুষ মারা যায় প্রায় পাঁচ হাজার। একটা সময় ছিল যখন দিনের বেলা সবাই কাজকর্ম করতো, রাত্রিবেলাটি ছিল বিশ্রামের। লাইট বাল্ব অবিষ্কার হওয়ার পর হঠাৎ করে রাত আর রাত থাকল না। বলা যায় রাতারাতি দিন রাতের পার্থক্যটা ঘুচে যাওয়ায় মানুষের ঘুমের সময় কমে এলো। পৃথিবী এখন রাতে ঘুমায় না, রাতের পৃথিবী সচল রাখার জন্যে অনেক মানুষকে রাতে কাজ করতে হয়। দেখা গেছে যারা রাতে

13.1 নং ছবি: আমাদের সবাইকে প্রতিদিন ঘুমাতে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

13.2 বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন. রাতে ঘুমাতেন মাত্র চার ঘণ্টা।

কাজ করে তাদের অর্ধেক মানুষই কখনো-কখনো কাজের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজের ক্ষতি হয়, একসিডেন্ট হয়, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে সত্তর বিলিওন ডলার (প্রায় চাশ বিশ হাজার কোটি টাকা)। শুধু যে আর্থিক ক্ষতি তা নয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুটি নিউক্লিয়ার একসিডেন্ট চেরনোবিল এবং থ্রি মাইল আইল্যান্ড হয়েছিল ভোররাতে, যখন মানুষ হয় সবচেয়ে ঘুমকাতুরে সবেচেয়ে ক্লান্ত। দু জায়গাতেই দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছিল কারণ রাতের শিফটের কর্মকর্তরা বিপদ সংকেতগুলো সময়মতো ধরতে পারে নি।

আধুনিক পৃথিবীতে আমরা এখন শুধু ছুটছি, আমাদের বিশ্রাম নেবার সময় নেই। আমরা চেষ্টা করি কম সময় ঘুমিয়ে কত বেশি কাজ করতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ঘুম নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, ঘুম এমন একটা বিষয় যে এখানে ফাঁকি দেবার কোনো সুযোগ নেই। একজন মানুষের যেটুকু ঘুমের দরকার তাকে ততটুকু ঘুমাতেই হবে, যদি না ঘুমায় তাহলে তাকে জীবনের অন্য জায়গায় অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে।

আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ জন্মের পর থেকেই নিয়মিতভাবে ঘুমাচ্ছে কিন্তু ঘুম বিষয়টা কী সেটা নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান মাথা ঘামাতে শুরু করেছে তুলনামূলকভালো অনেক পরে। 1931 সালে হ্যান্স বার্গার নামে একজন জার্মান মনোবিজ্ঞানী প্রথমবার মানুষের মাথায় ইলেকট্রড লাগিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনাল মাপার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখলেন মানুষ জেগে থাকলে তার মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনালগুলো (EEG) হয় দ্রুত কম্পনশীল। যখন সে ঘুমিয়ে যায় তখন কম্পন কমে আসে কিন্তু সিগন্যালগুলো হয় বড়। সোজা কথায় বলা যেতে পারে একজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে নাকী ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে সেটা তার মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক সিগন্যালটা দেখেই বুঝে ফেলা যাবে!

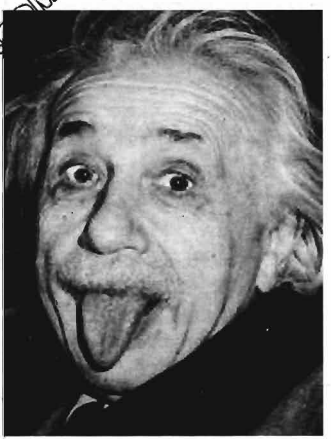

13.3 নং ছবি: আইনস্টাইন বলতেন- রাতে যদি তিনি দশ ঘণ্টা না ঘুমান তাহলে তিনি ঠিক করে কাজ করতে পারেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

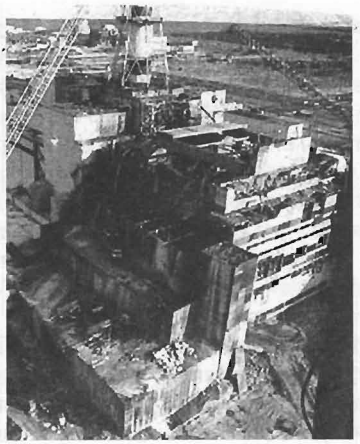

13.4 নং ছবি : নিউক্লিয়ার একসিডেন্ট চেরনোবিল হয়েছিল ভোর রাতে যখন রাতের শিফটের কর্মকর্তারা ছিলেন ঘুম কাতুরে, বিপদ সংকেতগুলো ঠিক করে ধরতে পারেন নি।

তাদের চোখ নড়তে শুরু করে, মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনাল দ্রুততর হয়ে উঠে। ঘুমের এই স্তরে চোখ দ্রুত নড়তে থাকে বলে এটাকে বলা হয় 'দ্রুত চোখ সঞ্চালন স্তর' (Rapid Eye Movement) সংক্ষেপে REM। এ-রকম সময়ে যদি ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে তোলা হয় তাহলে তারা প্রায় সব সময়েই বলে থাকে যে তারা কিছু একটা স্বপ্ন দেখছিল। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো এর গবেষকরা ঘুমের উপর এই নতুন স্তর আবিষ্কার করার পর পৃথিবীর অন্যান্য গবেষকরা গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন, ঘুম বললেই আমাদের মস্তিষ্ক পুরাপুরি অচেতন হয়ে যাচ্ছে বলে যে রকম ধারণা হয় সেটা একেবারেই সত্যি নয়। ঘুমের মাঝে

1935 সালে হার্ভাড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা দেখলেন ঘুমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং ঘুমের বিভিন্ন স্তরে (প্রাথমিক থেকে গভীর ঘুম) মানুষের মস্তিষ্কের (EEG) বৈদ্যুতিক সিগনালগুলোরও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন হয়। মানুষ যেহেতু শোয়ার ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে তাই গবেষকরা প্রথম ঘণ্টা দুয়েকের তথ্য নিয়েই সুন্তষ্ট ছিলেন। গভীর ঘুমে অচেতন হওয়ার পরেও যে মানুষের মস্তিষ্কে অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু ব্যাপার ঘটতে থাকে তারা সেটা কখনো জানতে পারেন নি। সেই ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়েছে প্রায় দুই দশক পরে, ইউজিন আজেরিনস্কী নামে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো এর "ঘুম ল্যাবরেটরির" একজন ছাত্র-গবেষকের চোখে। তার চোখে প্রথম ধরা পড়েছে যে গভীর ঘুমের পর মানুষের ঘুম আবার হালকা হয়ে যায় তখন হঠাৎ করে ঘুমের মাঝে

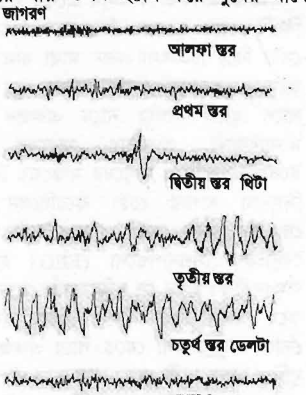

13.5 নং ছবি : ঘুমের বিভিন্ন স্তরে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মস্তিষ্কে হঠাৎ হঠাৎ পুরাপুরি কাজ করতে শুরু করে, শুধু মস্তিষ্ক নয় সাথে সাথে আমাদের শরীরও প্রায় সচেতন হয়ে উঠে। ঘুম হঠাৎ করে আমাদের সচেতন জীবনের কর্মদক্ষতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে উঠে।

13.5 নং ছবিতে মানুষের ঘুমের বিভিন্ন স্তরে তার মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনালগুলো (EEG) দেখানো হয়েছে। বিছানায় শোয়ার পর যখন একটু তন্দ্রামতো এসেছে, এখনো ঘুম আসে নি বলে জাগ্রত অবস্থা তবে শরীর শিথিল হয়ে এসেছে তখন মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনালের কম্পন থাকে সেকেন্ডে আট থেকে বারো, এটাকে বলে আলফা তরঙ্গ। আলফা স্তরে কয়েক মিনিট থাকার পর মানুষ ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে শুরু করে, মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সিগনালের কম্পনও কমে সেকেন্ডে চার থেকে আটে নেমে আসে। এই স্তরটির নাম থিটা স্তর বা ঘুমের প্রথম স্তর। এই স্তরে মানুষ দশ সেকেন্ড থেকে দশ মিনিটের মতো থাকতে পারে। ঘুমের প্রথম স্তরে থাকা কাউকে ডেকে তুললে সে সাধারণত চট করে জেগে উঠতে পারে। তার চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে তখনো সে মোটামুটি সজাগ থাকে।

থিটা স্তর বা ঘুমের প্রথম স্তর থেকে মানুষ ঘুমের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে, এখানে দশ থেকে বিশ মিনিটের মতো থাকতে পারে এবং এটাকে বলা যায় মানুষের সত্যিকার ঘুমের শুরু। এই স্তরে পৌঁছানোর পর মানুষ তার চারপাশের অবস্থার কথা পুরাপুরি ভুলে যায়।

ঘুমের দ্বিতীয় স্তর থেকে মানুষ তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে। তখন থিটা তরঙ্গের সাথে খুব ধীরে ধীরে লয়ের ডেলটা তরঙ্গ এসে হাজির হতে থাকে। কিছুক্ষণের ভেতরে থিটা তরঙ্গ পুরাপুরি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার বদলে ধীর লয়ের বড় বড় ডেলটা তরঙ্গ এসে হাজির হয়। এটাকে বলা হয় ঘুমের চতুর্থ স্তর বা গভীর ঘুম। ঘুমের চতুর্থ স্তর থেকে কাউকে জাগিয়ে তুললে চারপাশে কী হচ্ছে সে বুঝতে পারে না, ছোট বাচ্চারা এ-রকম অবস্থায় পৌঁছে গেলে তাদের কিছুতেই জাগিয়ে তোলা যায় না। মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে তখন তাদের রক্তচাপ তাপমাত্রা, হৃৎস্পন্দন এবং নিশ্বাসের গভীরতা কমে আসে। মস্তিষ্কে রক্তের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে কম এবং সারা শরীর পুরাপুরি শিথিল হয়ে আসে। মানুষের গ্রোথ হরমোন তখন সবচেয়ে বেশি শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, এইজন্যে শিশু কিশোরের শরীর গড়ে তোলার জন্যে চতুর্থ স্তর বা ডেলটা স্তরের ঘুমের খুব প্রয়োজন।

ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের গভীর ঘুমের পর মানুষ আবার আগের স্তরে ফিরে যেতে শুরু করে। চতুর্থ স্তর থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় কিন্তু দ্বিতীয় থেকে ঘুম এবং জাগরণের মাঝামাঝি প্রথম স্তরে না গিয়ে "দ্রুত চোখ সঞ্চালন" (Rapid Eye Movement বা REM) স্তরে চলে আসে। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, নিশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠে, রক্তচাপ বেড়ে যায়। মানুষ জেগে থাকলে যা হওয়ার কথা প্রায় সেরকমই হয় কিন্তু মানুষটা তখন ঘুমিয়েই থাকে এবং সাধারণত রাতের প্রথম স্বপ্নটি তখন দেখে।

এই স্তরে মানুষ এক থেকে দশ মিনিট থাকতে পারে তারপর আবার আগের মতো দ্বিতীয় তৃতীয় স্তর থেকে চতুর্থ স্তর বা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। প্রতি নব্বই থেকে একশ বিশ মিনিটে মানুষ একবার করে এই পুরো চক্রটির ভেতর দিয়ে যায়। প্রথম 'দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্ষু সঞ্চালন (REM) স্তর' থেকে দ্বিতীয় বারের স্থায়িত্ব আরো বেশি হয় এর পরের স্থায়িত্ব হয় আরো বেশি। ঘুমের এই বিভিন্ন স্তরগুলো 13.6 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

"দ্রুত চক্ষ সঞ্চালন" (REM) ঘুম মানুষের জন্যে খুব জরুরি। গবেষকরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন মানুষ সারা দিন সচেতনভাবে যেটা শিখে ঘুমের এই পর্যায়ে সেটাকে তার মস্তিষ্কে সঠিকভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন নিউরণের মাঝে সংযোগ তৈরি করে দেয়া হয়। এই সংযোগ করার প্রক্রিয়াটির কারণে মস্তিষ্কে তুমুল কর্মকাণ্ড হতে থাকে— তাই মস্তিষ্কের তরঙ্গ দেখলে মনে হয় মস্তিষ্কটি বুঝি পুরোপুরি সচেতন কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষটি ঘুমিয়ে আছে। একজন মানুষের পুরো জীবনটিই হচ্ছে নূতন নূতন বিষয় জানা, শেখা স্মৃতিতে ধরে রাখা যেন পরবর্তীতে সেটা ব্যবহার করতে পারে। মস্তিষ্কের মাঝে পাকাপাকিভাবে সংরক্ষণে এই কাজটি করা হতো "দ্রুত চক্ষু সঞ্চালন" (REM) স্তরে। এই স্তরটিতে না গেলে আমরা কখনোই আমাদের স্মৃতিশক্তিকে গড়ে তুলতে পারতাম না।

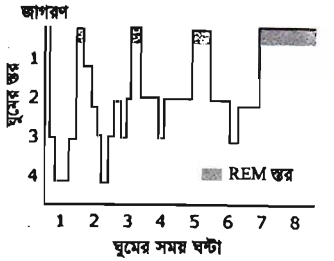

13.6 নং ছবি: মানুষ ঘুমানোর সময় দ্রুত চোখ সঞ্চালন বা REM স্তরে যায় যেটা জেগে থাকার সময়ই, মস্তিষ্কে তখন তুমুল কর্মকাণ্ড হতে থাকে।

AMARBOI.COM

পরীক্ষার আগে অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রায় সারারাত পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে যায়। তারা নিজের অজান্তেই নিজেদের অনেক বড় ক্ষতি করে বসে থাকে, সারারাত জেগে তারা যেটি পড়ে সেই বিষয়টা তাদের মস্তিষ্কে নাড়া চাড়া করে। কিন্তু না ঘুমানোর কারণে তারা মস্তিষ্কে সেটা পাকাপাকিভাবে বসাতে পারে না। তাই পরীক্ষার হলে যখন সেই তথ্যের প্রয়োজন হয় তারা আবিষ্কার করে সেটি তাদের মস্তিষ্কে নেই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

14. প্রাণীদের ভাবনার জগৎ

আমরা যখন কোনো চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মুখোমুখি হই তখন প্রায় সময়েই আমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন খেলা করে— সেটি হচ্ছে আমি যেটা যেভাবে দেখছি অন্যেরাও কি সেটা সেভাবে দেখছে? আমি যেটাকে সবুজ বলি অন্য একজনের কাছে কি সেটা আমার দেখা সবুজ নাকি অন্য কোনো রং! আমি যেটাকে লাল বলছি অন্যেরাও সেটাকে লাল বলছে কিন্তু তারা কী লাল রংটা ঠিক আমার মতো করেই দেখছে নাকি অন্য কোনোভাবে দেখছে? (আমরা জানি যারা কালার ব্লাইন্ড তারা কিছু-কিছু রং দেখতে পারেন না— কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার) ঠিক এইভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন হঠাৎ করে দেখি রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটি গরু উদাসভাবে তাকিয়ে আছে তখন কি আমাদের ভেতরে এক ধরনের কৌতূহল হয় না যে এই গরুটা এখন কী ভাবছে? নিশ্চিতভাবেই তাদের চিন্তার প্রক্রিয়াটি অনেক ভিন্ন কিন্তু কতটুকু ভিন্ন? তাদের ভেতরে কী ধরনের চিন্তা খেলা করে? তাদের ভেতরে কি মানবিক অনুভূতি আছে?

একদিন হঠাৎ পথের ধারে একটা পাখির ছানা আবিষ্কার করেছিলাম, সে তারা বাসা থেকে পড়ে গেছে। পাখির ছানার কাছেই তার মা, বাচ্চাটিকে রক্ষা করার জন্যে তার মায়ের যে আকুতি সেটা দেখে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম পাখিদের মাতৃস্নেহ আছে, কিন্তু সেই স্নেহটা কেমন? কতটুকু গভীর? আমরা কি সেটা কোনোদিন অনুভব করতে পারব?

বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছেন। পশুদের মানবিক অনুভূতি নিয়ে ষাটের দশকে একটা খুব বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল। এক্সপেরিমেন্টটা এ-রকম : একটা বানরকে (rhesus প্রজাতির বানর) প্রথমে শেখানো হলো যে একটা লিভার টানলে তার খাবারটুকু চলে আসে। বানরকে এটা শেখানো এমন কিছু কঠিন নয়— আমরা পথেঘাটে বানরের খেলা দেখি সেখানে বানর শ্বশুরবাড়িতে নববধূ কেমন আচরণ করে এ-রকম কঠিন বিষয় পর্যন্ত অনুকরণ করে দেখিয়ে ফেলে! যাই হোক বানরকে লিভার টেনে তার প্রাত্যহিক খাবার আনার ব্যবস্থাটা শিখিয়ে দেবার পর বিজ্ঞানীরা একটা খুব বিচিত্র কাজ করলেন, এই বানরের খাঁচার পাশেই আরেকটা খাঁচায় ভিন্ন একটা বানর রাখলেন। এখন তারা লিভারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

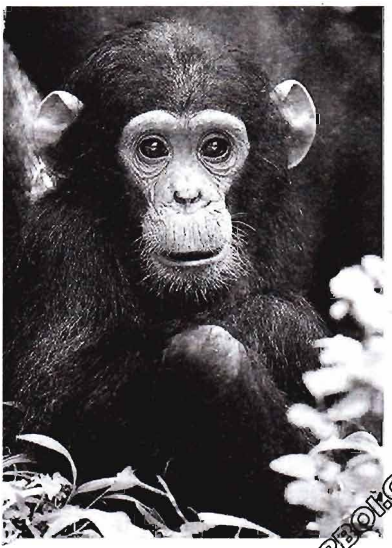

14.1 নং ছবি: আমরা যেটাকে সমবেদনা বলি বানর বা শিম্পাঞ্জীদের ভেতর সেটা বেশ ভালোভাবেই আছে।

সাথে এমনভাবে কিছু বৈদ্যুতিক যোগাযোগ করিয়ে দিলেন যে, এখন লিভারটি টানা হলে শুধু যে খাবার আসে তা নয়, তার সাথে সাথে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে। পাশের খাঁচায় যে বানরটা রাখা হয়েছে সেট বানরটি তখন একটা ভয়ংকর ইলেকট্রিক শক খায়— বলা বাহুল্য ইলেকট্রিক শক কোনো আরামদায়ক অনুভূতি নয় কাজেই বানরটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে লাফঝাঁপ দিয়ে তার কষ্ট এবং আতঙ্কটুকু খুব ভালোভাবে প্রকাশ করে দেয়। এখন বিজ্ঞানীরা একটা অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয় আবিষ্কার করলেন। প্রথম বানরটি যখন দেখল তার লিভার টানার কারণে অন্য একটি বানর কষ্ট পাচ্ছে সে তখন লিভার টানা বন্ধ করে দিল! লিভার না টানার কারণে তার খাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেছে, বেচারা বানর দিনের পর দিন অভুক্ত থাকা শুরু করল তবুও লিভার টেনে অন্য বানরকে কষ্ট দিল না। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাটি নানাভাবে করে মোটামুটি নিশ্চিত হলেন যে বানরের ভেতর চমৎকার একটা "মানবিক" অনুভূতি আছে। এই অনুভূতিটি অনেক বেশি স্পষ্ট হয় যদি সেই বানর নিজে অতীতে ইলেকট্রিক শক খেয়ে তার যন্ত্রণাটা অনুভব করে থাকে। পরিচিত এবং স্বজাতির জন্যে তাদের অনুভূতি বেশি থাকে, অপরিচিত কিংবা ভিন্ন প্রজাতির পশু হলে তাদের অনুভূতি কমে আসতে থাকে। বলা যেতে পারে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন, আমরা সেটাকে সমবেদনা বা মানবিক অনুভূতি বলি বানরের ভেতর সেটা বেশ ভালো পরিমাণেই আছে।

AMARBOI.COM

বিজ্ঞানীদের এই এক্সপেরিমেন্ট দেখে উৎসাহিত হয়ে স্ট্যানলি মিলগ্রাম নামে একজন মনোবিজ্ঞানী প্রায় এ ধরনের একটি এক্সপেরিমেন্ট করার উদ্যোগ নিলেন— তারা মানবিক অনুভূতিটি খোঁজার চেষ্টা করলেন মানুষের ভেতর! তাদের এক্সপেরিমেন্টেও একজন অন্যকে ইলেকট্রিক শক দেবে তবে দুজনেই হবে মানুষ— একজন মানুষ অন্য মানুষকে ইলেকট্রিক শক দেবে! একটা খাঁচার ভেতরে একটা মানুষকে আটকে রাখা হলো, বাইরে একটা সুইচ। সেই সুইচটা টিপে ধরলেই ভেতরের হতভাগা মানুষটা একটা ভয়াবহ ইলেকট্রিক শক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবে— যন্ত্রণায় বিকট স্বরে চিৎকার করবে মানুষটি।

এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে প্রথমে একটা মানুষকে বেছে নেয়া হয় যার মানবিক অনুভূতি পরীক্ষা করা হবে। তাকে বলা হয় তাকে নির্দেশ দিলে সে যেন সুইচ টিপে ধরে। তখন ল্যাব কোট পরা গুরুগম্ভীর একজন বিজ্ঞানী আসেন, এসে মানুষটিকে আদেশ দেন সুইচ টিপে ধরতে, মানুষটি তখন সুইচ টিপে ধরে আর ভয়াবহ ইলেকট্রিক শক খেয়ে খাঁচার ভেতরের মানুষটা বিকট চিৎকার করতে থাকে!

আমি নিশ্চিত সবাই একমত হবেন যে, এই ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করানোই একটা ভয়ংকর অমানবিক ব্যাপার। তবে আসলে বিষয়টা অন্যরকম। যে মানুষটির মানবিক অনুভূতি পরীক্ষা করা হচ্ছে যে জানে না খাঁচার ভেতরের মানুষটি একজন চৌকস অভিনেতা, তাকে মোটেও ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে না— সে ইলেকট্রিক শক খেয়ে যন্ত্রণার বিকট চিৎকার করার অভিনয় করছে! তার চেয়ে বড় কথা এই এক্সপেরিমেন্টটি মানুষের মানবিক অনুভূতি যাচাই করার জন্যে দাঁড়া করা হয় নি, এটি দাঁড়া করা হয়েছে কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্যের বিষয়টি যাচাই করার জন্যে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যাদের ভেতর কর্তৃত্বের ভাব আছে, তারা যখন হুকুম দেয় তাদের অনুগত মানুষেরা মুখ বুঁজে সেই হুকুম পালন করে ঘোরতর একটা অন্যায় কাজ করে ফেলতে দ্বিধা করে না।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলগ্রাম এক্সপেরিমেন্ট করে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও আমরা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা অনেকদিন থেকে জানি। 1971 সালে উপরওয়ালার হুকুমে সাধারণ সৈনিক পাখির মতো গুলী করে এই দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কারো মনে এতটুকু অপরাধবোধ জন্মে নি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে র‍্যাবের সদস্যরা ক্রসফায়ারের নাম করে একজনকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না এই একই কারণে— কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যে!

14.2 নং ছবি: 1971 উপরওয়ালার হুকুমে পাকিস্থানি সৈনিকেরা পাখির মতো গুলী করে এই দেশের মানুষকে হত্যা করেছে।

এটি খুবই বিচিত্র একটি ব্যাপার— আমরা বানরের ভেতরে মানবিক অনুভূতি খুঁজে পাই কিন্তু অনেক মানুষের ভেতর সেটা খুঁজে পাই না!

যাই হোক আমরা শুরু করেছিলাম একটা পশুর অনুভূতি অনুভব করার প্রশ্নটি দিয়ে। সেটি কি কখনো সম্ভব হবে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সেটি হতে পারে। মানুষের অনুভূতির ব্যাপারটি থাকে মস্তিষ্কে। ইতোমধ্যে মস্তিষ্কের টিস্যু স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। একজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তিষ্কের টিস্যু যদি আরেকজনের মস্তিষ্কে বসানো হয় তাহলে কি সেটি মানুষটির অনুভূতি স্থানান্তরের মতোই একটি ঘটনা নয়? শুধু যে একই প্রজাতির প্রাণীর মস্তিষ্কের টিস্যু স্থানান্তর করা হয়েছে তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের ভেতরেও মস্তিষ্কের টিস্যু স্থানান্তর করা হয়েছে। এটি মাত্র শুরু হয়েছে, আশা করা যায় আগামী পঞ্চাশ বছরে মানুষ সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে কেমন করে মস্তিষ্ক গড়ে উঠে, কেমন করে সেটা কখনো বুদ্ধিমত্তা, কখনো অনুভূতির জন্ম দেয়।

14.3 নং ছবি : আমরা বানরের ভেতর মানবিক অনুভূতি খুঁজে পাই কিন্তু অনেক সময় মানুষের ভেতরে সেটা খুঁজে পাই না।

একজনের অনুভূতি অন্য একজনের অনুভব করার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী মিজুয়েল নিকোলেলিস একটা চমকপ্রদ এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। একটা বানরের (Owl জাতির) মস্তিষ্কের অসংখ্য নিউরনের ইলেকট্রিক ডিসচার্জ শনাক্ত করে সেটাকে ব্যবহার করে একটা রবোটের হাতকে নাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা বুঝি একটা ছেলেমানুষী খেলনা, মাথার মাঝে কিছু মনিটর লাগানো, সেই মনিটর মস্তিষ্কের ভেতরকার ইলেকট্রিক সিগন্যাল শনাক্ত করে কিছু একটা নাড়াচ্ছে। খেলনা যদি বলতে না চাই— বড় জোর একটা সায়েন্স ফিকশান লেখার আইডিয়া, হাত পা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র চিন্তা করে কোনো একটা-কিছু নাড়ানো বা সরানো! কিন্তু আসলে সেটি এই গবেষণায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মাত্রার জন্ম দিয়েছে। আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটা প্রাণীর মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালগুলো সংগ্রহ করে একটা বিশাল ডাটাবেস তৈরি করতে পারি। প্রাণীটি যখন ক্ষুধার্ত, যখন শীতার্ত বা যখন ঘুমন্ত, যখন আতঙ্কিত বা ক্রুদ্ধ এ-রকম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল যদি জানা থাকে তাহলে সেগুলো দেখেই প্রাণীটির মস্তিষ্কের ভেতরে উঁকি দেয়া সম্ভব। আশা করা যায় আগামী কয়েক দশকে প্রযুক্তির আরো উন্নতি হবে, এই মুহূর্তে যেটা জটিল সেটা সহজ হয়ে আসবে, মানুষ তখন সত্যি সত্যি একটা প্রাণীর মস্তিষ্কের ভেতর উঁকি দিতে শুরু করবে।

একদিন হয়তো আসবে যখন আমরা যদি দেখি রাস্তার মাঝখানে একটি গরু উদাস মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা জানতে পারব সে কী ভাবছে! হয়তো অবাক হয়ে আবিষ্কার করব, গরু আসলে 'গরু' নয়, সেটি বিশাল একজন দার্শনিক! জগৎসংসার নিয়ে তারও বিশাল একটা চিন্তার জগৎ রয়েছে। কে জানে স্বার্থপর কৌশলী কূটবুদ্ধি অনেক মানুষ থেকে একটা গরুই হয়তো অনেক মহৎ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

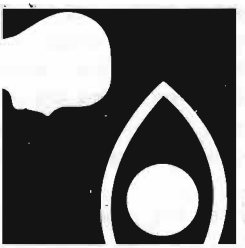

15. চোখ আলো ও রঙ

আমি যখন পিএইচ. ডি. করছি তখন একদিন ল্যাবরেটরিতে আমার প্রফেসর এসে হাজির, কনুইয়ের কাছে কোথায় জানি কেটে গেছে, হাত রক্তে মাখামাখি। আমাকে তার হাতটা দেখিয়ে বলল, 'এই দেখো, এটা রক্ত!' আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'অবশ্যই রক্ত!' আমার প্রফেসর নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম গ্রীজ! আমি তো কালার ব্লাইন্ড, রং দেখতে পাই না!'

আমার প্রফেসর কালার ব্লাইড ছিলেন, (শব্দটার যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। আমি কোথাও কোথাও এটাকে রং অন্ধ হিসেবে বলেছি, রঙ্গান্ধ থেকে রঙ অচেতন নিশ্চয়ই ভালো শোনায়!) যারা পুরাপুরি কালার ব্লাইন্ড, কোনো রঙই দেখতে পান না তাদের জন্যে সবারই নিশ্চয়ই এক ধরনের মায়া হয়। পৃথিবীর এত সৌন্দর্য তারা পুরাপুরি উপভোগ করতে পারেন না। যিনি রঙ দেখেন না তিনি পৃথিবীর পুরো সৌন্দর্য কীভাবে দেখবেন। কিন্তু রঙটা কী? আমরা কেমন করে দেখি? সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের ভেতরে এক ধরনের কৌতূহল রয়েছে।

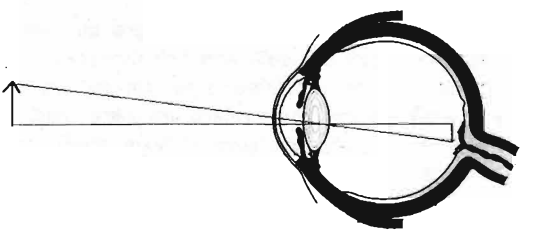

15.1 নং ছবি : আমাদের চোখে এক ধরনের লেন্স রয়েছে কোনো কিছু থেকে আলো সেই লেন্সে পড়লে রেটিনাতে সেই জিনিষটার আলো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা শব্দটার অর্থ চোখের ভেতরে আলো প্রবেশ করা, চোখের রেটিনাতে সেই আলোটা এক ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয় যেটা অপটিক নার্ভ দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্কের যে অংশটা দেখার কাজে ব্যবহার হয় সেটা আমাদের মাথার পিছন দিকে। একবার আমার এক ছাত্র দুর্ঘটনার মাথায় আঘাত পেয়ে মৃত্যুর সাথে প্রায় এক মাস যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে সে জ্ঞান ফিরে পায় নি, ডাক্তার বলেছিলেন, জ্ঞান ফিরে পেলেও দৃষ্টিশক্তি সম্ভবত ফিরে পাবে না। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখার কাজে ব্যবহার হয় তার সেই জায়গাটুকু সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল।

আমাদের চোখের ভেতর এক ধরনের লেন্স রয়েছে, কোনো কিছু থেকে আলো সেই লেন্সে পড়লে সেটা রেটিনাতে সেই জিনিসটার উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে (15.1নং ছবি)। আমরা কোনো কিছুকে উল্টো দেখি না কারণ দেখা নামের পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সেগুলো সামলে নেয়। চোখের মাঝে আলো এসে পড়া, অপটিক নার্ভ দিয়ে সেই অনভূতি মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছানো মানেই কিন্তু দেখা নয়, এর মাঝে শেখারও একটা ব্যাপার আছে। নূতন জন্ম হয়েছে সে-রকম শিশুদের দেখলে সেটা বোঝা যায়, তারা 'তাকায়' কিন্তু তখনো দেখাটা শিখে উঠে নি তাই চোখের দৃষ্টিতে এক ধরনের শূন্যতা দেখা যায়। একটা শিশুর জন্মের পর যদি তার চোখ দুটো কালো কাপড় দিয়ে দীর্ঘদিনের জন্যে ঢেকে দেয়া হয় তাহলে একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটবে। তার মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখার কাজে ব্যবহার হয় সেখানে কোনো সংকেত না এলে মস্তিষ্ক সেই অংশটুকু অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে। যদি পরে চোখের কালো কাপড়টুকু খুলে দেয়া হয়, তাহলে চোখ থেকে অপটিক নার্ভ হয়ে অনুভূতিটুকু মস্তিষ্কে পৌঁছাতে শুরু করবে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। মস্তিষ্কের যে অংশটুকুর দেখার কাজে ব্যবহার হবার কথা ছিল মস্তিষ্ক সেটা অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলেছে, কাজেই সে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। বিজ্ঞানীরা এই ধরনের নিষ্ঠুর পরীক্ষা করে এটা বের করেন নি, কোনো কোনো শিশু চোখের সমস্যা নিয়ে জন্মায়। সেই সমস্যাটি ধরা পড়তে এবং দূর করতে যদি কয়েক বছর সময় লেগে যায় তাহলে দেখা যায় বাচ্চাটি আর দেখতে পারছে না।

আমাদের দেখার জন্যে চোখের ভেতর আলো এসে পড়তে হয়। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, এবং তরঙ্গ হলেই তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি মিটার খানেক লম্বা হয় তাহলে সেটাকে বলে রেডিও ওয়েভ, যদি হয় কয়েক এঙ্গস্ট্রম (এক মিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ) তাহলে সেটাকে বলে এক্সরে। বলাই বাহুল্য সেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না। সত্যি কথা বলতে কী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে 0.4 মাইক্রন (এক মিটারের এক মিলিওন ভাগের এক ভাগ) থেকে 0.7 মাইক্রন (15.2নং ছবি)। এর বাইরে কিছুই আমরা দেখতে পাই না। প্রকৃতি ঠিক কী কারণে এই ছোট্ট একটা অংশের জন্যে আমাদের চোখকে সংবেদনশীল করে রেখেছে এবং এর বাইরের কোনো কিছু আমরা দেখতে পাই না সেটা একটা রহস্যের মতো মনে হতে পারে। আসলে ব্যাপারটা একেবারেই রহস্যময় নয়। সূর্যের আলোর শুধুমাত্র এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশটুকুই সবচেয়ে ভালোভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে পারে, বাকি অংশটুকু বাতাসের জলীয় বাষ্পে শোষিত হয়ে যায়। এই শোষণটুকু ছোটখাট শোষণ নয়— প্রায় লক্ষগুণ শোষণ। কাজেই আমাদের চোখ যদি আলোর এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সংবেদনশীল না হয়ে অন্য অংশে সংবেদনশীল হতো তাহলে সবচেয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনেও পৃথিবীটাকে মনে হতো ঘুটঘুটে অন্ধকার!

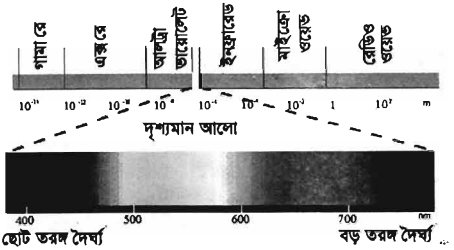

15.2 নং ছবি: বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গের খুব ছোট একটা অংশ আমরা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে 0.4 মাইক্রন থেকে 0.7 মাইক্রন।

AMARBOI.COM

আলোর এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই আসলে হচ্ছে রঙ। সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনি এবং সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে লাল। বেগুনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও ছোট হলে আমরা সেটাকে বলি অতিবেগুনী বা আল্ট্রাভায়োলেট এবং লাল থেকে বড় হলে আমরা সেটাকে বলি অবলাল বা ইনফ্রারেড। অতিবেগুনী রশ্মি জীবাণু মুক্ত করার জন্যে ব্যবহার করা হয়, অবলাল রশ্মি ফাইবার অপটিক্স কমিউনিকেশান্সে ব্যবহার হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এর কোনোটাই আমরা চোখে দেখি না।

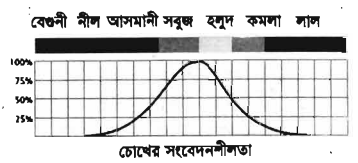

15.3 নং ছবি: আমাদের চোখে বেশি সংবেদনশীল হলুদাভ সবুজ রংয়ে।

সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনি এবং সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লালের ঠিক মাঝখানে হচ্ছে সবুজ। মানুষের চোখ সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল হচ্ছে সবুজ রঙে (15.3 নং ছবি)। এজন্যেই সম্ভবত পৃথিবীর সবুজ গাছ দেখতে আমাদের এত ভালো লাগে! তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে মিল রেখে রঙগুলো যদি সাজাই সেগুলো হচ্ছে বেগুনি নীল সবুজ হলুদ কমলা এবং লাল। সূর্যের আলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব রঙগুলোই আছে এবং যখন সব রঙগুলো মিশে থাকে আমরা আলাদাভাবে কোনো রঙই দেখতে পাই না। আলোটাকে বর্ণহীন বা সাদা আলো বলে মনে হয়।

এখন আমরা মোটামুটি অনুমান করতে পারব কেন আমরা নানা রঙ দেখতে পাই। একটা ফুলকে যদি লাল মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই ফুলটা লাল রঙ ছাড়া অন্য সব রঙ শোষণ করে নিচ্ছে। ফুল থেকে শুধুমাত্র লাল রঙটি বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের চোখে আসছে। গাছের পাতাকে সবুজ (15.4 নং ছবি) মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে পাতাটি সবুজ রঙ ছাড়া অন্য সব রঙ শোষণ করে নিচ্ছে। শুধুমাত্র সবুজ রঙটি গাছের পাতা থেকে আমাদের চোখে আসছে বলে সেটাকে মনে হচ্ছে সবুজ! যদি কোনো কারণে সবগুলো রঙই শোষণ করে নেয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি কালো। যদি কোনো রঙই শোষণ করতে না পারে তাহলে সেটা হচ্ছে সাদা।

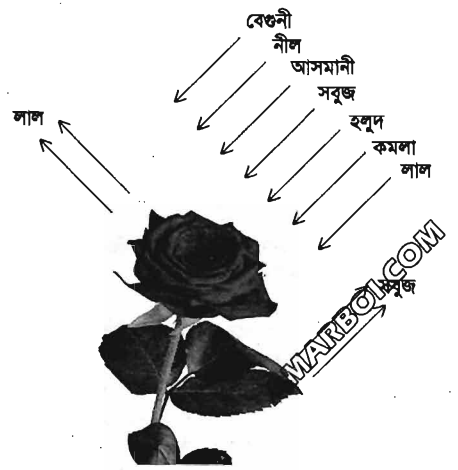

15.4 নং ছবি: লাল রংয়ের জিনিষ লাল ছাড়া আর সব রং শোষণ করে নেয়, সে-রকম সবুজ রংয়ের জিনিষ সবুজ রং ছাড়া আর সব রং শোষণ করে নেয়।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে পৃথিবীতে রঙের কোনো অভাব নেই। আমরা বেগুনি নীল সবুজ হলুদ কমলা এবং লাল এই ছয়টি রঙের নাম বলেছি, এর কোনোটিই হঠাৎ করে শেষ হয়ে পরেরটা শুরু হয় না খুব ধীরে ধীরে একটি আরেকটির সাথে মিশে যায়। রঙগুলো আলাদাভাবে দেখা একসময় খুব কঠিন ছিল। নিউটন প্রিজম ব্যবহার করে রঙগুলো আলাদা করে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমাদের সবার কাছেই রয়েছে গান কিংবা কম্পিউটারের সিডি। তার মাঝে সূর্যের আলো ফেলে সেটাকে সাদা দেয়ালে প্রতিফলিত করলেই আমরা আসলে এই রঙগুলো দেখতে পাব। যারা কখনো দেখে নি তারা একবার যেন দেখে নেয়, প্রকৃতি কত রঙিন শুধু তাহলেই সেটা অনুভব করা যাবে!

কাজেই আমাদের মনে হতে পারে দৃশ্যমান এই রঙগুলো তৈরি করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের মনিটরে আমরা এমন কোনো রঙ নেই যেটা দেখতে পাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাব্য সবগুলো রঙ পেতে না জানি কতগুলো রঙ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এইসব রঙ তৈরি করতে আসলে শুধুমাত্র তিনটি রঙ ব্যবহার করা হয়। সেগুলো হচ্ছে লাল, সবুজ এবং নীল। যারা আমার কথা বিশ্বাস করে না তাহলে টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের মনিটরের উপর সাবধানে এক ফোঁটা পানি দিয়ে দেখতে পার। পানির ফোঁটাটা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে কাজ করবে এবং সেখানে পরিষ্কার দেখা যাবে তিনটি রঙ। কোন রঙ মিশে কোন রঙ তৈরি হয় সেটা 15.5 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটা বোঝার জন্যে কল্পনা করে নেয়া যায় যে সাদা দেয়ালে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আলোর টর্চ লাইট এমনভাবে ফেলা হয়েছে যেন সেগুলো একটা আরেকটার উপর পরে। এখানে লাল নীল আর সবুজ হচ্ছে প্রাইমারি রঙ। সেগুলো মিলে যে রঙ হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সেকন্ডারি রঙ। যে জিনিসটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে তিনটি রঙই যখন সমানভাবে মিশে যায় তখন তৈরি হয় সাদা রঙ। রঙ মিশিয়ে এভাবে নূতন রঙ তৈরি করার পদ্ধতিটার নাম রঙের যোগ জাতীয় মিশ্রণ। এখানে একটা রঙের সাথে আরেকটা রঙ যোগ করা হয়।

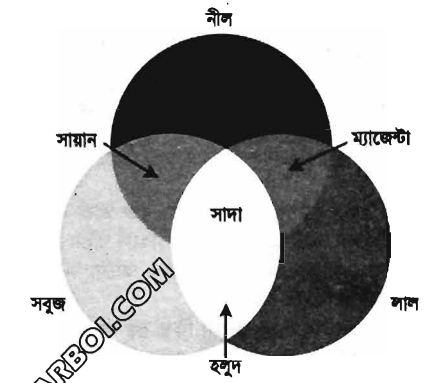

AMARBOI.COM
15.5 নং ছবি: আলোর যোগ জাতীয় মিশ্রণ, টেলিভিশনের স্ক্রীনে যেভাবে রং তৈরি হয়।

কেউ কেউ নিশ্চয়ই রঙের এই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করার জন্যে তাদের জল রংয়ের বাক্স নিয়ে রঙ মিশিয়ে পরীক্ষা করতে চাইবে। তারা লাল এবং সবুজ রঙ মিশিয়ে নিলে অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে যে সেটা মোটেও হলুদ না হয়ে কেমন জানি কালচে হয়ে গেছে। তার কারণ এভাবে রঙ মেশানো হলে সেটা যোগ জাতীয় মিশ্রণ হয় না সেটা হয়ে যায় বিয়োগ জাতীয় মিশ্রণ। তার কারণ জল রংয়ের ছোট ছোটকণাগুলো তখন পাশাপাশি থাকে না। তারা থাকে একটার উপর আরেকটা। সে কারণে তখন একটা রঙকে দেখতে হয় অন্য আরেকটা রঙের ভেতর দিয়ে অনেকটা রঙের ফিল্টারের মতো। প্রত্যেকটা ফিল্টার তখন তার নিজস্ব রঙ ছাড়া অন্য সব রঙ শোষণ করে নেয়। রঙের এই বিয়োগ জাতীয় মিশ্রণ দিয়ে কোন কোন প্রাইমারি রঙ দিয়ে কোন কোন সেকেন্ডারি রঙ তৈরি করা হয় সেগুলো 15.6 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

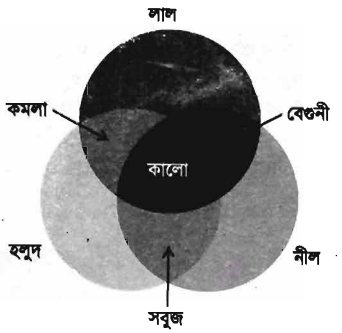

15.6 নং ছবি : আলোর বিয়োগ জাতীয় মিশ্রণ, কাগজে রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকলে যে মিশ্রণ হয়।

যারা ছাপা ছাপির কাজের সাথে যুক্ত তারা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, যদি তিনটি রং দিয়েই সব রঙ তৈরি করা যায় তাহলে রঙিন ছবিকে ফোর কালার বা চার রঙা ছবি বলে কেন? কারণটি আর কিছুই না, রঙকে আরো ঝকঝকে বা স্পষ্ট করার জন্যে আলাদা করে কালো রঙটি ব্যবহার করা হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে কালো কিন্তু রঙ নয়। কালো হচ্ছে রঙের অভাব! যখন কোনো রঙ থাকে না সেটাই হচ্ছে কালো— সেটা কী আমাদের সব সময় মনে থাকে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

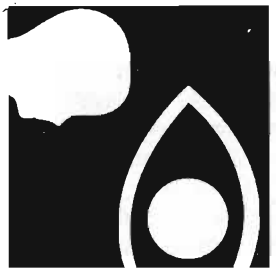

16. অটিজম

কম্পিউটার নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ করে মনিটরটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন কী হবে? কী-বোর্ড এবং মাউস কাজ করছে বলে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেয়া যাবে, তথ্য পাঠানো যাবে। সি.পি.ইউ.টি সবল রয়েছে বলে সেই নির্দেশ এবং তথ্য অনুযায়ী কম্পিউটার তার কাজও করতে থাকবে কিন্তু মনিটরটি নষ্ট থাকার কারণে আমরা তার কিছুই জানতে পারব না। কম্পিউটারটা কাজ করছে কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না, আমরা নিশ্চয়ই হতাশায় ছটফট করতে থাকব। এই হতাশা নিশ্চয়ই লক্ষগুণ বেড়ে যাবে যদি বিষয়টা একটা কম্পিউটারকে নিয়ে না হয়ে একটা মানুষকে নিয়ে হতো। আমরা যদি কখনো দেখি একজন মানুষ, আপাতঃদৃষ্টিতে তাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে— সে শুনতে পায়, দেখতে পায়, তার স্পর্শের অনুভূতি আছে, তার কথা বলার ক্ষমতা আছে কিন্তু কথা বলতে চায় না, কারো চোখের দিকে তাকায় না, নিজের ভেতরে একটা রহস্যময় জগতে আটকা পড়ে আছে শত চেষ্টা করেও তার মনের খোঁজ পাওয়া যায় না তাহলে তার চারপাশের মানুষের ভেতরে কী ধরনের হতাশার জন্ম নেবে সেটা কি আর ব্যাখ্যা করতে হবে? সারা পৃথিবীতেই এ ধরনের একটা রহস্যময় অবস্থার মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে, এই মানুষগুলোকে বলে অটিস্টিক (Autistic) এবং অবস্থাটির নাম অটিজম (Autism)। 1970 সালে হার্ভাডের শিশু হাসপাতালে যখন প্রথম একটি অটিস্টিক শিশুকে ভর্তি করা হয় তখন হাসপাতালের প্রধান সব ডাক্তারদের এই বলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, "তোমরা সবাই এই রহস্যময় শিশুটিকে দেখে যাও, কারণ ভবিষ্যতে আর কখনো এ-রকম একজনকে দেখার সুযোগ পাবে না।" সেই বিখ্যাত শিশু হাসপাতালের প্রধান নিশ্চয়ই কল্পনাও করেন নি যে তিন দশকের মাঝে সেই দেশে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাবে প্রতি 166 টি শিশুর মাঝে একটি শিশু অটিস্টিক। দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত দেশে এ-রকম পরিসংখ্যান নেয়ার সুযোগ হয় না। যদি হতো তাহলে সংখ্যাটি এরকমই হতো বলে বিশেষজ্ঞেদের ধারণা। বর্তমান পৃথিবীতে এ-রকম বিপুল সংখ্যক অটিস্টিক শিশুর একটা বিস্ফোরণ কেন ঘটছে কেউ এর উত্তর জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটিজম এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা খুব মৃদু। কাজেই সেই অটিস্টিক শিশুটি হয়তো কষ্ট করে সমাজে টিকে থাকতে পারে। তার ভেতরকার যন্ত্রণার খবর কেউ কোনোদিন জানতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে অটিজম এত তীব্র যে, সেই শিশুটির পক্ষে স্বাভাবিক জীবন প্রায় অসম্ভব, সারাটি জীবন অন্যের সাহায্যের উপর তার নির্ভর করতে হয়। পৃথিবীতে এত বেশি অটিস্টিক শিশু রয়েছে যে, মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় আমরা সবাই কখনো না কখনো হয়তো এক-দুজন অটিস্টিক শিশু দেখেছি কিন্তু সেটা বুঝতে পারি নি। অটিস্টিক শিশুদের চালচলনে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন তারা চোখাচোখি তাকাতে পছন্দ করে না, ক্রমাগত হাত নাড়ানো বা মাথা নাড়ানো এ ধরনের একটানা কোনো একটা কাজ করে যেতে থাকে। ছোট বাচ্চারা যে-রকম হইচই করে একসাথে খেলাধুলা করে অনেক সময়ই তারা এটা করতে চায় না, নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকে। একেবারে সহজ কাজটিও তাদের হাতে ধরে করিয়ে দিতে হয়। রুটিনবাঁধা জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সেই রুটিনের একটু উনিশ-বিশ হলেই তারা খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। একটা ছোট অটিস্টিক শিশুকে দেখা যাবে সে একই ধরনের খেলনা ঠিক একইভাবে সাজিয়ে রাখছে এবং কেউ যদি সেটা একটুও পরিবর্তন করে তাহলে সে সেটা সহ্য করতে পারে না। কেউ কেউ ছোটখাট শব্দও সহ্য করতে পারে না, দুই হাতে কান চেপে ধরে রাখে। অনেক অটিস্টিক শিশু কথা বলতে পারে না, কেউ কেউ কথা বললেও সেটা হয় এক ধরনের সীমাবদ্ধ কথা। অনেক সময়েই দেখা যায় একটা শিশু একেবারে স্বাভাবিকভাবে বড় হতে হতে হঠাৎ করে অটিস্টিক হতে শুরু করেছে। সাধারণত তিন বছর বয়সের দিকে এই পরিবর্তনটি শুরু হয় এবং আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। ঠিক কী কারণ কেউ জানে না একটি মেয়ের থেকে একটি ছেলের অটিস্টিক হবার সম্ভাবনা প্রায় চার গুণ বেশি।

16.1 নং ছবি : ড্যানিয়েল নামের এই অটিস্টিক স্যাভান্ট তরুণটি 5 ঘন্টা 9 মিনিট 24 সেকেন্ডে পাইয়ের মান 22 হাজার 500 সংখ্যা নিখুতভাবে বলে একটা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটিজম কেন হয়, কীভাবে হয় বিজ্ঞানীরা এখনো বের করতে পারেন নি। সাধারণভাবে অনুমান করা হয় এর পেছনে একটা নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই, অনেকগুলো কারণ। খুব হালকাভাবে অটিস্টিক (যাকে হয়তো অমিশুক বা দুরন্ত শিশু হিসেবে ধরে নেয়া হয়) থেকে গুরুতর অটিস্টিক (যেখানে শিশুটি কিছুই করতে পারে না, একেবারে পুরাপুরি অচল) শিশু রয়েছে বলে আজকাল এ.এস.ডি. (অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার) শব্দটি ব্যবহার করা হয়, বোঝানো হয় এটি একেবারে নির্দিষ্ট এক ধরনের সমস্যা নয় এর ব্যাপ্তি বিশাল।

অন্যান্য মানসিক বা মস্তিষ্কের সমস্যা থেকে অটিজমকে একটু আলাদা করে দেখা হয় তার একটা কারণ আছে। আনুমানিক একশ জন অটিস্টিক শিশুর ভেতরে এক দুজন শিশু বের হয়ে যায় যাদের এক ধরনের অসাধারণ ক্ষমতা থাকে। আমি একটি অটিস্টিক কিশোরকে দেখেছি তাকে যে কোনো তারিখ বলা হলে সেটি কী বার সে বলে দিতে পারে। শত শত বছরের হাজার হাজার দিনের ভেতর কোনটি কী বার সেটি একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু কিছুতেই বলতে পারবে না। খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে সেরকম অটিস্টিক শিশু রয়েছে। সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিভা এ-রকম অটিস্টিক শিশু রয়েছে। একবার শুনেই সুরটুকু পিয়ানোতে তুলে ফেলতে পারে এ-রকম অজস্র উদাহরণ রয়েছে। এই ধরনের অটিস্টিক শিশুদের বলা হয় স্যাভান্ট (Savant)। রেইনম্যান নামে একটা ছায়াছবিতে ডাস্টিন হফম্যান এ-রকম একজন স্যাভান্টের অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

16.2 নং ছবি: তিন বছরের স্যাভান্ট শিশু নাদিয়ার আঁকা ছবিতে বড় শিল্পীর দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

যে শিশু, কিশোর বা মানুষটিকে আপাতঃদৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন বা বোধশক্তিহীন বলে মনে হয় কিন্তু তার ভেতরে অসম্ভব ক্ষমতাশালী একটা মস্তিষ্ক লুকিয়ে আছে সেটি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের খুব কৌতূহলী করে তুলেছে, তারা দীর্ঘদিন থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছেন। টাইম ম্যাগাজিনে 2006 সালের মে মাসে একটি অটিস্টিক কিশোরীর কথা ছাপা হয়েছে। কিশোরীটি কোনো কিছু শিখতে অক্ষম, লেখাপড়া দূরে থাকুক কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। বাবা-মা অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে এই মেয়েটির জন্যে একটি অক্ষম অর্থহীন কঠিন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মেয়েটির চিকিৎসক একদিন কৌতূহল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশত তাকে একটি বিশেষ ধরনের কম্পিউটারের কী বোর্ড ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কিছু বলতে চাও?" অনভ্যস্ত হাতে মেয়েটি কী বোর্ড চাপ দিয়ে লিখল, "মা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি!" সবাই একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন, কেউ ভুলেও ধারণা করে নি মেয়েটি কোনো ভাষা জানে! যখন বোঝা গেল এই বিশেষ কী বোর্ড দিয়ে সে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে তখন তার জন্যে একটি নূতন জগৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিছুদিনের ভেতর জানা গেল কিশোরী মেয়েটির রয়েছে ভাষার উপর অসম্ভব দক্ষতা, চমৎকার তার রসবোধ। দেখতে-দেখতে সে কলেজের এলজেবরা আর জীববিজ্ঞান পড়তে শুরু করল। এই মেয়েটির মস্তিষ্ক একজন মেধাবী মানুষের মস্তিষ্ক, শুধুমাত্র শুনে-শুনে সে অনেক কিছু শিখেছে কিন্তু কীভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হয় জানে না বলে কেউ সেই খোঁজ পায় নি। বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো বিষয়টা একটা রহস্যের মতো। সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে জটিল জিনিস হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক, সেই মস্তিষ্কের রহস্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে অটিজমের প্রশ্নের উত্তর।

বিজ্ঞানীরা কিছু-কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে শুরু করেছেন। একসময় মনে করা হতো এটি বুঝি মস্তিষ্কের সেরেবেলাম নামক অংশের একটি ত্রুটি, এই অংশটি অনুভূতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আসলে মস্তিষ্কের ভেতরটুকু কিভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে সেটার অস্বাভাবিকতাই হচ্ছে অটিজমের কারণ। জন্মের সময় একজন অটিস্টিক শিশুর মস্তিষ্ক স্বাভাবিক আকারের হলেও দুই বছরের ভেতরে সেটি খুব দ্রুত বড় হতে শুরু করে। অনেক সময় দেখা গেছে চার বছরের একজন অটিস্টিক শিশুর মস্তিষ্কের আকার তেরো-চৌদ্দ বছরের একজন কিশোরের সমান। শুধু তাই নয়, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ অন্য অংশ থেকে বড়। যেমন যে অংশটি দুশ্চিন্তা, ভয় বা এ ধরনের অনুভূতিটি নিয়ন্ত্রণ করে (এমিগডালা) সেই অংশটুকু আকারে বড় থাকার কারণে অনুমান করা হয় অটিস্টিক শিশুরা সম্ভবত সাধারণ শিশুদের থেকে বেশি ভয় বা দুর্ভাবনা অনুভব করে। যে অংশটুকু স্মৃতির জন্যে ব্যবহার করা হয় সেই অংশটুকুও আকারে বড়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন অটিস্টিক শিশুদের মস্তিষ্ক যেহেতু স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে না তাই তাদের অনেক সময়েই স্মৃতির উপরে নির্ভর করে কাজ করতে হয়। স্মৃতির উপর বেশি নির্ভর করতে করতে সেই অংশটুকু তুলনার থেকে বেশি বিকশিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বের করেছেন, মস্তিষ্কে স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ অনেক বেশি কিন্তু মস্তিষ্কের দূরবর্তী অংশের ভেতর যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে কম। শুধু তাই নয় একজন স্বাভাবিক মানুষ বা শিশু যে কাজের জন্যে মস্তিষ্কের যে অংশ ব্যবহার করে অটিস্টিক শিশুরা তা করে না। যেমন সাধারণ মানুষ তাদের মস্তিষ্কের যে অংশ আকার আকৃতি বোঝার জন্যে ব্যবহার করে, অটিস্টিক শিশুরা সে অংশটি ব্যবহার করে অক্ষর বোঝার জন্যে। তাই আমরা যেভাবে একটা জিনিস বুঝি, যেভাবে চিন্তাভাবনা করি কিন্তু তারা বোঝে অন্যভাবে চিন্তাভাবনাও করে অন্যভাবে। তাদের ভাবনার জগৎটি কীভাবে কাজ করে সেটি আমরা এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটিস্টিক শিশুদের স্বাভাবিক একটা জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে নানা ধরনের চেষ্টা করা হয়। দেখা গেছে খুব শৈশবে যখন বোঝা যায় বাচ্চাটি অটিস্টিক তখন তাকে যদি বিশেষ পদ্ধতিতে চেষ্টা করা যায় তখন তারা অনেকাংশেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক স্কুলে গিয়ে পড়তে পর্যন্ত পারে। এধরণের একটি স্কুলে আমার একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল। যে বিষয়টি প্রথমেই চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মানুষের সাথে সামাজিকভাবে যোগাযোগ করার খুব সাধারণ বিষয়টুকু আমরা করি অনায়াসে। এই শিশুগুলোর জন্যে সেটি অসম্ভব কঠিন একটি কাজ, তাই সেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখের পিছনে লুকিয়ে থাকা মেধাবী, প্রতিভাবান, কৌতুকপ্রিয় সৃজনশীল হাসি খুশি মানুষটিকে আমরা বুঝতে পারি না।

বিজ্ঞানীরা একদিন এই রহস্যের জটাজাল উন্মুক্ত করবেন আমরা সবাই তার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

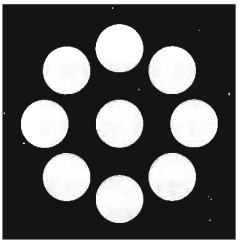

17. কোয়ান্টাম মেকানিক্স

একটা কাল্পনিক পরীক্ষা করা যাক। ধরা যাক আমি একটা ঘরে বসে আছি এবং এই ঘরের আলো আস্তে-আস্তে কমিয়ে আনা হচ্ছে তাহলে শেষ পর্যন্ত কী হবে? উত্তরটি খুব সহজ, আমাদের চোখ কতটুকু আলো দেখতে পারে তার একটা হিসেব আছে, যখন ঘরের আলো তার থেকে কমে আসবে তখন আমি আর কিছু দেখতে পারব না। মনে হবে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে আছি। আমাদের চোখের সংবেদী ক্ষমতা একটুর জন্যে পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় একটি বিষয় দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে! যদি আমাদের চোখের সংবেদী ক্ষমতা আর মাত্র দশ গুণ বেশি হতো তাহলে আলো কমিয়ে আনা হলে আমরা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতাম। আলো যখন খুব কমে আসতো তখন আমরা আলোর একধরনের ঝলকানি দেখতে পেতাম। আলো যখন বেশি থাকে তখন সেই ঝলকানিগুলো আলাদা করে দেখা যায় না, যখন কমে আসে তখন দেখা সম্ভব হয়। বোঝানোর জন্যে এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে পানির ধারা। পানির ট্যাপ খোলা হলে ঝরঝর করে পানি বের ততে থাকে, এখন যদি ট্যাপটা বন্ধ করে পানির ধারা কমিয়ে আনতে থাকি তাহলে হঠাৎ করে আমরা ধীরে ধীরে দেখব পানির ধারা কমে এসে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ফোঁটাগুলো পড়বে ঘনঘন, যদি ট্যাপ আরও বন্ধ করে দিই তাহলে ফোঁটাগুলো পড়বে আরও ধীরে ধীরে। আরও বন্ধ করে দেয়া হলে আরও ধীরে। আলোর বেলাতেও সেই একই ব্যাপার যখন আলো কমে আসবে তখন আমরা দেখব কমসংখ্যক আলোর ঝলকানি, যখন আরও কমিয়ে দেয়া হবে তখন সেটি হবে আরও কমসংখ্যক আলোর ঝলকানি। একটা জিনিস এখানে খেয়াল করতে হবে পানির ফোঁটার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আকার আছে, বড় পানির ফোঁটা বা ছোট পানির ফোঁটা হয় না। পানির ট্যাপ যখন বন্ধ করে দেয়া হতে থাকে তখন কিন্তু পানির ফোঁটার আকার কমে যায় না, শুধু মাত্র কমসংখ্যক ফোঁটা পড়তে থাকে। আলোর বেলাতেও তাই, আলোর ঝলকানি একটা নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতার। ঘরের আলো যখন কমিয়ে দেয়া হয় তখন ঝলকানির উজ্জ্বলতা কমে যায় না, একই ঔজ্জ্বল্যের কমসংখ্যক ঝলকানি দেখা যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

17.1 নং ছবি : শর্ডিংগার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি সমীকরণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

আমি জানি কেউ কেউ নিশ্চয়ই আমার এই কথায় সন্দেহ পোষণ করছে, আমাদের চোখ যখন এই বিচিত্র বিষয়টি দেখতে পারবে না তাহলে শুধু শুধু এই বিষয়টা উত্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কী যুক্তি রয়েছে? সন্দেহপ্রবণ পাঠকদের আশ্বস্ত করার জন্যে বলা যায় যে, খুব কম আলো দেখার জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে তাদের একটার নাম হচ্ছে ফটো মালটিপ্লায়ার টিউব। মানুষের চোখ যখন কিছুই দেখতে পায় না এই ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব সেখানেও দেখতে পায়। এই ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব দিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্দেহাতীতভাবে দেখেছেন যে কম আলো আসলে কমসংখ্যক আলোর ঝলকানি। পানির যেরকম ফোঁটা আছে আলোরও সেরকম ফোঁটা আছে, সেই ফোঁটাকে অনেকটা কাব্যিকভাবে বলা হয় ফোটন! যখন তীব্র আলো থাকে তখন আলোর এই কণা বা ফোটনকে আলাদাভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু যখন আলো খুব কমে আসে তখন সেটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই।

এবারে আমি সব পাঠকদের তাদের মাঝে ফেলে দিতে পারি। প্রথম পরীক্ষাটা আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়েছে, চোখ আরেকটু বেশি সংবেদী হলে আমাদের কল্পনা করতে হতো না আমরা সত্যি সত্যি দেখতে পেতাম। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আমরা সহজেই করতে পারি, আসলে সবাই কখনো না কখনো করেও ফেলেছি। সেটা হচ্ছে জানালার কাচ দিয়ে জোছনা দেখা। আমরা সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময় ঘরের আলো নিভিয়ে আবিষ্কার করেছি বাইরে কী সুন্দর জোছনা! শুধু যে জোছনা তাই নয়, জানালার কাচ দিয়ে সেই জোছনা ঘরের ভেতরে এসে আমাদের মুগ্ধ করেছে। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা বাইরের জোছনাটুকু দেখতে পাই না। তার কারণটা খুব সহজ, জানালার কাচকে আমরা স্বচ্ছ বলে ভাবি কিন্তু সেটা পুরাপুরি স্বচ্ছ নয়, তার পৃষ্ঠ থেকে অল্প একটু (নিখুঁত হিসেবে চার শতাংশ) আলো প্রতিফলিত হয়। তাই যখন ঘরের ভেতরে তীব্র আলো জ্বলছে তার শতকরা চার শতাংশ জানালার কাচ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ভেতরে আসছে। এই চার শতাংশ আলো জোছনার কোমল আলো থেকে তীব্র, তাই আমরা সেটাকেই দেখি, জোছনার আলোকে আর দেখি না!

এবারে আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আসি— আমরা জোছনা দেখতে গিয়েই আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি আলোর চার শতাংশ প্রতিফলিত হয়। এবারে সেই একই পরীক্ষাটি করতে চাই, শুধু পরীক্ষাটি করা হবে কম আলোতে। অর্থাৎ, যখন আলো আসলে রশ্মি নয় যখন আলো হচ্ছে ফোঁটা বা কণা, বৈজ্ঞানিক ভাষার আলোর ফোটন! তখন আমরা কী দেখব?

বৈজ্ঞানিকরা অসংখ্যবার এই পরীক্ষা করেছেন এবং তারা দেখেছেন আলো যখন কমে আসে তখনও চার শতাংশ প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ, যদি একশটা ফোটন কাচের পৃষ্ঠকে আঘাত করে তখন ছিয়ানব্বইটা বের হয়ে যায় কিন্তু চারটা প্রতিফলিত হয়। এখন লক্ষ টাকার প্রশ্ন : কোন চারটা প্রতিফলিত হবে? তার উত্তর হচ্ছে : কেউ জানে না! একশটা ফোটন কাচের পৃষ্টকে আঘাত করলে মোটামুটিভাবে চারটা প্রতিফলিত হবে সেটা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন কিন্তু কোন চারটা সেটা তারা কখনোই আগে থেকে বলতে পারেন না। কেউ যেন মনে না করে ভালো যন্ত্রপাতি হলে এটা বলে দেয়া যাবে, এর সাথে যন্ত্রপাতির কোনো সম্পর্ক নেই, বিজ্ঞানীরা কখনোই এটা বলতে পারবে না। প্রকৃতি সেই তথ্যটা আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছে। বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থেকে হঠাৎ আমাদের সরে আসতে হচ্ছে সম্ভাবনার জগতে! একটা-কিছু "হবে" না বলে আমাদের বলতে হচ্ছে "হতে পারে" এবং "হবে" থেকে "হতে পারে" এই বিষয়টিই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

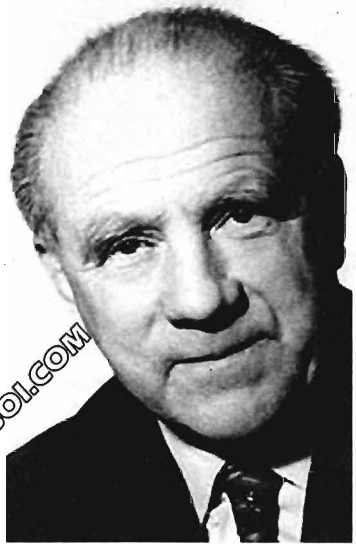

17.2 নং ছবি: হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র মানুষের চিন্তার জগতে এক চিরায়ত রহস্য।

আমাদের জীবনে সম্ভাবনার বিষয়টা আমরা এর মাঝে অনেকবার দেখেছি। লুডু খেলার সময় যখন ছক্কাটি ফেলি আমরা আগে থেকে কখনই সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না কত বের হতে। কিন্তু সব সময়েই মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ছয়বারের মাঝে একবার ছয় পড়তে পারে। ছয় পড়ার প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা হচ্ছে ছয়ভাগের এক ভাগ। নিশ্চিত করে কিছু একটা বলতে না পারা, শুধুমাত্র একটা বিষয়ের সম্ভাবনাটুকু জানতে পারাকে অনেকেই বিজ্ঞানের একটা বড় দুর্বলতা বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু সেটা মোটেও তা নয়। প্রকৃতি তার রহস্যের পুরোটুকু বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশ করতে রাজি নয়। বিজ্ঞানীরা সেটি বুঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠার পর সেটাকে গ্রহণ করেই এগিয়ে গেছেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে তারা কিন্তু প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করেই গেছেন, নিউক্লিয়ার বোমা থেকে সিডি প্লেয়ার কোথাও কোন সমস্যা হয় নি!

একজন সাধারণ মানুষ যেটুকু গণিত জানে সেটা দিয়েই কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একেবারে ভেতরে যাওয়া সম্ভব, কেমন করে তার নিখুঁত হিসেব নিকেশ করা হয় সেটাও দেখানো সম্ভব। কিন্তু এই ছোট লেখায় তার ভেতরে না গিয়ে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে শেষ করে দিই। বিষয়টি এত চমকপ্রদ যে, সেটি এর মাঝে সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় চলে এসেছে এবং সেটি হচ্ছে অনিশ্চয়তার সূত্র বা আনসার্টেইনিটি প্রিন্সিপাল।

'অনিশ্চয়তার সূত্র' নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোনো কিছু যে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না এটা তার একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে। অনেকভাবেই 'অনিশ্চয়তার সূত্র' ব্যাখ্যা করা যায় তবে বুঝতে সোজা হয় যদি আমরা সেটা অবস্থান আর ভরবেগ দিয়ে ব্যাখ্যা করি। খুব স্থূলভাবে বলা যায় আমরা কোনো বস্তুর অবস্থান আর গতিবেগ কখনোই পুরোপুরি জানতে পারব না। অন্যভাবে বলা যায় যদি অবস্থান নিশ্চিতভাবে জেনে ফেলি তাহলে গতিবেগ কত সেটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকবে না। আবার এর উল্টোটাও সত্যি অর্থাৎ গতিবেগটা যদি নিশ্চিতভাবে জেনে যাই তাহলে এর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারব না। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনিশ্চয়তার সূত্র কার্যকরী নয়, তাহলে যে কী ভয়ানক বিপদে পড়তাম সেটি আর বলার মতো নয়।

যেমন ধরা যাক ট্রেনে যাবার ব্যাপারটি। স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে, এখন আমরা ট্রেনে উঠব। ট্রেনটা যেহেতু থেমেছে তার অর্থ গতিবেগ হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ গতিবেগটা আমরা নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি। ট্রেনের জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্যি হলে বলা যেত— এখন আমরা যেহেতু গতিবেগটা নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি তাই তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানব না! ট্রেনটি কী ঢাকা না কুমিল্লা না চট্টগ্রাম কোথায় আছে জানার কোনো উপায় নেই। এবারে উল্টোটাও হতে পারে। ধরা যাক আমরা নিশ্চিতভাবে জানি ট্রেনটা আখাউড়া রেলস্টেশনে, এখন কি আমরা ট্রেনে উঠতে পারব? মোটেও নয়, যেহেতু অবস্থানটা জেনে গেছি তাই এর গতিবেগ সম্পর্কে কিছুই জানব না। হয়তো ট্রেনটা ভয়ংকর গতিতে ছুটে যাচ্ছে সেটাতে উঠতে গিয়ে একেবারে ছাতু হয়ে যাব!

আমি নিশ্চিত অনেকেই আমাকে অবিশ্বাস করছেন— ট্রেনের ব্যাপার হলে অবিশ্বাস করতেই পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র একটা পরমাণুর ব্যাপার হলে এর মাঝে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, এটা সব সময়েই ঘটছে। কেন ঘটছে সেটা বোঝাও খুব সহজ, একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। ধরা যাক একটা ইলেকট্রন যাচ্ছে— ইলেকট্রন খুব ছোট, ট্রেনের মতো বিশাল নয় তাই তার বেলায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স শতভাগ সত্যি। কাজেই নিশ্চয়ই অনিশ্চয়তার সূত্রটিও সত্যি হবে অর্থাৎ, তার অবস্থান সম্পর্কে জানলে গতিবেগ (আসলে ভরবেগ) সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে যাব। কেউ মনে করতে পারে কেন এটি হবে? খুব ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখে তো অবস্থান সম্পর্কে জানাই যায়। তাতে তার বেগ অনিশ্চিত হবে কেন? আসলে "দেখা" মানে হচ্ছে প্রতিফলিত আলো থেকে তথ্য বের করা কাজেই কোনো কিছুকে দেখতে হলে তার উপর আলো পড়তে হবে, সেই আলো মাইক্রোস্কোপে ফিরে আসতে হবে। মজার ব্যাপারা হচ্ছে ইলেকট্রন এত ছোট যে তাকে দেখার জন্যে

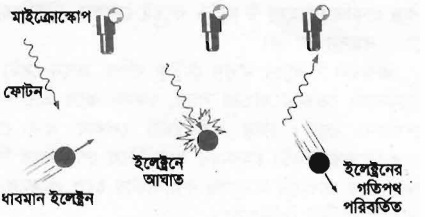

17.3 নং ছবি : ফোটন ইলেকট্রনকে আঘাত করার কারণে ইলেকট্রনের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আলোর ফোটন যখন তাকে আঘাত করে সেই আঘাতেই তার গতিবেগ ওলট পালট হয়ে যায়। (17.3 নং ছবি) কাজেই ইলেকট্রন কোথায় আছে সেই তথ্যটা আমরা জানতে পারলাম সত্যি কিন্তু সেটা জানার কারণে তার গতিবেগ পুরোটাই ওলট-পালট হয়ে গেল। আমরা যে জগৎকে সব সময় দেখি সেটি ক্ষুদ্র জগৎ নয় তাই অনিশ্চয়তার সূত্র নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু পুরমাণু বা ফোটনের যে নিজস্ব ক্ষুদ্র জগৎ আছে সেখানে এটা কিন্তু একেবারেই নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার।

AMARBOI.COM

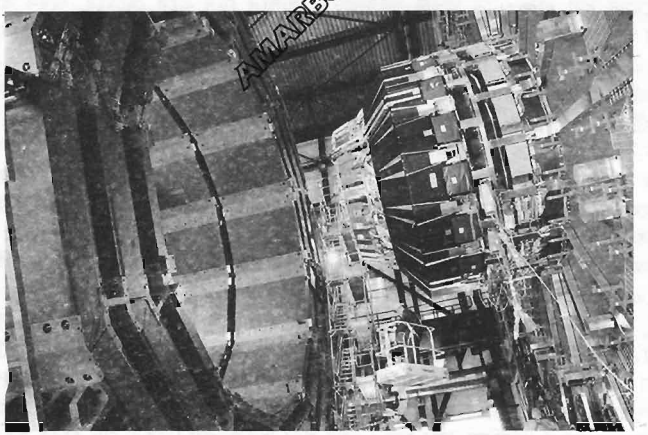

17.4 নং ছবি : অসংখ্য এক্সপেরিমেন্ট করেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তাহার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করা যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীই তে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে খুব স্বস্তি বোধ করেন তা নয়— মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সুনজরে দেখেন নি (যদিও তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যাখ্যা করে, যেটি ছিল আলোর ফোটন হিসেবে পরিচিতির ব্যাখ্যা!)। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে পরীক্ষা করে কখনই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তার জায়গা থেকে বিচ্যুত করতে পারেন নি!

কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে প্রকৃতির নূতন কোনো গোপন রহস্য আমাদের চোখে নূতনভাবে উন্মোচিত হবে। যেখানে থেকে পুরো বিষয়টি অন্যভাবে দেখা হবে! যতদিন সেটি না হচ্ছে ততদিন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকবে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

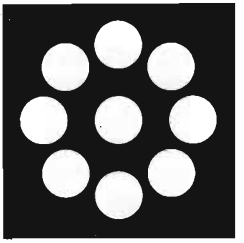

18. থিওরি অফ রিলেটিভিটি

1905 সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দুটি সূত্র দিয়েছিলেন। সূত্র দুটি এত সহজ যে একজন শিশুও সেটা বুঝতে পারবে। সূত্রদুটি এরকম : (এক) পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র সকল ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে (inertial reference Frame) একই থাকবে। (দুই) আলোর গতি সব ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে সমান।

সূত্র দুটি লেখার জন্যে "ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম" নামে একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এটাকে বাংলায় অনুবাদ করা হলে শব্দটি এত কটমটে হয়ে যাবে যে এটাকে ইংরেজি রেখেই বরং বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া ভালো। ধরা যাক আমি ল্যাবরেটরিতে বসে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি তাহলে আমি বলতে পারি আমার ল্যাবরেটরিটি একটি ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম। এবারে ধরা যাক আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো আমি ট্রেনে বসে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করব যদি ট্রেনটা সমবেগে যায় তাহলে এই ট্রেনটাও একটা ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম। এখানে মনে রাখতে হবে ল্যাবরেটরি ঘরে বসে যে জিনিসটাকে স্থির মনে হয়েছিল ট্রেনে বসে সেটাকে মনে হবে উল্টোদিকে ছুটছে। ল্যাবরেটরি এবং ট্রেন এই দুটি ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে একটা বস্তুকে কিন্তু একভাবে দেখা গেল না তাহলে আইনস্টাইনের প্রথম সূত্রটি সত্যি হলো কেমন করে? সূত্রটি একটু ভালো করে দেখতে হবে। আইনস্টাইন বলেন নি সবকিছু এক রকম দেখাবে, তিনি বলেছেন পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র এক থাকবে। কাজেই আমি যদি ল্যাবরেটরিতে দেখি বল প্রয়োগ করলে ত্বরণ হয়, কিংবা তাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসের চাপ বেড়ে যায় তাহলে চলন্ত ট্রেন থেকেও সেটা দেখব। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো এক থাকবে, পর্যবেক্ষণগুলো ভিন্ন হতে পারে।

আইনস্টাইনের দ্বিতীয় সূত্রটি বরং একটু বিচিত্র, সেটি বলছে ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে আলোর বেগ সমান। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বেগ নিয়ে যেসব ব্যাপার দেখে অভ্যস্ত আইনস্টাইনের এই সূত্রটির তার সাথে মিল নেই। আমরা যখন কোথাও যাবার জন্যে ট্রেনে উঠি তখন অনেক সময়েই যারা বিদায় দিতে আসে তারা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জানালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

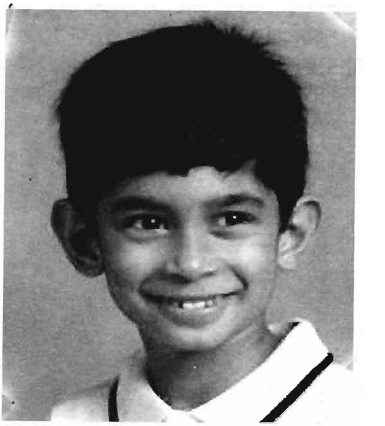

18.1 নং ছবি : আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির সূত্র দুটি এত সহজ যে একজন শিশুও সেটা বুঝতে পারবে।

দিয়ে গল্প করে। ট্রেন যখন চলতে শুরু করে তখন শেষ মুহূর্তে দু-একটি কথা বলতে হলে প্লাটফর্মের মানুষটিকে ট্রেনের সাথে সাথে হাটতে শুরু করতে হয়। ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকালে আমাদের তখন মনে হবে ট্রেনের তুলনার মানুষটিও বুঝি দাঁড়িয়ে আছে! ট্রেন থেমে মাথা বের করে অনেক সময়েই আমরা পাশাপাশি রাস্তার একটা গাড়িকে যেতে দেখেছি, গাড়িটা আর ট্রেনটা যদি একই দিকে যায় তাহলে মনে হয় গাড়িটা ধীরে ধীরে যাচ্ছে! এটি হচ্ছে আমাদের পরিচিত আপেক্ষিক গতি একটির তুলনায় আরেকটার গতি। এটা বের কারাও সহজ একটা থেকে অন্যটা বিয়োগ দিলেই হয়। আইনস্টাইন তার সূত্রে বলেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, তিনি বলেছেন আলোর বেলায় আমাদের পরিচিত আপেক্ষিক গতি কাজ করে না। আমি যদি কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে দেখি আলো ছুটছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে তাহলে একটা চলন্ত ট্রেন থেকেও তাই দেখব। শুধু যে সমবেগে চলতে থাকা একটা চলন্ত ট্রেন থেকে সেটা দেখব তা নয়, যদি আলোর পাশাপাশি সেকেন্ডে এক লক্ষ মাইল বেগে ছুটে যাওয়া একটা রকেট থেকে দেখি সেখানেও তাই দেখব। সেই আলোর বেগ আমাদের প্রচলিত নিয়মে (1,86,000-1,00,000=86,000) ছিয়াশি হাজার মাইল হবে হবে না, এবারেও হবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ধরা যাক আমরা প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে একটা মহাকাশযানে যাচ্ছি, যার গতিবেগ একলক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শত নিরানব্বই মাইল, অর্থাৎ আলো থেকে তার গতিবেগ মাত্র এক মাইল কম। তাহলেও আমাদের মহাকাশযান থেকে মনে হবে আলোটি তার নিজস্ব গতিবেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটছে! (খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, আমাদের মহাকাশযানটি যদি আলোর বেগে ছুটে তাহলে কী হবে? আইনস্টাইনের এই সূত্র দুটি থেকেই বের করে ফেলা যায় কোন বস্তুর গতিবেগই ঠিক আলোর গতিবেগের সমান হতে পারবে না। কখনো না!)

একশ বছর আগে আইনস্টাইনের দেয়া এই সূত্র দুটি হচ্ছে আজকে সবার পরিচিত আপেক্ষিক সূত্র বা থিওরি অফ রিলেটিভিটি। এই সূত্র দুটি আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল একশ বছর পরেও সেই আলোড়ন শেষ হয় নি। আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী আপেক্ষিক সূত্রের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 2005 সালে সারা পৃথিবীতে খুব হইচই করে সেটা পালন করা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এত বড় যুগান্তকারী একটি সূত্র, কিন্তু সেটি বুঝতে যে গণিতের প্রয়োজন হয় সেটি ছাত্রছাত্রীরা স্কুলেই শিখে ফেলে, তার জন্যে আলাদা কিছু শিখতে হয় না!

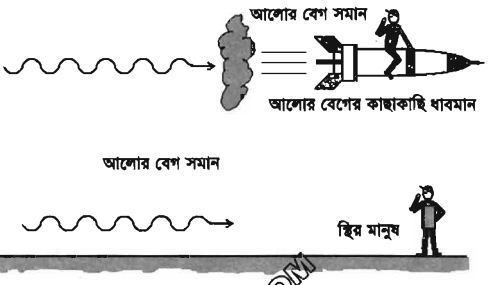

18.2 নং ছবি: একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকুক ছুটে যেতে থাকুক কিংবা একেবারে আলোর বেগের কাছাকাছি ছুটে যেতে থাকুক প্রতিবারই তার মনে হবে আলো ছুটে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটে আসছে।

AMARBOI.COM

আমরা আপেক্ষিক সূত্রটি ব্যাখ্যা না করে তার কারণে কী কী দেখা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করি। ধরা যাক আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার মাথার উপর দিয়ে একটা রকেট উড়ে গেল। রকেটের গতিবেগ যদি খুব বেশি না হয় তাহলে আমি রকেটটার মাঝে বিচিত্র কিছু দেখব না। কিন্তু রকেটটা যদি আলোর বেগের কাছাকাছি একটা গতি বেগে পৌঁছাতে পারে তাহলে আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করব রকেটটা যেন সংকুচিত হয়ে গেছে (18.3 নং ছবি)! এখানে আরও মজার একটি ব্যাপার ঘটে। ধরা যাক রকেটের ভেতরে একজন মহাকাশচারী বসে আছে এবং সে আমাকে তাকিয়ে দেখছে, সে যেহেতু রকেটে বসে আছে তার কাছে মনে হবে রকেটটাই স্থির এবং রকেটের তুলনায় আমিই যেন বিশাল গতিবেগে ছুটছি। তাই সে দেখবে রকেট নয়, আমি সংকুচিত হয়ে গেছি! কেউ যেন মনে না করে এগুলো গাল-গল্প, বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে রীতিমতো পরীক্ষা করে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন!

এটি তো হলো চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্যের সংকোচন, সময় নিয়ে যেটা হয় সেটা আরও অনেক বেশি চমকপ্রদ। আগে আমাদের ধারণা ছিল সময় সব জায়গায় সমান। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সূত্রটি একটু বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটা সত্য বের হয়ে আসে, সেটা হচ্ছে চলন্ত বস্তুর সময়ের প্রসারণ (Time dilation)। বিষয়টা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সবচেয়ে সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

18.3 নং ছবি: একটা রকেট যদি আলোর বেগের কাছাকাছি গতিতে ছুটে যায় তাহলে সেটাকে দেখা যাবে সংকুচিত হয়ে গেছে। আবার রকেটে বসে থাকা মহাকাশচারীর মনে হবে রকেটটা বুঝি ঠিকই আছে কিন্তু পৃথিবীটাই সংকুচিত হয়ে গেছে।

ক্যালিফোরনিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (caltech) থাকাকালীন সময়ে আমি টাইম প্রজেকশান চেম্বার নামে একটি ডিটেক্টর তৈরি করেছিলাম, সেটা ঠিকভাবে কাজ করছে কি না দেখার জন্যে আমি যে জিনিসটা ব্যবহার করতাম তার নাম হচ্ছে মিউওন (Muon)। এমনিতে মিউওনকে পাওয়া যায় না কারণ তার আয়ু হচ্ছে মাত্র দুই মাইক্রোসেকেন্ড (দুই সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) কোথাও এটা তৈরি হওয়ার দুই সেকেন্ডের মাঝে এটা শেষ হয়ে যায়। তবে পৃথিবীতে তার অভাব নেই কারণ প্রচণ্ড শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে আঘাত করছে এবং সেই আঘাতে মিউওনের জন্ম হচ্ছে। তবে সমস্যা হচ্ছে এই মিউওনগুলোর জন্ম হয় পৃথিবী থেকে একশ কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত সীমানায়। তারা যে গতিবেগে আসে (আলোর গতিবেগের বেশ কাছাকাছি) তাতে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় তিনশত মাইক্রোসেকেন্ড। যে জিনিসটার আয়ু মাত্র দুই মাইক্রোসেকেন্ড সেটা কেমন করে তিনশত মাইক্রোসেকেন্ড পর্যন্ত টিকে থাকে? বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সূত্রের আগে এই রহস্যের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। এখন আমরা কারণটি জানি। একটি মিউওন তার নিজস্ব ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে কিন্তু তার আয়ু— মাত্র দুই মাইক্রো সেকেন্ডই বেঁচে থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে সেই সময়টা অনেক দীর্ঘ, তিনশ মাইক্রোসেকেন্ড। কাজেই ক্যালিফোরনিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বেসমেন্টে বসানো আমার সেই ডিটেক্টারে আমি এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময়ে নিয়ে মিউওনগুলোকে দেখতাম। বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপরে জন্ম নিয়ে, প্রচণ্ড শক্তিতে বায়ুমণ্ডল, বিল্ডিংয়ের ছাদ, ডিটেক্টরের ধাতব দেয়াল সবকিছু ভেদ করে চলে যেত। এই মিউওনগুলোকে আমি দেখতাম কারণ তাদের সময়টি প্রসারিত হয়ে গেছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপেক্ষিক সূত্রের এই বিষয়টি আমাদের জন্যে অনেক রহস্যের জন্ম দিয়েছে। একজন মানুষ যদি কোনো মহাকাশযানে করে সুদূর মহাকাশে পাড়ি দেয়, তার গতিবেগে যদি আলোর কাছাকাছি হয় তাহলে সে হয়তো বছর দশেক পর ফিরে এসে আবিষ্কার করবে এই দশ বছরে পৃথিবীতে এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তার পরিচিত পৃথিবীর কিছুই আর নেই!

বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখকেরা বিজ্ঞানের কাল্পনিক গল্প লিখেন, কিন্তু সত্যিকারের কাহিনী যে কল্পনা থেকেও একশ গুণ বেশি চমকপ্রদ সেটা কী কখনো ভেবে দেখেছেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

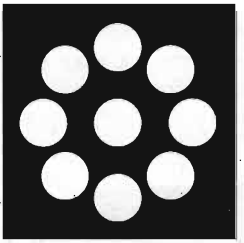

19. বিগ ব্যাং : একটি নাটকীয় বিষয়

যারা ট্রেন লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা চলন্ত ট্রেনকে হুইসেল দিতে দিতে আসতে শুনেছে তারা নিশ্চয়ই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। ট্রেনটা যখন এগিয়ে আসতে থাকে তখন হুইসেলটা শোনায় একরকম (তীক্ষ্ণ) এবং যখন ছেড়ে চলে যেতে থাকে তখন শোনায় অন্যরকম (ভোঁতা)। তার কারণ হুইসেলের শব্দটা এক ধরনের তরঙ্গ, ট্রেন যখন সেই তরঙ্গটা ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসে তখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা একটু কমে আসে। তাই হুইসেলের শব্দটা শোনায় তীক্ষ্ণ। আবার ট্রেনটা যখন তরঙ্গটা ছাড়তে ছাড়তে দূরে সরে যেতে থাকে তখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা একটু বেড়ে যায় তাই শব্দটা একটু ভোঁতা হয়ে আসে। তরঙ্গ যেখান থেকে আসছে তার গতির সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া এবং কমে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ডপলার এফেক্ট (19.1 নং ছবি)।

AMARBOI.COM

19.1 নং ছবি : গ্রাহকের দিকে ধাবমান তরঙ্গকে মনে হয় ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, আবার গ্রাহক থেকে দূরে সরে যাওয়া তরঙ্গকে মনে হয় দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু যে শব্দের জন্যে ডপলার এফেক্ট হয় তা নয়, যে কোন তরঙ্গের জন্যে ডপলার এফেক্ট হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ডপলার এফেক্ট ব্যবহার করে খুব সহজে গতিবেগ বের করা যায়। যে সব দেশে গাড়ি খুব বেশি এবং বাড়াবাড়ি গতিতে গাড়ি চালানোর সমস্যা আছে সেখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ হাতে এক ধরনের রাডার যন্ত্র নিয়ে বসে থাকে এবং ডপলার এফেক্ট ব্যবহার করে গাড়ির গতিবেগ মাপতে থাকে। কোন গাড়ি নির্ধারিত গতিসীমার থেকে বেশি গেলেই রয়েছে বিশাল জরিমানা!

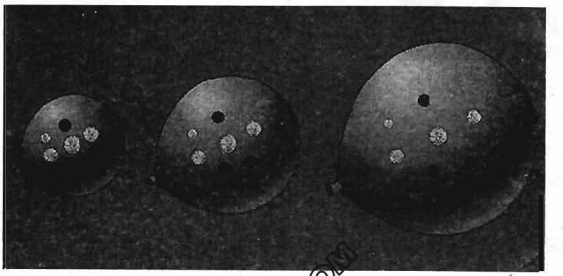

19.2 নং ছবি: একটা বেলুনকে যদি ফুলানো হয় তাহলে বেলুনের উপরের বিন্দুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে।

AMARBOI.COM

আলোর তরঙ্গের ডপলার এফেক্ট মাপার প্রক্রিয়া বের করার পর বিজ্ঞানীরা প্রথম যে বস্তুগুলোর গতি মাপার চেষ্টা করলেন সেগুলো হচ্ছে মহাজাগতিক নক্ষত্র গ্যালাক্সি। বহুদূরের যে নক্ষত্রটা আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে সেটি কী এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাকি কোনো দিকে ছুটে যাচ্ছে সেটা জানতে সবারই আগ্রহ। যে নক্ষত্রটার গতি মাপতে যাচ্ছি সেখান থেকে যে আলো বের হয়ে আসছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি যা হওয়ার কথা তার থেকে লম্বা হয়ে যায় তার মানে নক্ষত্রটা দূরে সরে চলে যাচ্ছে। যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যা হওয়ার কথা তার থেকে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। গতিবেগের কারণে যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় সেটাকে বলে ডপলারের রেড শিফট (কারণ দৃশ্যমান আলোর লাল রঙটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি)। আবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন কমে যায় তখন সেটাকে বলে ব্লু শিফট (কারণ দৃশ্যমান আলোর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোটি হচ্ছে নীল)।

খুব সঙ্গত কারণেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে একটা নক্ষত্রের আলোতে রেড শিফট হয়েছে না ব্লু শিফট হয়েছে সেটা বিজ্ঞানীরা বোঝেন কেমন করে? যে আলোটা আসছে তার প্রকৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই হয়তো সেটা! আসলে বিষয়টা খুব সহজ— বহুদূর গ্যালাক্সির কোনো নক্ষত্র বা তারাও আসলে তৈরি হয়েছে আমাদের পরিচিত পরমাণু দিয়ে। একটা পরমাণু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা পৃথিবীতেই থাকুক আর কোটি কোটি মাইল দূরেই থাকুক সেটা থেকে বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কিছু আলো বের হয়। তাই বিজ্ঞানীরা তার সঠিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানেন। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্যাটার্ন দেখেই সেটা চিনে ফেলেন। যখন কোনো দূর নক্ষত্র থেকে আসার কারণে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়ে যায় সেটা বোঝা খুব সহজ। কতটুকু রেড শিফট বা ব্লু শিফট হয়েছে সেখান থেকে শুধু যে নক্ষত্রটার গতি বেগ বের করা যায় তা নক্ষত্রটা কি আমাদের দিকে আসছে নাকি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেটাও নিখুঁতভাবে বের করে ফেলা যায়।

19.3 নং ছবি : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্যালাক্সিই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির গতিবেগ মেপে তারা দেখবেন কোনটা স্থির কোনটা গতিশীল। কোনটার গতি বেশি কোনটার গতি কম। কোনটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে কোনটা আমাদের থেকে দূরে সরে চলে যাচ্ছে— এক কথায় নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির গতিবেগগুলোর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ক্যালিফোরনিয়ার মাউন্ট উইলসনের একশ ইঞ্চি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মহাকাশের নানা নক্ষত্র, নানা গ্যালাক্সির ডপলার শিপট মেপে দুটো অত্যন্ত বিচিত্র সত্য আবিষ্কার করলেন। মহাজগতের সকল নক্ষত্র বা গ্যালক্সিই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (অর্থাৎ, রেড শিফট হচ্ছে) এবং যে নক্ষত্র আমাদের থেকে যতদূরে সেই নক্ষত্রটি তত জোরে সরে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হতে পারে আমাদের পৃথিবীটা তাহলে নিশ্চয়ই সমস্ত মহাজগতের কেন্দ্রস্থল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান কারণ এটাকে কেন্দ্রে রেখে সবকিছু দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি তা নয়, আমরা পৃথিবীতে বসে এই পরীক্ষাগুলো না করে যদি মহাজগতের অন্য কোনো গ্যালাক্সির অন্য কোনো গ্রহে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

19.4 নং ছবি : ফ্রেড হয়েল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন স্থিত অবস্থা দিয়ে, প্রতি কিউবিক মিটারে প্রতি বিলওন বছরে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্ম দিলেই এটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই পরীক্ষাগুলো করতাম তাহলেও হুবহু এই একটই জিনিস দেখতে পেতাম। ব্যাপারটা বোঝা খুব সহজ হয় একটি বেলুনকে দেখলে। বেলুনের উপর বেশ কয়েকটা বিন্দু এঁকে সেটাকে ফোলাতে থাকলে যে কোন বিন্দুরই মনে হবে অন্য বিন্দুগুলো তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী হাবলের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার থেকে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু একটির কাছ থেকে অন্য একটি দূরে সরে যাচ্ছে। বেলুনের উদাহরণটি পুরাপুরি সঠিক ছিল না। কারণ, বেলুনের মাঝে আমরা শুধু পৃষ্ঠদেশে কয়েকটা বিন্দু আঁকতে পেরেছি। ত্রিমাত্রিক কোনো কিছুকে যদি ফোলানো যেত তাহলে সেটা আরও সঠিক উদাহরণ হতো তাহলে আমরা দেখতাম কোনো একটা বিন্দু থেকে অন্য সব বিন্দু দূরে সরে যাচ্ছে এবং এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু যতদূরে সেটি তত দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে, ঠিক হাবল যেটা দেখেছেন।

বিজ্ঞানীরা যখন বুঝতে পারলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলে স্থির নয়— এটা প্রচণ্ড গতিতে দ্রুত সরে যাচ্ছে, অন্যভাবে বলা যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই যেন ফুলে ফেপে উঠছে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, "কেন?"

বিষয়টি দুভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হলো, প্রথম ব্যাখ্যাটি হচ্ছে স্থিত অবস্থা (Stealy state)। এই ব্যাখ্যার অর্থ হচ্ছে এ-রকম : যদিও দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ, নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু এই ব্যাপারটিই আসলে এক ধরনের চলমান স্থিতি অবস্থা। অর্থাৎ, এভাবে চলতে থাকলে যেহেতু সময়ের সাথে সাথে একটি নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্র অনেক দূরে চলে যাবে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুর ঘনত্ব কমে যাবে কাজেই সেটা

19.5 নং ছবি : জর্জ গ্যামো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বিগ ব্যাং দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক রাখার জন্যে মহাজগতে ক্রমাগত নূতন পদার্থের জন্ম হবে। এই স্থিতি অবস্থা ব্যাখ্যার জনক ছিলেন ফ্রেড হয়েল এবং তার এই ব্যাখ্যাটি সত্যি হতে হলে ক্রমাগত নূতন নূতন গ্যালাক্সির জন্ম হতে হবে। আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত বড় যে ফ্রেড হয়েলের ব্যাখ্যাটি সত্যি হওয়ার জন্যে খুব বেশি পদার্থের জন্ম দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এক কিউবিক মিটারে প্রতি বিলিওন বছরে (শত কোটি) একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্ম দিতে পারলেই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন জর্জ গ্যামো। তার ব্যাখ্যাটি অনেক বেশি নাটকীয়। আমরা এখন যেহেতু দেখতে পাচ্ছি সবকিছু প্রবল বেগে একটি থেকে অন্যটি দূরে সরে যাচ্ছে, তার অর্থ অতীতে নিশ্চয়ই সবকিছু এক জায়গায় ছিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এক বিন্দুতে ছিল। তখন প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয় এবং সেই বিস্ফোরণের কারণে সবকিছু ছুটে যেতে শুরু করেছে এবং আমরা সেটাই দেখছি। এই ব্যাখ্যাটির নাম বিগ ব্যাং (Big Bang)। বোঝাই যাচ্ছে এ ধরনের একটা নাটকীয় ব্যাখ্যা শুনলেই আমরা ভুরু কুচকে নানা ধরনের প্রশ্ন শুরু করি, এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন করে একটা বিন্দুতে থাকে, কেমন করে সেই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগে সেখানে কী ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

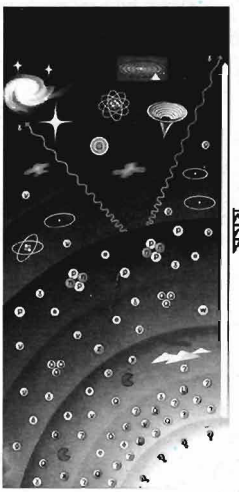

19.6 নং ছবি : বিগ ব্যাং অনযায়ী একটি বিন্দুতে একটি বিস্ফোরণের ভেতর থেকে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল।

বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তো লেবরেটরিতে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই কোন ব্যাখ্যাটি সত্য সেটা বের করা নিশ্চয়ই খুব সহজ একটা ব্যাপার হবে না। বিজ্ঞানীরা বুঝি আজীবন একটি কিংবা অন্যটির পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করতে থাকবেন।

কিন্তু সেটি হয় নি, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অতি নাটকীয় বিগ ব্যাং ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করে নিয়েছেন। তার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ঘটেছে 1965 সালে। আর্নো পেনজিয়া এবং রবার্ট উইলসন নামে বেল ল্যাবের দুজন বিজ্ঞানী একটা মাইক্রোওয়েভ এন্টেনা দিয়ে একটা নিখুঁত পরীক্ষা করতে গিয়ে খুব ঝামেলায় পড়ে গেলেন, তার এন্টেনাতে সব সময়েই একটা বিরক্তিকর সিগন্যাল এসে নিখুঁত পরীক্ষার মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিরক্তিকর সিগন্যালটা দূর করতে না পেরে বিজ্ঞানী দুজন হতাশ হয়ে বললেন, যেদিকেই এই এন্টেনাটি ব্যবহার করা যাক না কেন, সব দিক থেকেই এই সিগন্যালটি আসছে। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী বা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যেন এই সিগন্যালে ডুবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা হচ্ছে তিন ডিগ্রি কেলভিন।

ঠিক একই সময়ে মাইল বিশেক দূরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেব করে বের করলেন বিগ ব্যাং এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে থাকলে সেখানে প্রচণ্ড তাপমাত্রার সৃষ্টি হবে, এতদিন তার তাপমাত্রা কমে সেটি তিন ডিগ্রি কেলভিনে নেমে আসবে। খুব সহজেই পরীক্ষা করে এটা মাপা সম্ভব। কিছুদিনের মাঝেই তারা খবর পেলেন এই পরীক্ষাটি আসলে দাঁড়া করানোর প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে সেটা করা হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফলাফলও প্রস্তুত।

কাজেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন আজ থেকে বিশ বিলিওন বৎসর আগে ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল। বিজ্ঞানের জগতে নাটকীয় বিষয়ের স্থান খুব কম। কিন্তু বিগ ব্যাংয়ের মতো একটি অতি নাটকীয় বিষয় আমাদের বিজ্ঞানের মাঝে মনে হয় পাকাপাকিভাবেই ঢুকে গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

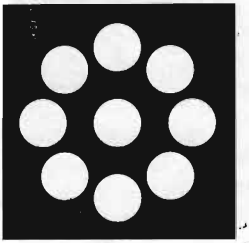

20. সবকিছুর তত্ত্ব : স্ট্রিং থিওরি

পৃথিবীতে চার ধরনের বল রয়েছে। মহাকর্ষ বল, নিউক্লিয়ার বল, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল এবং উইক (weak বা দুর্বল) বল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রথম তিনটির কথা ঘুরে ফিরে চলে আসে, অনুমান করা যায় চতুর্থটির নাম আমরা সেরকম শুনতে পাই না। মহাকর্ষ বলের কারণে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে কিংবা আছাড় খেলে আমরা শূন্যে ঝুলে না থেকে ধরাম করে পড়ে যাই! নিউক্লিয়ার বল ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে এই বোমা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা সূর্য থেকে যে আলো আর তাপ পাই সেটাও আসে নিউক্লিয়ার বল থেকে। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বলের উদাহরণ অসংখ্য, আমাদের চারপাশে তার ছড়াছড়ি। ঘরের লাইট বাল্ব বা গাড়ির ইঞ্জিন সবকিছুর মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি। উইক বলের উদাহরণ দিতে হলে একটু মাথা চুলকাতে হয়, কারণ আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি তার মাঝে চট করে সেরকম উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। উইক বলের কারণে সূর্যের ভেতরে নিউট্রিনো নামে এক ধরণের কণা তৈরি হয়, সেগুলো প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যায় আমরা কখনো টের পাই না! শুধুমাত্র চোখের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিওন নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে কেউ সেটা দেখছে না! কারণটি সহজ, উইক বল আসলেই দুর্বল। আসলেই এটা কোনো কিছুর সাথে বিক্রিয়া করে না।

বিজ্ঞানীরা সব সময়েই সবকিছু সহজ করে বোঝার চেষ্টা করেন। একটা সময় ছিল যখন চুম্বক এবং বিদ্যুৎকে আলাদা বলে মনে করা হতো। একসময় তারা দেখলেন যে আসলে এই দুটো আলাদা কিছু না, একই বলের দুটি ভিন্নরূপ। ঠিক একইভাবে তারা বিশ্বাস করেন প্রকৃতিতে যে চারটি বল রয়েছে সেগুলো আসলে আলাদা নয়, সেগুলো আসলে একই বলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে ইতোমধ্যে তারা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল এবং উইক বলকে একত্র করে ফেলেছেন, সেটার নাম দেয়া হয়েছে ইলেকট্রো উইক বল! কাজেই যদি শুরুতে যদি বলা হতো প্রকৃতিতে তিন ধরনের বল মহাকর্ষ, নিউক্লিয়ার এবং ইলেকট্রো উইক তাহলে ভুল হতো না! আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় এবং উইক বলকে আলাদাভাবে দেখি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাপমাত্রা যদি অনেক বেশি হতো তা হলে সেটা আর আলাদা থাকত না এক হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন তাপমাত্রা যদি আরও বাড়িয়ে দেয়া যেত তাহলে নিইক্লিয়ার বল এবং ইলেকট্রো উইক বলও এক হয়ে যাবে এবং এই ধারণাটার নাম স্ট্যান্ডার্ড মডেল (Standard model)। পদার্থবিজ্ঞানের এটা বেশ গ্রহণযোগ্য একটা ধারণা।

20। নং ছবি: মহাকর্ষ বল খুবই দুর্বল, সমস্ত পৃথিবী যখন এক টুকরা কাগজকে নিচের দিকে টানছে তখন একটা চিরুনীর অল্প একটু স্থির বিদ্যুৎ সেটাকে টেনে সরিয়ে আনতে পারে।

সবাই সম্ভবত লক্ষ করেছে তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলে মহাকর্ষ বলটিও তার সাথে একত্র হয়ে যাবে এই কথাটি বলা হয় নি! আসলে মহাকর্ষ বল অন্য তিনটি বল থেকে একেবারে অন্যরকম। নিউক্লিয়ার, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় এবং উইক বলকে ব্যাখ্যা করার জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের যে অংশ ব্যবহার করা হয় তার নাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স। মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করার জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের যে অংশ ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে জেনারেল রিলেটিভিটি! বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জেনারেল রিলেটিভিটির জনক, তিনি তার জীবনের ত্রিশ বৎসর মহাকর্ষ বলের সাথে অন্য বলগুলো একত্র করার জন্যে ব্যয় করেছিলেন, পারেন নি! মহাকর্ষ বল এমন একটি বল যে সেটাকে অন্য বলের সাথে একত্র করা অত্যন্ত দুরুহ!

মহাকর্ষ বল তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। এটা কত দুর্বল সেটা খুব সহজে পরীক্ষা করা যায়। শীতের দিনে চুল আচড়ে একটা চিরুনীকে ছোট কাগজের টুকরোর কাছে ধরলে কাগজটা লাফিয়ে চিরুনীর গায়ে লেগে যায়। বিশাল পৃথিবী তার সমস্ত ভর ব্যবহার করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে কাগজটাকে নিচের দিকে টানছে অথচ ছোট একটা প্লাস্টিকের চিরুনীতে অল্প একটু স্থির বিদ্যুৎ দিয়েই পুরো পৃথিবীর সম্মিলিত মহাকর্ষ বল থেকে বেশি বল প্রয়োগ করা সম্ভব। মনে হতে পারে এটা বুঝি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বল, কিন্তু দেখা গেছে মহাকর্ষ বল অন্য সব বলের মতো। এটাও আলোর বেগের দ্রুততায় কাজ করে। অর্থাৎ, কোনো জাদুমন্ত্রের সাহায্যে যদি সূর্যটাকে উধাও করে দেয়া যায় পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে সাথে সাথে ছিটকে যাবে না, এটা ছিটকে যাবে আট মিনিট পরে। কারণ, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। দেখা যাচ্ছে কোনো এক রহস্যময় কারণে মহাকর্ষ বল বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে তার বল প্রয়োগের সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে, কাজেই নিশ্চয়ই তাদের ভেতরে কোনো এক ধরনের যোগসূত্র রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ধরনের বলকে একত্র করার জন্যে বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই, ঝামেলা ছিল মহাকর্ষ বলকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে এই চারটি বলকে একত্র করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সুপার স্ট্রিং থিওরি (Super sting theory)। এর জন্ম ইতিহাসটা মোটামুটি চমকপ্রদ কারণ এর মাঝে আছে বৈচিত্র, কৌতূহল, হতাশা এবং ধৈর্য্যের এক অপূর্ব সম্মেলন!

1968 সালে গ্যাব্রিয়েল ভেনেজিয়ানো নামে একজন তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী শক্তিশালী এক্সেলেটরে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলগুলো পরীক্ষা করতে করতে একটা বিচিত্র মিল খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন বিখ্যাত গণিতবিদ অয়লার দুশ বছর আগে যে বিটা ফাংশান তৈরি করে দিয়েছেন পরীক্ষার ফলাফলগুলো তার সাথে মিলে যায়। কেন এটা হয় এই তরুণ বিজ্ঞানী সেটা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। দুই বছর পর 1970 সালে লিওনার্ড সাসকিন্ড, হলজার নিলসেন এবং ইওশিরো নামবু নামে তিনজন বিজ্ঞানী দেখেলেন যদি দুটো কণা আসলে সুতার মতো রিং হিসেবে থাকে তাহলে তাদের ভেতরে যে শক্তির আদান-প্রদান হয় সেটি অয়লারের বিটা ফাংশান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বিষয়টি অত্যন্ত চমকপ্রদ কারণ এর আগে সবাই জানত সবকিছুই একটা বিন্দুর মতো যার কোনো ব্যাপ্তি নেই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটি বিন্দু নয়, এগুলো রবার ব্যান্ডের মতো স্ট্রিং! এত বড় একটা আবিষ্কারের পরও পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ সেটাকে তেমন আমল দিলেন না কারণ এই তত্ত্বটি অন্য অনেক ফলাফলকে ব্যাখ্যা করতে পারল না। 1974 সালের মাঝে সবাই স্ট্রিং থিওরির কথা মোটামুটি ভুলেই গেল।

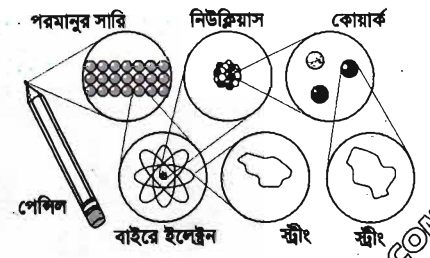

20.2 নং ছবি: সবকিছুরই তৈরী হয়েছে স্ট্রিং দিয়ে

AMARBOI.COM

জন শোয়ার্জ নামে একজন শুধু স্ট্রিং থিওরিকে ভুলে গেলেন না, তার কেন জানি মনে হলো এর ভেতরে গভীর কোনো ব্যাপার লুকিয়ে আছে। তিনি এবং তার সহকর্মীরা এর পিছনে লেগে রইলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে তিনি স্ট্রিং থিওরি ব্যাখ্যা করলেন এবং আবিষ্কার করলেন স্ট্রিং থিওরি থেকে ভর শূন্য এবং স্পিন 2 এক ধরনের কণা বের হয়ে আসার কথা। (স্পিন কণাদের একটা ধর্ম। আলোর কণা হচ্ছে ফোটন তার স্পিন হচ্ছে 1) কোনো এক্সপেরিমেন্টে কোথাও কখনো স্পিন 2 কণা পাওয়া যায় নি। সবাই ধরেই নিল স্ট্রীং থিওরিতে সমস্যা রয়েছে।

জন শোয়ার্জ এবং তার সহকর্মী জোয়েলের তখন হঠাৎ একটা চমকপ্রদ ব্যাখ্যা কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো— বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বলের বাহক হচ্ছে ফোটন, সে-রকম ধরে নেয়া হয় মহাকর্ষ বলের বাহক হচ্ছে গ্রেভিটন। গ্রেভিটন কেউ কখনো দেখে নি, কিন্তু যদি এটা থেকে থাকে তাহলে এটি হবে ভরশূন্য এবং এর স্পীন হবে 2! শোয়ার্জ এবং জোয়েল তখন ভাবলেন পৃথিবীর কেউ যেটা পারে নি মহাকর্ষ বলকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায় আনা, তাহলে কী তারা সেই সম্ভাবনায় হাত দিয়েছেন? তারা তাদের কাজ জার্নালে প্রকাশ করলেন, ভেবেছিলেন বিজ্ঞানী মহলে হইচই পড়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল কেউ গা করল না। সবাই ধরে নিল একটা মৃতপ্রায় থিওরিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন!

স্ট্রিং থিওরিকে কোনো গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যে বিজ্ঞানী মহলকে অবশ্যি দোষ দেওয়া যায় না। এর মাঝে তখন বড় বড় সমস্যা ছিল। গাণিতিক অসামঞ্জস্যতা ছিল, পদার্থবিজ্ঞানীরা এ-রকম সমস্যাবহুল থিওরি নিয়ে মাথা ঘামাবেন সেটা কেউই আশা করে না।

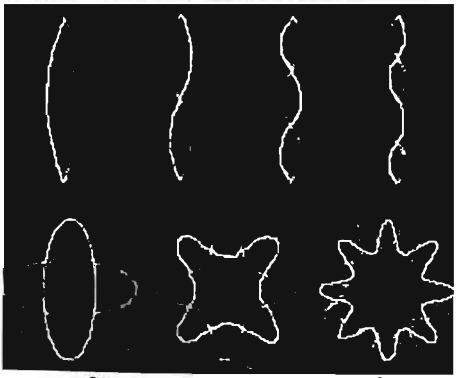

20.3 স্ট্রিংয়ের এক এক ধরনের কম্পন হচ্ছে এক একটি কণা।

জন শোয়ার্জ আশা ছাড়লেন না। তার কাছে মনে হলো যদি এটা সত্যিকারের একটা থিওরি হয়ে থাকে তাহলে এর মাঝে কোনো অসামঞ্জস্য থাকার কথা নয়। পুরো তত্ত্বটা যদি নিখুঁতভাবে হিসেব করা যায় হয়তো দেখা যাবে একটা সমস্যা অন্য সমস্যাকে কাটাকাটি করে দিচ্ছে। সমস্যারা নিজেরা কাটাকাটি করে সমস্যাহীন নিখুঁত একট তত্ত্ব বের হয়ে আসবে! ব্যাপারটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু জন শোয়ার্জ লেগে থাকলেন। এবারে তার সাথে যোগ দিলেন মাইকেল গ্রীন এবং দুজন মিলে প্রায় দশ বৎসর টানা পরিশ্রম করে তারা আবিষ্কার করলেন যে তাদের ধারণা সত্যি, সমস্যাগুলো একটা আরেকটাকে কাটাকাটি করে দূর হয়ে গেছে! কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কাছে পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য এই স্ট্রিং থিওরি। 1984 সালে তাদের এই আবিষ্কারের কথা যখন বিজ্ঞানী মহলে প্রচারিত হলো তখন একসাথে সবার টনক নড়লো। মহাকর্ষকে নিয়ে সকল বলকে এক সূত্রে গাথার এই তত্ত্বটি নিয়ে এতদিন গবেষণা করছিলেন মাত্র দুজন, রাতারাতি সেখানে কয়েক হাজার গবেষক ঝাঁপিয়ে পড়লেন। (জন শোয়ার্জ তখন ক্যালটেকের প্রফেসর, আমিও তখন পোস্ট ডক্টরাল কাজে ক্যালটেকে যোগ দিয়েছি। বিজ্ঞানীদের সেই উত্তেজনা আমার খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাই যাচ্ছে স্ট্রিং থিওরির বিষয়টা কোনো সহজ বিষয় নয়, কিন্তু ভেতরে মূল ভাবটা এমন কিছু কঠিন নয়। বিষয়টা এভাবে বোঝানো যায় :

আমরা যে কোনো জিনিস নিয়েই শুরু করি না কেন, সেটাকে যদি ভাংতে শুরু করি তাহলে একসময় আমরা পরমাণুতে পৌঁছে যাবে। (20.1নং ছবি) এই পরমাণুর একটা যদি আমরা ভালো করে পরীক্ষা করি তাহলে দেখব এর মাঝখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস এবং সেই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনকে আর ভাঙা সম্ভব নয়, ধরে নেয়া হয় সেটাই তার আদি রূপ, তার কোনো ব্যাপ্তি নেই, এটি একটি বিন্দুর মতো। তবে নিউক্লিয়াসকে আরো ভাঙা সম্ভব এবং তাহলে আমরা পাব— প্রোটন আর নিউট্রন। বিশ্বাস করা হয় প্রোটন এবং নিউট্রন তৈরি হয়েছে কোয়ার্ক দিয়ে। ইলেকট্রনের মতো কোয়ার্ককেও ধরে নেয়া হয় ব্যাপ্তিহীন একটা বিন্দুর মতো, এটাকে ভেঙে আর নূতন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

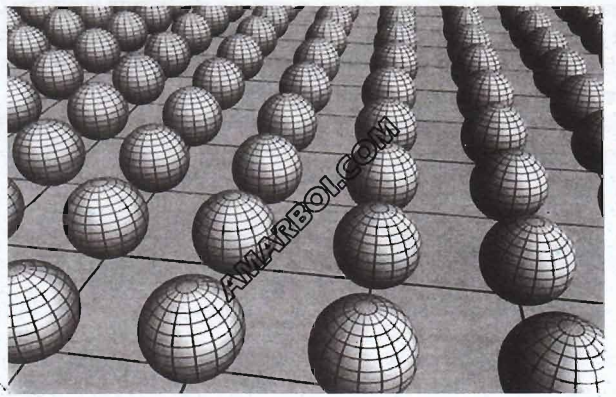
AMARBOI.COM

20.4 নং ছবি : স্ট্রিং থিওরি যদি সত্যি হয় তাহলে পরিচিত বহুমাত্রিক জগতের বাইরেও আরো ছয়টি মাত্রা আছে যেগুলো খুব অল্প জায়গার মাঝে কুকড়ে রয়েছে।

স্ট্রিং থিওরি বলছে যে ইলেকট্রন বা কোয়ার্কদেরকে আমরা একটা বিন্দু বলছি কারণ আমরা সেটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে পাচ্ছি না। যদি এটাকে আরো সূক্ষ্মভাবে দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম এগুলো আসলে বিন্দু নয় সুতা দিয়ে তৈরি রিংয়ের মতো এক ধরনের আকৃতির বস্তু! এই রিংগুলো নানাভাবে কাঁপতে পারে এবং এর এক একটি কম্পন হচ্ছে (20.3 নং ছবি) সৃষ্ট জগতের এক একটি কণা! এতদিন বিশ্বাস করা হতো সৃষ্ট জগতের সবকিছু তৈরি হয়েছে তিন ধরনের কণার পরিবার দিয়ে। এই পরিবারের চার সদস্য, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, আপ কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্ক। (আপ কোয়ার্ক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি হয় নিউট্রন এবং প্রোটন) এ-রকম আরো দুটি পরিবার আছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যার খোঁজখবর থাকার কথা নয়।

সৃষ্টির এই আদি রূপের সবগুলো আসলে একটি করে স্ট্রীং! এই স্ট্রীংয়ের এক এক ধরনের কম্পনের জন্যে এক একটি কণার জন্ম হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা যেভাবে সবকিছু একটি সূত্র দিয়ে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন এটা হচ্ছে ঠিক সেরকম একটি সূত্র। সৃষ্টজগতের সবকিছু হচ্ছে স্ট্রিং বা সুতোর বাঁধন!

এত চমৎকার একটা তত্ত্ব দেয়ার জন্যে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য দিতে হয়েছে। সেই মূল্যটা কী?

মূল্যটা কিন্তু কম নয়। মূল্যটা অনেক বড়— আমাদের পরিচিত ত্রিমাত্রিক জগৎকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। স্ট্রিং থিওরি যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের জগৎটি আসলে ত্রিমাত্রিক নয় এর আরো ছয়টি মাত্রা রয়েছে যেগুলো খুব ক্ষুদ্র জায়গায় কুকড়ে রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না! সামনে পিছনে এক মাত্রা ডানে বায়ে দুই মাত্রা এবং উপরে নিচে হচ্ছে তিন মাত্রা এই তিনটি নিয়ে আমাদের পরিচিত ত্রিমাত্রিক জগৎ! এর বাইরে আরো ছয়টি মাত্রা কীভাবে থাকবে কেউ কী কল্পনা করতে পারবে?

যেটা কল্পনাও করা যায় না সেটার অস্তিত্ব আছে এর চাইতে চমকপ্রদ ব্যাপার আর কী হতে পারে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

21. ভূমিকম্প

1987 সালের অক্টোবর মাসের 1 তারিখ ভোরবেলা আমি বাথরুমে গিয়েছি হঠাৎ করে মনে হলো আমার পায়ের তলার মেঝেটি একটি জীবন্ত প্রাণীর মতো ছটফট করে সরে যেতে শুরু করেছে। আমি তখন দক্ষিণ ক্যালিফোরনিয়ার প্যাসাডিনা এলাকায় থাকি এবং সবাই জানে এই এলাকায় সান এন্ড্রিয়াস ফল্ট লাইনটির কারণে যে কোনোদিন এখানে একটা ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে— আমার ধারণা হলো এটিই বুঝি সেটি। আমার ছোট ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে দোতলা থেকে নেমে বাইরে যাওয়ার জন্যে যখন ছুটছি তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম ভয়ংকর ভূমিকম্পটি আমাকে করিডোরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুড়ে দিচ্ছে আমি এগুতেই পারছি না। কোনোভাবে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি এবং দেখছি একটু পরপর ভূমিকম্প ছুটে আসছে ঢেউয়ের মতো। ভূমিকম্প যে মাটির উপর দিয়ে ছুটে আসতে পারে সেটি আমি

21.1 নং ছবি: 1987 সালের অক্টোবরের 1 তারিখের ভূমিকম্পে এই ফ্রি ওয়েটি ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আগে কখনো দেখি নি!

রিক্টর স্কেলে সেই ভূমিকম্পটি ছিল ছয়! ছয় ভয়াবহ ভূমিকম্প নয় কিন্তু এতেই প্যাসাডিনা এলাকার অনেক ফ্রী ওয়ে ধ্বসে পড়েছিল, মানুষজনও মারা গিয়েছিল। আমার দেখা এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প এবং এটা দেখেই ভূমিকম্প বিষয়টির প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা মেশানো ভয়ের জন্ম হয়ে গেছে।

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ভূমিকম্প একটু অন্যরকম কারণ এটি কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। বিজ্ঞানীরা খুব চেষ্টা করছেন ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করতে কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব লাভ হয় নি। 1975 সালের 4 ফেব্রুয়ারি চীন দেশের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের লিয়াওনিং এলাকার কর্মকর্তারা সেখানে একবার ঘোষণা দিয়েছিলেন সবাই যেন ঘরের বাইরে থাকে, চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প আসবে। তখন কনকনে শীত, সেই শীতের মাঝে সবাই বাইরে থাকল এবং সত্যি সত্যি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প এসে পুরো এলাকাটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল। রিক্টর স্কেলে সেটি ছিল 7.3 তারপরেও মানুষের প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি বলতে গেলে কিছুই হয় নি।

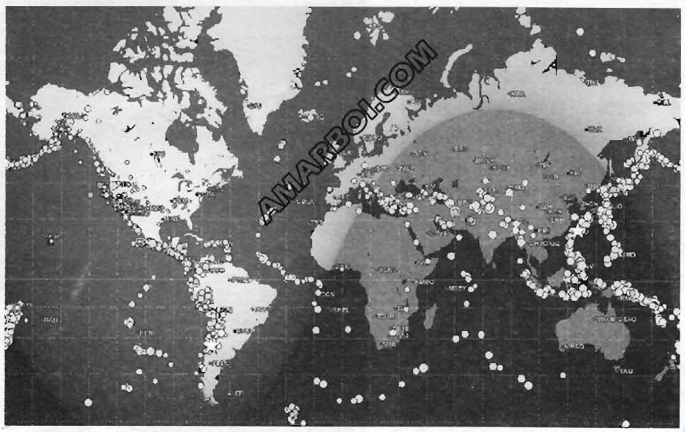

21.2 নং ছবি : পৃথিবীর কিছু-কিছু জায়গায় ভূমিকম্প হবার আশংকা খুব বেশি।

কেউ যেন মনে না করে চীন দেশের বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন কারণ 1976 সালের 27 জুলাই তাংশান এলাকায় হঠাৎ করে একটা ভূমিকম্পে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ মারা পড়েছিল বিজ্ঞানীরা তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি। এরপর প্রায় এক মাসের ভেতর 1976 সালের আগস্ট মাসে কোয়াংটাং প্রদেশ বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প আসছে। এলাকার মানুষজন ভয়ে একদিন-দুদিন নয় পাকা দুই মাস ঘরের বাইরে দিন কাটালো কিন্তু ভূমিকম্প এলো না!

বিজ্ঞানীরা অবশ্যি একেবারে হাল ছেড়ে দেন নি, ভূমিকম্প ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে তারা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভূমিকম্পের ঠিক আগে আগে সেই এলাকায় বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়, র‍্যাডন গ্যাস বের হয়ে আসে, ছোট ছোট ভূমিকম্পের দেখা দেয় এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা চলছে। আবার ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়কেও মাঝে মাঝে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সেটি হচ্ছে পশুপাখিদের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে ভূমিকম্পের ঠিক আগে আগে মোরগ-মুরগি গাছের উপরে উঠে বসে থাকে, শূকর একেবারে চুপ করে যায়, হাঁস পানি থেকে উঠে আসে এবং কুকুর অবিশ্রান্তভাবে ডাকাডাকি শুরু করে! ঠিক কী কারণে পশুপাখি এ-রকম ব্যবহার করে সেটি এখনো পুরাপুরি জানা যায় নি, পরিবেশের কোনো একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন তারা সৃষ্টি করতে পারে যেটা মানুষ কিংবা মানুষের যন্ত্রপাতি এখনো ধরতে পারে না।

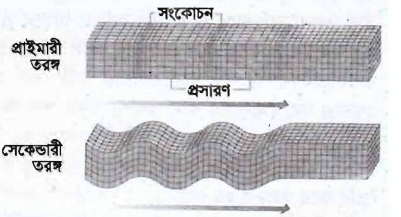

21.3 নং ছবি : ভূমিকম্পনে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি তরঙ্গ।

AMARBOI.COM

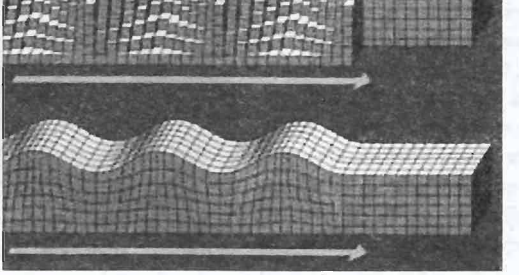

21.4 নং ছবি : ভূমিকম্পনের সময় দুই ধরনের পৃষ্ঠ তরঙ্গ হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকম্পের সময় যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার কারণ হচ্ছে তিনটি ভিন্ন ধরনের তরঙ্গ। এর মাঝে দুটি তরঙ্গ পুরো মাটির ভেতর দিয়ে যায় তৃতীয়টি যায় শুধু মাত্র পৃষ্ঠদেশের ভেতর দিয়ে। যে তরঙ্গ দুটি পুরো মাটির ভেতর দিয়ে যায় তাদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক ভাগ তুলনামূলকভাবে দ্রুত চলে আসে, পাথরে এর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। এই ধরনের তরঙ্গকে বলে প্রাইমারি তরঙ্গ। এই তরঙ্গটি ঠিক শব্দতরঙ্গের মতো এবং মাঝে মাঝে যখন ভূমিকম্পের পর দূরে কোথায় মাটি ভেদ করে এই তরঙ্গ বের হয়ে আসে তখন সেটি শোনাও যায় (মানুষের কান অবশ্যি সকল শব্দ শুনতে পায় না, তরঙ্গের কম্পনটি যদি সেকেন্ডে বিশবারের কম হয় মানুষ সেটি শুনতে পারে না, অনেক প্রাণী শুনতে পারে এবং বিচলিত হয়ে উঠে!) প্রাইমারি তরঙ্গ বা সংক্ষেপে P-Waves কীভাবে পাথরের মাঝে সংকোচন এবং প্রসারণ তৈরি করে অগ্রসর হয় সেটি 21.3 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

প্রাইমারি বা P তরঙ্গের পর যে তরঙ্গটি ছুটে আসে তার নাম সেকন্ডারি তরঙ্গ বা সংক্ষেপে S-Waves। ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় এটি যাবার সময় পাথর বা মাটিকে উপরে নিচে বা ডানে বামে দোলাতে থাকে। কোথাও ভূমিকম্প হবার পর প্রথমে প্রাইমারি ওয়েভ এসে হঠাৎ করে সবকিছু কাঁপিয়ে দেয়, তার কয়েক সেকেন্ড পর সেকন্ডারি ওয়েভ তার পুরো বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে হাজির হয়। তখন মাটি উপরে নিচে বা ডানে বামে কাঁপতে থাকে, সেই ভয়ংকর কম্পনে ঘরবাড়ি দালানকোঠা সবকিছু ধ্বসে পড়তে থাকে। সেকন্ডারি তরঙ্গ বা S-Waves কীভবে অগ্রসর হয় সেটি একই ছবির দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয়েছে।

সেকন্ডারি তরঙ্গের গতিবেগ সেকেন্ডে তিন কিলোমিটার, প্রাইমারি তরঙ্গের প্রায় অর্ধেক। প্রাইমারি তরঙ্গ পানির ভেতর দিয়েও চলে যেতে পারে কিন্তু সেকন্ডারি তরঙ্গ যেতে পারে না। তাই সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের এক পাশে ভূমিকম্প হলে অন্য পাশে সেকন্ডারি তরঙ্গ এসে পৌঁছাতে পারে না।

AMARBOI.COM

21.5 নং ছবি : একটি সিসমোগ্রাফ।

প্রাইমারি এবং সেকন্ডারি তরঙ্গ প্রবাহিত হবার জন্যে পুরো মাটিটুকু ব্যবহার হয়, তৃতীয় তরঙ্গটি প্রবাহিত হয় শুধুমাত্র পৃষ্ঠদেশ দিয়ে। 21.4 নং ছবিতে এই ধরনের তরঙ্গকে দেখানো হয়েছে। পৃষ্ঠদেশ দিয়ে যে তরঙ্গগুলো যায় সেগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক ভাগ যাবার সময় মাটিকে ডানে বামে কাঁপায় (উপরের ছবি) অন্য ভাগ কাঁপায় উপরে এবং নিচে (নিচের ছবি)। মাটির পৃষ্ঠদেশ দিয়ে যে তরঙ্গগুলো যায় সেগুলোর গতিবেগ প্রাইমারি এবং সেকন্ডারি তরঙ্গ থেকেও কম। 21.6 নং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিতে সিসমোগ্রাফের একটা ছবি দেখানো হলো,-ছবিতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে আগে পৌঁচেছে প্রাইমারি তরঙ্গ (P-Waves), তারপর সেকন্ডারি তরঙ্গ S-Waves এবং সবার শেষে পৃষ্ঠদেশ তরঙ্গ।

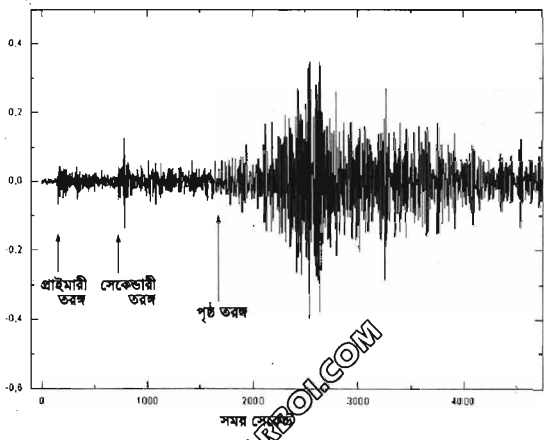

21.6 নং ছবি: সিসমোগ্রাফে ধরা পড়া প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ।

AMARBOI.COM

একটি ভূমিকম্প কত বড় তার পরিমাপ করার জন্যে রিক্টর স্কেল ব্যবহার করা হয়। আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর আগে শুনেছিলাম বিজ্ঞানীরা নাকি রিক্টর স্কেলের পরিবর্তে অন্য ধরনের স্কেল ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। যারা ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা করেন সত্যি সত্যি তারা একটা ভূমিকম্পকে ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রায় দশ রকম ভিন্ন ভিন্ন স্কেল ব্যবহার করে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষ এখনো ভূমিকম্প বললেই সেটাকে পরিমাপ করতে চায় রিক্টর স্কেল দিয়ে। 1935 সালে চার্লস রিক্টর এই স্কেলের সূচনা করেছিলেন, এটি হচ্ছে যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে তার থেকে একশ কিলোমিটার দূরে সর্বোচ্চ ভূকম্পনের দশ ভিত্তিক লগ। ভূকম্পনটি মাপা হয় মাইক্রোমিটারে, কাজেই কোনো ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে একশ কিলোমিটার দূরে বসানো কোনো সিসমোগ্রাফে যদি দেখা যায় কম্পনটি এক সেন্টিমিটার (1 সেন্টিমিটার= 10,000 মাইক্রো মিটার) তাহলে রিক্টর স্কেলে সেটি হবে (log 10,000=4) চার। 1987 সালের 1 অক্টোবর প্যাসাডিনা শহরে আমি যে ভূমিকম্প দেখেছিলাম সেটি ছিল রিক্টর স্কেলে ছয়, যার অর্থ একশ কিলোমিটার দূরে ভূ কম্পনের বিস্তার ছিল প্রায় এক মিটার! রিক্টর স্কেল এক মাত্রা বেশি হওয়া মানে ভূকম্পনের পরিমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশগুণ বেড়ে যাওয়া। ভূমিকম্পে যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে সেটা কিন্তু বাড়ে ত্রিশগুণ। আমি যে ভূমিকম্পটি দেখেছিলাম রিক্টর স্কেলে সেটা ছিল ছয়, সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রোপকূলে যে ভয়াবহ ভূমিকম্পটি হয়েছে সেটি রিক্টর স্কেলে ছিল নয়। যার অর্থ আমার দেখা ভূমিকম্প থেকে সেটি ছিল (30×30×30=) 2700 গুণ বেশি শক্তিশালী!

আমরা মানুষেরা মাঝে মাঝেই নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে একটি বেশি আস্ফালন করে ফেলি, প্রকৃতির শক্তির কাছে আমরা যে কত অসহায় এবং দুর্বল সেটি মাঝে মাঝে ভেবে দেখলে আমাদের অহংকার নিশ্চিতভাবেই একটু কমে আসবে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

22. গ্রহাণুপুঞ্জ

আমাদের সৌরজগতে সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলো হচ্ছে— যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। প্লুটোকে সাম্প্রতিককালে গ্রহ পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। 1772 সালে বার্লিন অবজারভেটরীর জোহান এলার্ট বোড নামে একজন জ্যোতির্বিদ গ্রহগুলোর ভেতরে পরস্পরের দূরত্ব বিশ্লেষণ করে বোডের সূত্র নাম দিয়ে একটা সূত্র দিলেন। তার সেই সূত্র অনুযায়ী মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে আরেকটা গ্রহ থাকার কথা কিন্তু অনেক খুঁজে পেতেও সেখানে কোনো গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেল না। এখন যেমন বিশাল টেলিস্কোপ আছে তখন সেরকম কিছু ছিল না তারপরেও সকল জ্যোতির্বিদ মিলে বোডের সূত্র থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই অদৃশ্য গ্রহটিকে খুঁজে বের করার জন্যে "মহাজাগতিক পুলিশ বাহিনী" নাম দিয়ে একটা সংগঠন দাঁড়া করিয়ে ফেললেন।

অনেক খুঁজেও তারা কেউ কিছু খুঁজে পেলেন না কিন্তু সেই "পুলিশ বাহিনীর" বাইরের একজন জ্যোতির্বিদ গিসেপ পিয়াজি 1801 সেই অদৃশ্য গ্রহটিকে খুঁজে পেলেন তবে সেখানে একটা গুরুতর সমস্যা দেখা গেল, গ্রহটি এত ছোট যে তাকে গ্রহ বলেই ডাকা যায় না, তাকে বলতে হয় গ্রহাণু। তার ব্যাস মাত্র 621 মাইল! 1802 এবং 1804 সালে আরো দুটি গ্রহাণু খুঁজে পাওয়া গেল একটার নাম পালাস অন্যটি ভেস্টা। দুটোর ব্যাস সাড়ে তিনশত মাইলের কাছাকাছি! এই দুটিও আসলে গ্রহাণু। এর পরের গ্রহাণুটা খুঁজে পেতে সময় নিল সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর। এ-রকম সময়ে গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজে বের করতে আলোকচিত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে কাজেই যে গ্রহাণুকে খালি চোখে দেখা যায় না সেগুলো সংবেদনশীল আলোকচিত্রে দীর্ঘ এক্সপোজারের কারণে ধরা পড়তে লাগল। দশ বৎসরের ভেতর 48 টা গ্রহাণু খুঁজে পাওয়া গেল। 1899 সালের ভেতরে তার সংখ্যা দাঁড়াল 491 এবং 1930 সালে জ্যোতির্বিদরা 1000 থেকেও বেশি গ্রহাণু খুঁজে বের করে ফেললেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে গ্রহাণু খুঁজে বের করার একটা পরিকল্পনা নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রহাণু খুঁজে বের করে নিল। অনুমান করা হয় সব মিলিয়ে প্রায় 30000 গ্রহাণু রয়েছে, তবে প্রায় বালু কণার মতো গ্রহাণুও থাকতে পারে যেগুলো হয়তো আসলে কখনোই ঠিক করে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোডের সূত্র অনুযায়ী মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে একটা গ্রহ থাকার কথা ছিল সেই গ্রহটি আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে হাজার হাজার গ্রহাণু! সবগুলোকে একসাথে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। ইংরেজিতে এস্টেরয়েডস (Asteroids)। ইংরেজি নামকরণটিতে বোঝানো হয় নক্ষত্রকণা কিন্তু এগুলো আসলে নক্ষত্রকণা নয় এগুলো হচ্ছে গ্রহাণু বা গ্রহকণা। জ্যোতির্বিদরা অনুমান করেন সত্যি সত্যিই হয়তো মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে একটা গ্রহ ছিল। সুদূর অতীতে কোনো এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে গ্রহটা টুকরো টুকরো হয়ে গ্রহাণু হিসেবে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রহাণুগুলোর আকার খুব ছোট। মাত্র ছয়টি গ্রহাণুর ব্যাস 100 মাইল থেকে বেশি।

জ্যোতির্বিদরা যখন একের পর এক গ্রহাণু খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন তখন তাদের একটা করে নাম দেয় জরুরি হয়ে পড়েছিল। আট-নয়টি গ্রহের আলাদা করে নাম দেয়া সম্ভব এবং সেগুলো মনে রাখাও সম্ভব কিন্তু যখন গ্রহাণুর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন সেগুলোর তালিকা করার একটা নিয়ম তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়ল। জ্যোতির্বিদরা যে নিয়মটি করলেন সেটি খুব সহজ, কোনো গ্রহাণুটি কখন খুঁজে বের করা হয়েছে তার ক্রমানুসারে একটা সংখ্যা দিয়ে গ্রহাণুটাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। জ্যোতির্বিদরা অবশ্যি শুধু সংখ্যা দিয়ে নামকরণে সন্তুষ্ট থাকলেন না সবগুলোকেই আলাদাভাবে একটা নামও দিয়ে দিলেন। প্রথম দশটি গ্রহাণুর নাম তাদের আকার এবং অন্যান্য কিছু তথ্য তালিকা-1 এ দেয়া হলো।

প্রথম প্রথম গ্রহাণুর নামগুলো ছিল বেশ ভারিক্কী। যতদিন যেতে শুরু করেছে জ্যোতির্বিদরা ততোই লঘু মেজাজে নাম দিতে শুরু করেছেন। যেমন 2309 নম্বর গ্রহাণুটির নাম দেয়া হয়েছে মি. স্পক। মি. স্পক হচ্ছে জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজ স্টার ট্রেকের একটা চরিত্র! অনেক সময় গ্রহাণুর নামগুলো কোনো একটা স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। 1986 সালের মার্চ মাসে একটা দুর্ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান চ্যালেঞ্জার বিধ্বস্ত হয়ে সাতজন মহাকাশচারী মারা গিয়েছিলেন। 3350 থেকে 3356 এই সাতটি গ্রহাণুকে এই সাতজন মহাকাশচারীর নামে নামকরণ করা হয়েছিল। এখন মোটামুটিভাবে যে জ্যোতির্বিদ একটা গ্রহাণুকে খুঁজে বের করেন তিনিই তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই গ্রহাণুর নাম দিয়ে ফেলতে পারেন।

1 নং তালিকার গ্রহাণুগুলোর দিকে তাকালে যে বিষয়টিকে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে সেটি হচ্ছে সূর্য থেকে এই গ্রহাণুগুলোর দূরত্ব। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে 1 ধরে (আসলে এটি 94 মিলিওন মাইল) তার তুলনার দূরত্বগুলো বসানো হয়েছে। মঙ্গলের কক্ষপথের দূরত্ব পৃথিবীর তুলনায় 1.5 এবং বৃহস্পতির কক্ষপথ 5.2 কাজেই গ্রহাণুগুলোর এর ভেতরেই থাকার কথা এবং মোটামুটি সেভাবেই আছে তবে প্রত্যেকটা গ্রহাণুর জন্যে দুটি দূরত্ব দেওয়া আছে একটি কম অন্যটি বেশি। তার কারণ গ্রহাণুগুলোর কক্ষপথ বৃত্তাকার নয় এগুলো উপবৃত্তাকার। কখনো-কখনো এটা সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে এবং কখনো-কখনো দূরে চলে যায়। এ-রকম কয়েকটি গ্রহাণুর কক্ষপথ 22.1 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় গ্রহাণু সিরাসের কক্ষপথটি মোটামুটি বৃত্তাকার। হিলডালগো গ্রহাণুটির কক্ষপথ বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের কক্ষপথ ভেদ করে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি চলে এসেছে। এপোলো এবং ইকারাস গ্রহাণুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কক্ষপথ আসলে পৃথিবীর কক্ষপথ ভেদ করে চলে এসেছে। সম্ভবত ইকারাসের নামকরণটি যথার্থ দেয়া হয়েছে। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ইকারাস মোম দিয়ে পাখা তৈরি করে ওড়ার চেষ্টা করেছিল। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী উড়তে উড়তে সে সূর্যের এত কাছাকাছি চলে এসেছিল যে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মোম গলে তার পাখাগুলো খুলে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে যায় বলেই হয়তো এই গ্রহাণুটার নাম দেয়া হয়েছে ইকারাস।

তালিকা নং : 1

সংখ্যা	নাম	আবিষ্কারের বছর	সূর্য থেকে দূরত্ব (পৃথিবীর তুলনায়)	ব্যাস (মাইল)
1	সিরাস	1801	2.55-2.94	622
2	পালাস	1802	2.11-3.42	377
3	জুনো	1804	1.98-3.35	155
4	ভেস্টা	1807	2.15-2.57	333
5	এস্ট্রিয়া	1845	2.10-3.06	63
6	হেব	1847	1.93-2.92	121
7	আইরিস	1847	1.84-2.94	130
8	ফ্লোরা	1847	1.86-2.93	94
9	মিটাস	1848	2.09-2.68	94
10	হাইজিয়া	1849	2.84-3.46	279

AMARBOI.COM

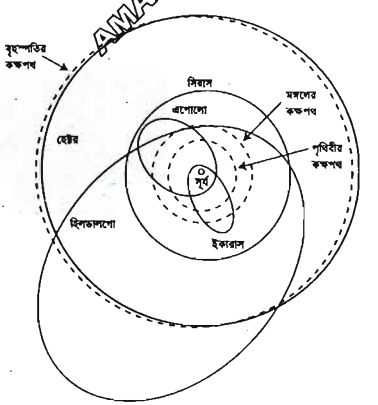

22.1 নং ছবি : পৃথিবী, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝে কয়েকটি গ্রহাণুর কক্ষপথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

22.2 নং ছবি : একটি গ্রহাণুর ছবি, একটি এবরোথেবরো পাথরের টুকরার মতো।

একটা গ্রহ যখন অনেক বড় হয় মাধ্যাকর্ষণের কারণে তখন সেটা গোলাকার রূপ নেয়। গ্রহাণুগুলোর আকার এত ছোট যে সেগুলোর আকার সব সময়ে গোলাকার নয়, তাদের বিচিত্র সব আকার রয়েছে। আকারে ছোট বলে ভর কম, তাই কোনো বায়ুমণ্ডলও নেই। কাজেই গ্রহাণুগুলোতে গ্রহের মতো জটিল কিছু নেই, এগুলো সহজ-সরল নিঃসঙ্গ ছোট-বড় পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়।

কে জানে, কোনোদিন হয়তো বিজ্ঞানীরা এই সাদামাটা পাথরের টুকরো থেকে সুদূর অতীতের কোনো প্রলয়ংকরী দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণের ইতিহাস খুঁজে বের করবেন।

22.1 নং ছবিতে হেক্টর নামে যে গ্রহাণুটির কক্ষপথটি দেখানো হয়েছে সেটি প্রায় বৃহস্পতির কক্ষপথের মতোই। বৃহস্পতি আসলে বিশাল একটি গ্রহ তার আকর্ষণের কারণে অনেক গ্রহাণুই কাছাকাছি চলে এসেছে। বিশাল বৃহস্পতির সামনে এবং পিছনে থেকে পাইক বরকন্দাজের মতো এই গ্রহাণুগুলো বৃহস্পতিকে অনুসরণ করে। বৃহস্পতির কক্ষপথের এই গ্রহাণুগুলোর নাম হচ্ছে ট্রজান, যেগুলো সামনে থাকে সেগুলো হচ্ছে অগ্রগামী ট্রজান এবং যেগুলো পিছনে যাকে সেগুলো হচ্ছে পশ্চাদ্‌গামী ট্রজান।

22.3 নং ছবি : গ্রহাণুর আকার ছোট বলে তার গঠন হয় বিচিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

23. মহাজাগতিক ক্যালেন্ডার

খুব বড় একটি সংখ্যা অনুভব করা সহজ নয়। পৃথিবীতে এমনকি আমাদের দেশেও আজকাল টাকার ছড়াছড়ি, আমাদের আশপাশেই আমরা কোটিপতি দেখতে পাই। কিন্তু কোটি সংখ্যাটি কত বড় সেটা কি অনুভব করা খুব সহজ? একটা উপায় হচ্ছে সেটাকে কোনোভাবে আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্ক আছে এ-রকম কোনো কিছুর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। আমরা সবাই মনে করি টাকা খরচ করতে পারাটা খুব আনন্দের ব্যাপার, কাজেই যদি মনে করি প্রতিদিন হাজার টাকা খরচ করতে পারব তাহলে এক কোটি টাকা খরচ করে শেষ করতে কতদিন লাগবে? এরকম হিসেব করলেই আমরা দেখব সময়টা অনেক দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাতাইশ বছর! আমি নিশ্চিত এক কোটি সংখ্যাটি কত বড় এবারে সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। প্রতিদিন এক হাজার টাকা করে খরচ করলেও এক কোটি টাকা শেষ করতে যদি টানা সাড়ে সাতাইশ বছর লাগে তাহলে সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে অনেক বড়।

বলা হয়ে থাকে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল 15 বিলিওন বছর আগে। এর আগে কী ছিল বিজ্ঞানীরা সেই প্রশ্নটি শুনতে রাজি নন। বিশাল এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে (যেটাকে বলে বিগ ব্যাং) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হবার আগে কিছুই ছিল না, সময়েরও শুরু হয়েছে এই বিগ ব্যাংক থেকে এটা হচ্ছে প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু এই 15 বিলিওন বছরটি কত বড় সেটা কি আমরা অনুভব করতে পারি? আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো (এস.এস.সি পরীক্ষা, সন্তানের বড় হওয়া) সাধারণত বছরের হিসেবে আসে, জীবন কয়েকটি দশকে শেষ হয়, কাজেই এর চাইতে দীর্ঘ কোনো সময় আমরা হয়তো কাগজে চট করে লিখে ফেলতে পারব কিন্তু সেই সময়টা কি সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারব? কাজটি সহজ নয়। তাই এই বিশাল মাপের সময়কে অনুভব করার জন্যে বিজ্ঞানীরা পুরো সময়টিকে এক বছরের একটা ক্যালেন্ডারের মাঝে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আমরা একটা মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারের কথা বলছি যেটাতে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিগ ব্যাং হয়েছিল এবং বর্তমান সময়টি হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ রাত বারোটা, নূতন বছর মাত্র শুরু হতে যাচ্ছে।

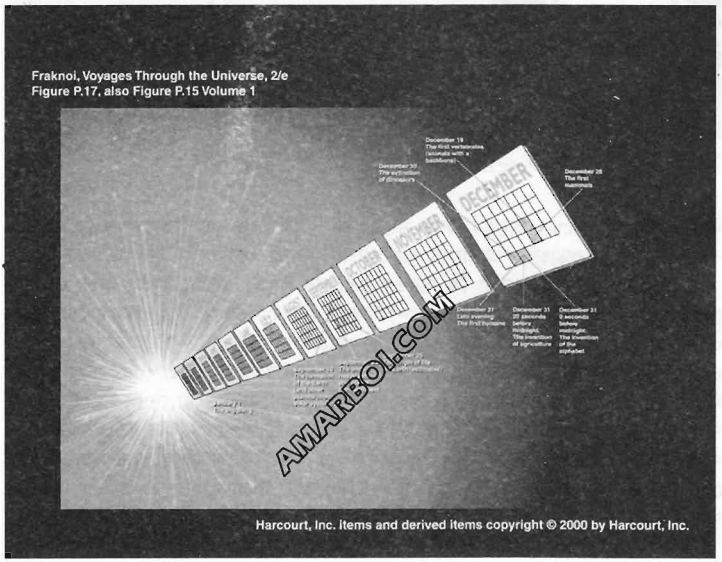

23.1 নং ছবি: বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় জানুয়ারির 1 তারিখে।

15 বিলিওন বছর সময়টিতে এক বছরের একটি ক্যালেন্ডারে প্রকাশ করা হলে কিছু চমকপ্রদ ব্যাপার দেখা যায়, যেমন মানুষের জন্ম হয়েছে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ রাত সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মাত্র দেড়ঘন্টা আগে!

মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে যাবার আগে আমরা সংখ্যার হিসেবটি একবার ঝালাই করে নিই। আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় সংখ্যাকে হাজার, লক্ষ কোটি হিসেবে প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় সংখ্যাকে এক হাজার গুণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। লক্ষ সংখ্যাটি বিজ্ঞানের জনপ্রিয় নয়, এক হাজারের হাজার গুণ, অর্থাৎ, দশ লক্ষ বেশ জনপ্রিয়, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যাটির নাম মিলিওন। উনিশ শ একাত্তরে এই দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যায় তিন মিলিওন লোক মারা গিয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা একশ পঞ্চাশ মিলিওনের কাছাকাছি। পরবর্তী বড় সংখ্যা হচ্ছে বিলিওন, সেটি হচ্ছে এক হাজার মিলিওন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স পনেরো বিলিওন, পৃথিবীর জনসংখ্যা পাঁচ বিলিওন। এক হাজার বিলিওনকে বলা হয় ট্রিলিওন, বাংলাদেশের মজুত গ্যাসের পরিমাণ ধরা হয় বারো থেকে ষোল ট্রিলিওন কিউবিক ফুট।

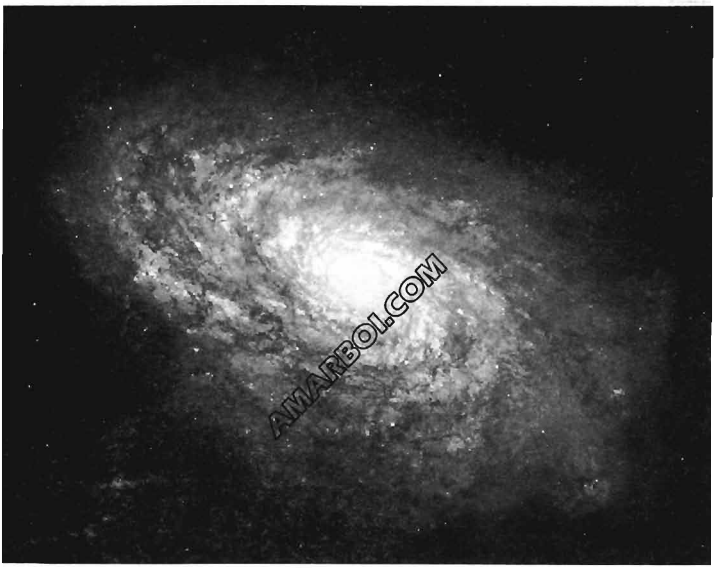
AMARBOI.COM

23.2 নং ছবি : গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম হতে শুরু হয়েছে মে মাসের 1 তারিখ থেকে।

মিলিওন, বিলিওন এবং ট্রিলিওন সংখ্যাগুলো ব্যাখ্যা করার পর আমরা আমাদের মূল বিষয়টিতে যাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পর পনেরো বিলিওন বৎসরকে যদি এক বছরের একটি মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারের মাঝে আটিয়ে দেয়া যায় তাহলে মহাজাগতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছে এভাবে:

(ক) বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি : জানুয়ারি 1

(খ) আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি, ছায়াপথ নামে সেই গ্যালাক্সির জন্ম : মে 1

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে জানুয়ারির এক তারিখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবার পরও গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম নিতে পাঁচ মাস সময় লেগেছে।

(গ) সৌরজগতের জন্ম : সেপ্টেম্বরের 9 তারিখ। গ্যালাক্সি জন্ম নেবার পরও চার মাস থেকে বেশি সময় লেগেছে সৌর জগতের জন্ম হতে।

(ঘ) পৃথিবীর জন্ম : সেপ্টেম্বরের 14 তারিখ। সৌরজগৎ জন্ম নেবার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় পৃথিবীর জন্ম হয়েছে।

(ঙ) পৃথিবীতে প্রথম আদিম প্রাণের বিকাশ : সেপ্টেম্বরের 25 তারিখ। পৃথিবী জন্ম নেবার পর দুই সপ্তাহ থেকেও কম সময়ে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে।

(চ) প্রাচীনতম পাথরের জন্ম : 2 অক্টোবর।

(ছ) ব্যাক্টেরিয়া এবং নীল সবুজ এলজির প্রাচীনতম ফসিল : অক্টোবরের 9 তারিখ।

(জ) জন্ম প্রক্রিয়ার জন্যে ভিন্ন লিঙের উদ্ভব (জীবাণুদের ভেতর) : 1 নভেম্বর।

(ঝ) সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে এ-রকম গাছের জন্ম: নভেম্বরের 12 তারিখ।

(ঞ) উন্নত প্রাণীর জন্যে নিউক্লিয়াসসহ কোষের (ইউক্যারিওটস) আবির্ভাব : নভেম্বরের 15 তারিখ।

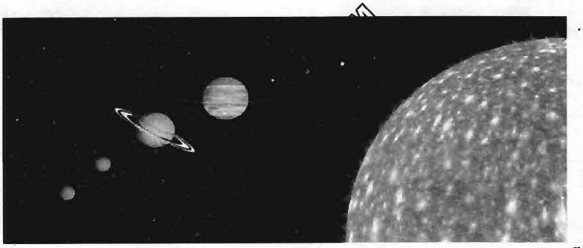

23.3 নং ছবি : সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে সেপ্টেম্বরের 9 তারিখ।

দেখাই যাচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছে জানুয়ারির এক তারিখে কিন্তু নভেম্বরের 15 তারিখ পর্যন্ত, বছরের প্রায় বড় সময়টাই চলে গেছে এতদিনে মাত্র উন্নত প্রাণী জন্ম নেয়ার উপযোগী কোষ তৈরি হতে শুরু করেছে! পুরো সময়টা আরো সঠিকভাবে অনুভব করার জন্যে মনে রাখতে হবে মহাজাগতিক এই ক্যালেন্ডারে এক সেকেন্ড প্রায় পাঁচশ বৎসর (নিখুঁতভাবে বলতে গেলে 475 বৎসর) একদিন হচ্ছে চল্লিশ মিলিওন বৎসর (কিংবা চার কোটি বৎসর)!

মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে নভেম্বর মাস শেষ হয়ে ডিসেম্বর মাস আসার পর পৃথিবীর ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছে বলা যায়। তাই ডিসেম্বর মাসের ক্যালেন্ডারটা আলাদাভাবে লেখা যেতে পারে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসেম্বর 1	পৃথিবীতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের শুরু।
ডিসেম্বর 16	কেঁচো জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর 17	মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর বিকাশ।
ডিসেম্বর 18	সামুদ্রিক প্লাংকটন, শামুক জাতীয় ট্রাইলোবাইটের জন্ম।
ডিসেম্বর 19	প্রথম মাছ এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব
ডিসেম্বর 20	পৃথিবীর স্থলভাগ গাছ দিয়ে ঢেকে যেতে শুরু করা।
ডিসেম্বর 21	পোকামাকড়ের জন্ম। স্থলভাগে প্রাণীদের বিচরণ।
ডিসেম্বর 22	প্রথম উভচর প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর 23	প্রথম বৃক্ষ এবং সরীসৃপের জন্ম।
ডিসেম্বর 24	ডাইনোসরের জন্ম।
ডিসেম্বর 26	স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম।
ডিসেম্বর 27	প্রথম পাখির জন্ম।
ডিসেম্বর 28	ডাইনোসরের জন্মের চারদিনের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার শুরু।
ডিসেম্বর 29	বানর জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর 30	বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম।
ডিসেম্বর 31	পৃথিবীতে প্রথম মানুষের জন্ম।

AMARBOI.COM

23.4 নং ছবি : পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সেপ্টেম্বরের 14 তারিখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাই যাচ্ছে ডিসেম্বর মাসটি ছিল খুব ঘটনাবহুল। সৃষ্টি জগতের পুরোটুকু এক বছরের মাঝে সাজিয়ে দিতে হলে দেখা যায় শেষ দুই সপ্তাহটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছে। এবং তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে মানুষের জন্ম হয়েছে একেবারে শেষ দিনে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে একদিন হচ্ছে চল্লিশ মিলিওন বা চার কোটি বছর। কাজেই শেষ দিনটিকেও একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনটি সারা দিন পার হয়ে সূর্য ডুবে যাবার পর যখন রাত সাড়ে দশটা বাজে তখন প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল। কাজেই মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে মানুষের বয়স মাত্র দেড় ঘণ্টা! মানবের জন্মের পর তাদের ইতিহাসটুকু তাহলে দেখা যাক:

23.5 নং ছবি: পোকামাকড়ের জন্ম হয় ডিসেম্বরের 21 তারিখ।

রাত 10: 30	মানুষের জন্ম
রাত 11: 00	মানুষের পাথরের অস্ত্র ব্যবহার
রাত 11: 46	আগুন আবিষ্কার
রাত 11: 59	ইউরোপের গুহায় মানুষের ছবি আঁকা

AMARBOI.COM

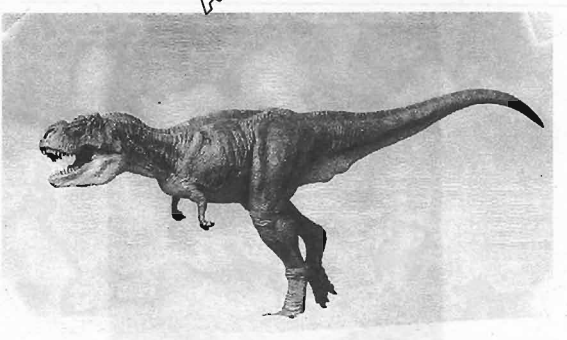

23.6 নং ছবি: ডাইনোসরের জন্ম হয় ডিসেম্বরের 24 তারিখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

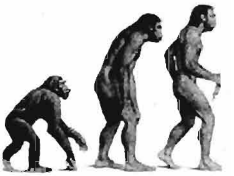

23.7 নং ছবি : পৃথিবীতে প্রথম মানুষের জন্ম হয় ডিসেম্বরের 31 তারিখ।

দেখাই যাচ্ছে আমরা বছর শেষ হবার একেবারে শেষ মিনিটে পৌঁছে গেছি এখন সেকেন্ড হিসেব করে দেখা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এখানে প্রতি সেকেন্ড হচ্ছে পাঁচশত বছর।

20 সেকেন্ড	চাষ আবাদ শুরু
35 সেকেন্ড	প্রথম শহরের পত্তন
50 সেকেন্ড	মানুষের জ্যোতিবিদ্যার জ্ঞান অর্জন, মিশরের সভ্যতা
52 সেকেন্ড	ব্যাবিলনের সভ্যতা
53 সেকেন্ড	কম্পাস আবিষ্কার, ট্রয়ের যুদ্ধ
54 সেকেন্ড	লোহার ব্যবহার শুরু
55 সেকেন্ড	গৌতম বুদ্ধের জন্ম।
56 সেকেন্ড	ইউক্লিডের জ্যামিতি। যিশুখ্রিস্টের জন্ম।
57 সেকেন্ড	হজরত মুহম্মদ (স:) এর জন্ম। শূন্য আবিষ্কার।
58 সেকেন্ড	মায়া সভ্যতা, ক্রুশেডের যুদ্ধ।
59 সেকেন্ড	ইউরোপে রেনেসাঁ। নূতন বিজ্ঞানের জন্ম।
60 সেকেন্ড বা বর্ষ-শেষ মুহূর্ত	বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশ। মানুষ কর্তৃক নিজেকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন। মহাকাশ অভিযান, সারা পৃথিবীর সকল মানুষ নিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির জন্ম।

AMARBOI.COM

মহাজাগতিক বছরের শেষে এখন আমাদের দেখার সময় নূতন বছরে আমাদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

24. হারিয়ে যাওয়া ভর

আমরা সবাই কখনো না কখনো একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার কোমল শিখাটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আমরা না চাইলেও লক্ষ করেছি যে মোমবাতিটি আলো দিতে দিতে ছোট হয়ে আসছে। যখন মোমটুকু শেষ হয়ে গেছে শেষবারের মতো বার কয়েক দপদপ করে জ্বলে সেটি নিভে গেছে।

মানুষ একসময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে এ-রকম একটা দুর্ভাবনা করতো। সূর্য যেহেতু "জ্বলছে" নিশ্চয়ই সেখানে মোমের মতো কোনো এক ধরনের জ্বালানী "পুড়ছে"। একসময় জ্বালানী যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কি সূর্যটাও শেষবারের মতো দপদপ করে জ্বলে চিরদিনের মতো নিভে যাবে? সারা পৃথিবী তখন কালো অন্ধকার ডুবে যাবে?

বিজ্ঞানীরা আমাদের নিশ্চিত করেছেন, তারা বলেছেন— এধরনের কোনো দুর্ভাবনা নেই। সূর্য প্রায় পাঁচ বিলিওন বছর (পাঁচশ কোটি) থেকে আলো, তাপ আর শক্তি দিয়ে আসছে। আরো পাঁচ বিলিওন বছর এটি টিকে থাকবে। তার কারণটা সহজ— সূর্য তার আলো আর তাপ মোমের মতো জ্বালানী থেকে পায় না। সূর্য তার শক্তিটুকু পায় ফিউসান নামের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া থেকে। এই শক্তি প্রায় অফুরন্ত!

সূর্য এক ধরনের নক্ষত্র, নক্ষত্রের জীবন অনেকটা বেহিসেবী মানুষের মতো। যেই নক্ষত্রের আকার যত ছোট সেটা তত বেশিদিন টিকে থাকে। যে নক্ষত্রের আকার বড় সেটা তত বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। সূর্যের নিউক্লিয়ার জ্বালানী যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তার মৃত্যুটি হবে মোটামোটি সাদামাটা, নিষ্প্রভ একটা হোয়াইট ডোয়ার্ফ হয়ে সেটি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। তবে নক্ষত্রের আকার যদি সূর্য থেকে কমপক্ষে দেড়গুণ বড় হয় তাহলে নক্ষত্রের মৃত্যুটি হয় চমকপ্রদ। নিউক্লিয়ার জ্বালানী শেষ হবার পর তার ভেতরটা প্রবল মহাকর্ষ বলের কারণে সংকুচিত হয়ে যায়, এই ভয়াবহ সংকোচনের কারণে যে প্রচণ্ড শক্তির জন্ম হয় সেই শক্তি পুরো নক্ষত্রের বাইরের অংশটুকু ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। এই ধরনের নক্ষত্রকে বলে সুপার নোভা এবং একটা সুপার নোভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্য থেকে কোটি কোটি গুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে! সুপার নোভার ঔজ্জ্বল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী, মাত্র কয়েক সপ্তাহ— তারপর সেটি তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

24.1 নং ছবি: মানুষ নিশ্চয়ই সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তা করতো যদি এটা একদিন জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যায় তখন কী হবে? সেটি নিয়ে এই মুহূর্তে দুর্ভাবনার কিছু নেই কারণ এটি পাঁচ বিলিওন বছর ধরে জ্বলছে আরও পাঁচ বিলিওন বছর ধরে জ্বলবে।

AMARBOI.COM

পৃথিবীর মানুষ মাঝে মাঝেই সুপার নোভা দেখেছে। সর্বশেষ সুপার নোভার বিস্ফোরণ ঘটেছে 1987-এর 24 ফেব্রুয়ারিতে (আমি তখন উইসকনসিনে একটি পদার্থবিজ্ঞানের কনফারেন্সে, মনে আছে সেই বিস্ফোরণের খবর পেয়ে সব বিজ্ঞানীদের সে কী উত্তেজনা!)। এটি শুধু যে একটা চমকপ্রদ বিস্ফোরণ তাই নয়— আমাদের অস্তিত্বের পেছনেও রয়েছে এই সুপার নোভা! আমাদের শরীরের, গাছপালা বা প্রাণিজগতের এমনকি সারা পৃথিবীর সকল কিছু যে পরমাণু দিয়ে তৈরি তার কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসগুলো এসেছে সুপারনোভার বিস্ফোরণ থেকে।

প্রকৃতিতে 92 (বিরানব্বই) টি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু রয়েছে। সবচেয়ে সহজ পরমাণুটি হচ্ছে হাইড্রোজেন, তার কেন্দ্রে একটা মাত্র প্রোটন এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে একটা মাত্র ইলেকট্রন। এর পরের পরমাণুটি হচ্ছে হিলিয়াম, তার কেন্দ্রে দুটি প্রোটন এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে দুটি ইলেকট্রন। তবে শুধু দুটি প্রোটন একসাথে থাকতে পারে না, তাদের চার্জের কারণে প্রবল শক্তিতে এরা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। এগুলোকে আটকে রাখতে হলে নিউট্রন নামে এক ধরনের কণা দরকার, যার ভর প্রোটনের কাছাকাছি কিন্তু কোন চার্জ নেই। নিউট্রনগুলো অনেকটা আঠার মতো কাজ করে প্রোটন দুটিকে আটকে রাখে। নক্ষত্রের ভেতরে প্রোটন এবং নিউট্রন প্রবল শক্তিতে একটা আরেকটাকে ধাক্কা দিয়ে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে প্রথমে হিলিয়াম এবং তারপর পরবর্তী নিউক্লিয়াসগুলো তৈরি করতে শুরু করে।

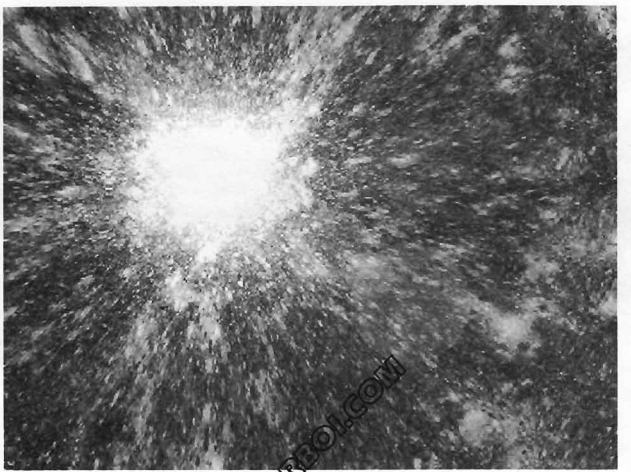

24.2 নং ছবি: নক্ষত্র একটি বিশেষ আকার থেকে বড় হলে তার মৃত্যু হয় চমকপ্রদ একটি বিস্ফোরণে, তাকে বলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ।

একটা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুইটা প্রোটন এবং দুইটা নিউট্রন। আলাদা আলাদাভাবে দুইটা প্রোটন এবং দুইটা নিউট্রনের যত ভর, হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর তার থেকে অল্প একটু কম, সঠিকভাবে বলতে হলে বলা যায় 0.007 ভাগ (বা 0.7%) কম। যখন দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন মিলে একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে তখন যে ভরটুকু কমে যায় সেটাই আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিউক্লিয়ার শক্তি রাসায়নিক শক্তি থেকে শতকোটি গুণ বেশি, তাই সূর্য অচিরেই মোমবাতির মতো জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। সূর্যের শক্তির বড় অংশ আসে হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া থেকে। এর মাঝে খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করে নিউক্লিয়াসের হারিয়ে যাওয়া 0.007 ভাগ ভর।

একটা খুব সহজ প্রশ্ন করা যায়, সূর্যে (কিংবা অন্যান্য নক্ষত্রে) যখন হাইড্রোজেন (নিউট্রনের সাহায্যে) হিলিয়ামের পরিণত হয় তখন তার 0.007 ভাগ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সংখ্যাটি যদি 0.007 না হয়ে 0.006 বা 0.008 হতো তাহলে কী হতো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নটি খুবই সহজ কিন্তু এর উত্তরটি ভয়াবহ। সংখ্যাটির এই ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতি হলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিজগৎ, গাছপালা, প্রাণী কিছুই থাকত না!

ধরা যাক সংখ্যাটি 0.006 বা তার থেকে কম। যার অর্থ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াতে শক্তি খানিকটা কম তৈরি হচ্ছে, সূর্যের উত্তাপ খানিকটা কম, এবং সূর্যের আয়ুও খানিকটা কম। কিন্তু এ কারণে আসলে এর থেকেও অনেক গুরুতর ব্যাপার ঘটতে পারে।

সূর্য বা অন্য নক্ষত্রে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সরাসরি তৈরি হয় না, এটা ধাপে ধাপে তৈরি হয়। প্রথম ধাপে একটি প্রোটন (হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস) এবং একটা নিউট্রন একত্র হয়ে ডিউটোরিয়াম তৈরি হয়। এই ডিউটেরিয়াম বিক্রিয়া করে হিলিয়াম তৈরি করে। যদি হিলিয়ামের হারিয়ে যাওয়া ভরের অংশ 0.006 বা তার কম হতো তাহলে নক্ষত্রের বা সূর্যের ভেতর ডিউটেরিয়ামগুলো টিকে থাকতে পারত না। আর ডিউটেরিয়াম যদি টিকে থাকতে না পারে তাহলে সেটা পরবর্তী ধাপে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস কেমন করে তৈরি করবে? যার অর্থ হাইড্রোজেন কখনোই হিলিয়ামে পরিণত হতে পারবে না। নক্ষত্রগুলো হবে আলোহীন এবং নিষ্প্রভ। সূর্য থেকে দেড়গুণ বড় নক্ষত্র যেভাবে প্রচণ্ড সুপারনোভা বিস্ফোরণ করে নানা ধরনের নিউক্লিয়াস ছড়িয়ে দেয় সেই প্রক্রিয়াটি বন্ধ থাকত। যার অর্থ এই বিশ্বজগতে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই থাকত না। কোথাও কোনো জটিলতা নেই, কোনো জটিল অনু পরমাণু নেই, গ্রহ নেই, গাছপালা নেই, প্রাণ নেই— সমস্ত বিশ্বজগতে মাত্র একটি পরমাণু, বৈচিত্র্যহীন হাইড্রোজেন।

24.3 নং ছবি : সূর্যের ভেতর যে প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরী হয় সেই একই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বোমা বা ফিউসান বোমার শক্তি তৈরী করা হয়।

হিলিয়ামের হারিয়ে যাওয়া ভর 0.006 থেকে কম হওয়ার কারণে পুরো বিশ্বজগৎ যদি বৈচিত্রহীন হয়ে পড়ে তাহলে অনেকের ধারণা হতে পারে সম্ভবত সেটি যদি 0.009 কিংবা তার থেকেও বেশি হতো তাহলে সম্ভবত সমস্ত বিশ্বজগৎ আরো অনেক চমকপ্রদ হতো, আরো বিচিত্র সব অনু আরো বিচিত্র যৌগিক পদার্থ, আরো বিচিত্র রসায়ন, বৃক্ষলতা প্রাণীর জন্ম হতো। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেও সে-রকম নয়। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির প্রথম ধাপ হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামের সৃষ্টি। আগেই বলা হয়েছে সেটা তৈরি করার জন্যে প্রথমে ডিউটোরিয়ামের জন্ম হতে হয়। যদি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের হারিয়ে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর 0.007 থেকে বেশি হয়ে 0.008 বা তার থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে আর ডিউটেরিয়াম তৈরি হতে হয় না, দুটি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস (অর্থাৎ, দুটো প্রোটন) নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে একত্র হয়ে যেতে পারতো। এই সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নিউক্লিয়াস তৈরি হতো বিশ্বজগৎ সৃষ্টির একেবারে গোড়ার দিকে, আর এভাবে সমস্ত হাইড্রোজেন খরচ হয়ে যেত। নক্ষত্রের জ্বালানী হবার জন্যে কোনো হাইড্রোজেন আর বাকি থাকত না। আর হাইড্রোজেনই না থাকে তাহলে পানি আসতো কোথা থেকে?

কাজেই বিজ্ঞানীরা দেখেছেন হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের হারিয়ে যাওয়া ভর যদি 0.006 থেকে 0.008 এর ভেতরে না হতো তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরিই হতো না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার শুধু এই সংখ্যাটি নয় প্রকৃতিতে আরো অনেক সংখ্যা আছে যেগুলো অল্প একটু পরিবর্তন হলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি হয় এভাবে তৈরি হতো না, আর যদিও বা তৈরি হতো সেটি হতো এমন বিদঘুটে জগৎ যে সেই জগতে বুদ্ধিমান প্রাণী দূরে থাকুক প্রাণের বিকাশই ঘটা সম্ভব হতো না! দেখে-শুনে মনে হয় প্রকৃতি বুঝে খুব সতর্কভাবে এই সংখ্যাগুলো বেছে নিয়েছে যেন বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ : Just six numbers Martin Rees

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

25. নক্ষত্রের সন্তান

মানুষের শরীরের বেশিরভাগই পানি, যদি পানিটুকু আলাদা করা যেত তাহলে দেখা যেত পায়ের তলা থেকে বুক পর্যন্ত পুরোটুকুই পানি। পানিকে আমরা পানি হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত, যদিও আসলে সেটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুর সংখ্যা দিয়ে হিসেব করলে মানুষের শরীরে সবচেয়ে বেশি রয়েছে হাইড্রোজেনের পরমাণু কিন্তু হাইড্রোজেন যেহেতু সবচেয়ে হালকা পরমাণু তাই সংখ্যায় বেশি থেকেও তার ওজন বেশি নয়, মানুষের শরীরে ওজন হিসেবে হাইড্রোজেনের হচ্ছে শতকরা দশভাগ। সেই হিসেবে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অক্সিজেন শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ। এরপর হচ্ছে কার্বন শতকরা আঠারো ভাগ। এই বড় তিনটি পরমাণুর পরই হচ্ছে নাইট্রোজেন, শতকরা তিন ভাগ। বাকি চার ভাগ তৈরি হয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্লোরিন, ফ্লোরিন এই ধরনের আরো নানা পরমাণু দিয়ে। পরিমাণে তুলনামূলকভাবে কম হলেও এদের গুরুত্ব কিন্তু মোটেও কম নয়। যেমন লোহার পরিমাণ শতকরা অর্ধ শতাংশেরও কম হলেও আমাদের রক্তে অক্সিজেন নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করে লোহা। কাজেই হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ছাড়া অন্যান্য পরমাণুগুলো ছাড়া মানবদেহ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এবারে একটা সহজ প্রশ্ন করা যাক, আমাদের শরীরে এগুলো এসেছে কোথা থেকে? একটা ছোট শিশু মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে, সেগুলো পেয়েছে মায়ের শরীর থেকে। মা তার সারা জীবনে বড় হওয়ার সময়ে নানা রকম খাবার থেকে পেয়েছেন। কিন্তু আমরা আসলে প্রশ্নটা আরো গভীরভাবে করতে চাই। আমাদের শরীরের এই যে বিভিন্ন পরমাণুগুলো এসেছে সেগুলো তৈরি হয়েছে কোথায়?

প্রশ্নটা ঠিকভাবে অনুভব করার জন্যে আমাদের হঠাৎ করে একটু পরমাণুবিজ্ঞান জানা দরকার। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন যার কেন্দ্রে একটা প্রোটন এবং সেই প্রোটনকে ঘিরে ঘুরছে একটা ইলেকট্রন। প্রোটনের চার্জ পজিটিভ, ইলেকট্রনের নিগেটিভ তাই দুইয়ে মিলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু চার্জবিহীন। হাইড্রোজেনের পরের পরমাণু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিলিয়াম, হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রন কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি তার কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন থাকবে। নিউক্লিয়াস হয় খুবই ছোট, যদি একটা মানুষকে চাপ দিয়ে তার পরমাণুগুলো ভেঙে নিউক্লিয়াসের ভেতর ঠেসে রাখা যেত তাহলে মানুষটিকে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যেত না! এত ছোট জায়গায় পাশাপাশি দুটি প্রোটন থাকতে পারে না, একই চার্জ হওয়ার কারণে একটি আরেকটিকে ঠেলে বের করে দিতে চায়। ব্যাপারটি নিরুপদ্রব করার জন্যে সেখানে প্রোটনের সমান ভর কিন্তু চার্জহীন নিউট্রন থাকে। একটা পরমাণুকে তার ইলেকট্রন (এবং প্রোটনের) সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু নিউট্রন কতগুলো হবে সেটা এ-রকম জোর দিয়ে বলা যায় না। নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান কিংবা বেশি হতে পারে। এবং এ ধরনের নিউক্লিয়াসকে আইসোটপ বলে। নিউক্লিয়াস যত বড় হয় নিউট্রনের সংখ্যা তত বেশি হয়। মানুষের শরীরে যে সব পরমাণু পাওয়া যায় তার ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা ১ নং তালিকায় দেয়া হলো। বিভিন্ন আইসোটপের গড় করে পারমাণবিক ভর বের করা হয়েছে। তালিকাটি একনজর দেখে আমরা আমাদের আগের প্রশ্নে ফিরে যাই, মানুষের শরীরে পাওয়া যায় বলে যে পরমাণুগুলোর নাম লিখেছি সেগুলো কোথা থেকে এসেছে? যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে সেখানেই এই পরমাণুগুলো ছিল কিন্তু পৃথিবীতে এগুলো কোথা থেকে এসেছে? প্রশ্নটি সহজ কিন্তু উত্তরটি সহজ নয়!

১নং তালিকা

পরমাণুর নাম	ইলেকট্রন বা প্রোটন সংখ্যা	পারমানবিক ভর
হাইড্রোজেন	1	1.00
কার্বন	6	12.01
নাইট্রোজেন	7	14.01
অক্সিজেন	8	16.00
ফ্লোরিন	9	19.00
সোডিয়াম	11	22.99
ম্যাগনেসিয়াম	12	24.31
ফসফরাস	15	30.98
ক্লোরিন	17	35.46
পটাশিয়াম	19	39.10
ক্যালসিয়াম	20	40.08
লোহা	26	55.85

AMARBOI.COM

সৃষ্টিজগতে এই পৃথিবী বা সৌরজগৎ আসার অনেক আগে নক্ষত্রগুলোর জন্ম হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করেছেন সৃষ্টি জগতে প্রথম নক্ষত্রগুলোর জন্ম হয়েছিল 13 থেকে 14 বিলিওন (13 থেকে 14 শতকোটি) বৎসর আগে। সৃষ্টির আদিমুহূর্তে সবকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল সহজ-সরল তাই শুরু হয়েছিল সবচেয়ে সহজ পরমাণু হাইড্রোজেন দিয়ে। মানুষ হত্যা করার জন্যে এখন যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয় নক্ষত্রের শক্তি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি আসলে সেই একই প্রক্রিয়া। নক্ষত্রের ভেতরে হাইড্রোজেন অন্য হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে এবং সেই হিলিয়াম তৈরি করার প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে। সেই শক্তি নক্ষত্রকে ঔজ্জ্বল্য দেয়, তাপ দেয়। একটা নক্ষত্র যে কী পরিমাণ তাপ, আলো বা অন্য শক্তি দিতে পারে সেটি বোঝার জন্যে আমাদের সূর্যকে একনজর দেখলেই হয়, এত ঘরের কাছে এ-রকম একটা নক্ষত্র আছে বলেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এত সহজে নক্ষত্র সম্পর্কে এত কিছু জানতে পেরেছেন।

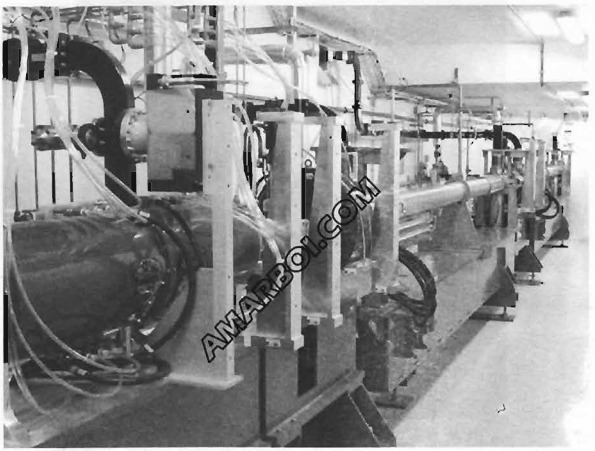
AMARBOI.COM

25.1 নং ছবি: আজকাল বিশাল কোনো এক্সেলেটর ব্যবহার করে হয়তো এক দুটি নিউক্লিয়াস তৈরী করা যায় কিন্তু আমরা পৃথিবীতে যে পরমাণুগুলো দেখি তার সবগুলো তৈরী হয়েছে নক্ষত্রের ভেতরে।

নক্ষত্রের ভেতরে হাইড্রোজেন এক ধরনের জ্বালানী হিসেবে কাজ করে। হাইড্রোজেন ফুরিয়ে হিলিয়াম তৈরি হয় (হিলিয়ামের ইলেকট্রন বা প্রোটন সংখ্যা 2, পারমাণবিক ভর 4), সেই হিলিয়াম থেকে তৈরি হয় কার্বন আর এভাবে নক্ষত্রের ভেতরে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসগুলো তৈরি হতে থাকে। আমাদের পৃথিবীতে আমরা এখন যে পরমাণুগুলো দেখি তার সবগুলো এভাবে কোনো না কোনো নক্ষত্রের ভেতরে তৈরি হয়েছে। আজকাল বিজ্ঞানীরা বিশাল কোনো গবেষণাগারে এক্সেলেরেটর ব্যবহার করে এক দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর বা সৌরজগতের জটিল পরমাণুর সবগুলোই তৈরি হয়েছে কোনো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো নক্ষত্রের ভেতরে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু আমরা সবাই আসলে কোনো না কোনো নক্ষত্রের অংশ। স্বাভাবিকভাবেই পরের প্রশ্নটি চলে আসে, যদি সত্যি সত্যি আমাদের শরীরের জটিল পরমাণুগুলো কোনো না কোনো নক্ষত্রের ভেতর তৈরি হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো সেখান থেকে এই পৃথিবীতে এলো কেমন করে?

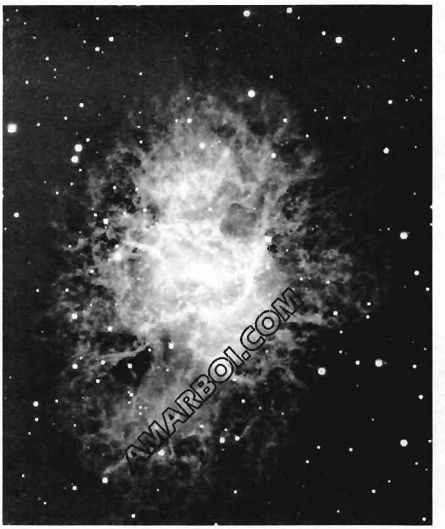
AMARBOI.COM

25.2 নং ছবি: ক্র্যাব নেবুলার ভেতরে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়েছিল, পৃথিবীর মানুষ সেটা খালি চোখে দেখেছিল আজ থেকে এক হাজার বছর আগে।

1987 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন স্টেটে একটা কনফারেন্স গিয়েছি— সারা পৃথিবী থেকে ছোট-বড় অনেক পদার্থবিজ্ঞানীরা এসেছেন, তাদেরকে আনন্দ দেবার জন্যেই কিনা জানি না ঠিক তখন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে গেল। সকালে কনফারেন্সে এসে শুনতে পেলাম আগেরদিন একটা সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর আগে সুপারনোভা বিস্ফোরণ শুধুমাত্র তার আলো থেকে দেখা যেত, এই প্রথমবার বিজ্ঞানীরা আলো ছাড়াও অদৃশ্য নিউট্রিনো ডিটেক্টর তৈরি করেছেন এবং প্রথমবার সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে বের হওয়া নিউট্রিনোকে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন। সারা পৃথিবীতে বিশাল হইচই পড়ে গেল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপারনোভা বিষয়টি বোঝা খুব কঠিন নয়। মানুষের যেরকম জন্ম মৃত্যু হয় নক্ষত্রের সেরকম জন্ম মৃত্যু হয়। অপঘাতে মৃত্যু বা খুন জখমকে যদি বাদ দিই তাহলে মানুষের জন্ম মৃত্যুর একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। নক্ষত্রের সেই প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে তার ভরের উপর। নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের কাছাকাছি হয় তাহলে তার মৃত্যু হয় মোটামুটি বৈচিত্র্যহীন। নক্ষত্র তার জ্বালানী নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে শেষ করে ফেলে, মহাকর্ষের আকর্ষণে গ্রহটা সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে পৃথিবীর আকারের কাছাকাছি হয়ে থাকে। কিন্তু নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভর থেকে 1.4 গুণ বা তার বেশি হয় তাহলে তার মৃত্যুটি হয় চমকপ্রদ! নক্ষত্রটি তার জ্বালানী শেষ করে ফেলতে থাকে এবং নক্ষত্রের কেন্দ্রটি সংকুচিত হতে থাকে। জ্বালানী যেহেতু শেষ হয়ে আসছে নক্ষত্রকে ধরে রাখার কিছু নেই। কেন্দ্রটি হঠাৎ করে তখন সংকুচিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকার নিয়ে নেয়। বলা যেতে পারে পরমাণুগুলো ভেঙে তার নিউক্লিয়াসটিতে সমস্ত ভর এসে জমা হয়। কেন্দ্রে যেটি তৈরি হয় তার নাম নিউট্রন স্টার। পুরো ব্যাপারটি ঘটে মাত্র সেকেন্ড দশেকের মাঝে। নিউক্লিয়াসটির ভরের শতকরা দশ ভাগ তখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের জন্ম দেয়, সেই বিস্ফোরণে পুরো নক্ষত্রটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। (ছবি নং 1) 1987 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ঠিক এ-রকম একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছিল পৃথিবীর মানুষ।

25.3 নং ছবি: পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে রয়েছে নক্ষত্রের কণা। যে মানুষ নক্ষত্রের অংশ তারা কখনো ছোট কাজ করতে পারে না!

এই বিস্ফোরণে নক্ষত্রের ভেতরে তৈরি হওয়া জটিল পরমাণুগুলো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো লক্ষ কোটি বছর পর মহাজাগতিক ধূলিকণা এবং অন্য সবকিছুর সাথে মিলে হয়তো কোথাও সৌরজগতের জন্ম দেয়। সেই সৌরজগতে সূর্য থাকে, থাকে পৃথিবীর মতো গ্রহ। পৃথিবীতে থাকে মানুষ জন্ম দেয়ার প্রয়োজনীয় অনু-পরমাণু— যার জন্ম হয়েছে নক্ষত্রে এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাবিশ্বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই পৃথিবীর মানুষ যখন কখনো নিজের দিকে তাকায় তার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকার কথা। তার রক্তের ভেতরকার লৌহ পরমাণু, দাঁতের ক্যালসিয়াম, মস্তিষ্কের পটাশিয়াম সবগুলোর জন্ম হয়েছিল মহাজগতের কোনো এক নক্ষত্রে। অলৌকিক উজ্জ্বল আলোর ছটা ছড়িয়ে সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল মহাজগতে। সেই হিসেবে আমরা সবাই কোনো না কোনো নক্ষত্রের অংশ।

যে মানুষ নক্ষত্রের অংশ সে কি কখনও কোনো ছোট কাজ করতে পারে? করা কি উচিৎ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

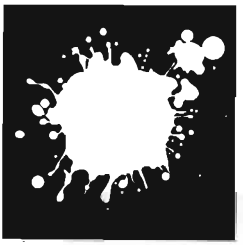

26. অদৃশ্য জগতের সন্ধানে

আকাশের দিকে তাকানোর ব্যাপারটি আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। নগরজীবনে 'আকাশ' শব্দটি ধীরে ধীরে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। অল্প জায়গায় অনেক মানুষকে জায়গা দেবার জন্যে উঁচু উঁচু বিল্ডিং মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সেগুলো ধীরে ধীরে আকাশকে আড়াল করে দিচ্ছে। তারপরও কেউ যদি আকাশের দিকে তাকায় দেখবে সেটি সৌন্দর্য্যহীন বিবর্ণ। শহরের ধুলোবালিতে ধূসর। রাতের বেলা সেই আকাশ আমাদের চোখে পড়ে না, শহরের লক্ষ লক্ষ আলোর বিচ্ছুরণে আকাশ ঢাকা পড়ে থাকে। আকাশে গোপনে প্রায় অপরাধীর মতো চাঁদ ওঠে একসময় বড় হতে হতে পূর্ণিমা হয় আবার ছোট হতে হতে অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে যায়। শহরের মানুষ কি কখনো সেটা দেখেছে? অনুভব করেছে?

আকাশের মতো এত চমৎকার একটা জিনিস আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তার থেকে দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে? আমাদের কৃত্রিম জীবনে আকাশকে নির্বাসন দিয়েছি কিন্তু তবু সেটা আছে। কেউ যদি কখনো শহর থেকে দূরে প্রকৃতির কাছাকাছি কোনো গ্রামে, বিদ্যুৎহীন কোনো বনবাদাড়ে, নদীতে, খোলা প্রান্তরে রাতের বেলা এসে হাজির হয় এখনো সেই আকাশকে দেখতে পাবে। যদি আকাশে চাঁদ থাকে সেটা আমাদের দৃষ্টির অনেকখানি দখল করে রাখবে। যদি চাঁদ না থাকে তাহলে আমরা আকাশের নক্ষত্র দেখে মুগ্ধ হব। পরিষ্কার আকাশে ঝকঝকে নক্ষত্রের মতো অপূর্ব দৃশ্য আর কী আছে? কোন নক্ষত্র উজ্জ্বল, কোন নক্ষত্র অনুজ্জল, কোনটি মিটমিট করে জ্বলছে কোনটি স্থির। কোন কোন নক্ষত্রের আলোতে হালকা কোন একটি রংয়ের স্পর্শ। বছরের কোন সময় দেখছি তার উপর নির্ভর করে আমরা আবিষ্কার করতে পারি আকাশ-জোড়া ছায়াপথ! সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই নক্ষত্ররাজিকে দেখে আসছে, দৃশ্যটির খুব পরিবর্তন হয় নি। আকাশের সেই নক্ষত্রকে দেখে প্রাচীনকালের গুহাবাসী মানুষের মনে যে অনুভূতি হতো এতকাল পর এখনও আমাদের সেই অনুভূতি হয়। পার্থক্য শুধু এক জায়গায়, এখন আমরা এই রহস্যের খানিকটা বুঝতে পারি। হ্যাঁ, খানিকটা।

রাতের বেলা পরিষ্কার আকাশে আমরা কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পারি। মোটামুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বাইনোকুলার চোখে দিলে তার সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আবছা ধোঁয়ার মতো নক্ষত্ররাজি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বছরের ঠিক সময় ঠিক জায়গায় তাকাতে পারলে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিটিও দেখা যায়। বাইনোকুলার ব্যবহার না করে ভালো টেলিস্কোপ ব্যবহার করলে হঠাৎ চোখের সামনে অসংখ্য নূতন নক্ষত্রের সাথে সাথে নূতন নূতন গ্যালাক্সি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এরপর কোনো শেষ নেই মহাকাশের যত গভীরে দৃষ্টি দেয়া যায় সেখানে তত নূতন নূতন গ্যালাক্সি, তত নক্ষত্রপুঞ্জ, নেবুলা, কোয়াজার।

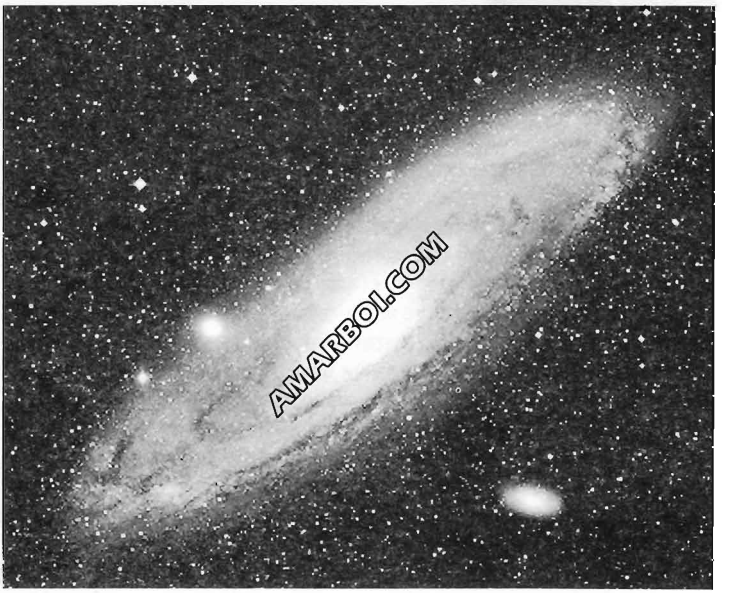
AMARBOI.COM

26.1 নং ছবি: এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকেই খালি চোখে দেখা যায়, একটা বাইনোকুলার হলে আরও সহজ হয়। নিজের চোখে একটা গ্যালাক্সি দেখা থেকে চমৎকার অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না।

আমরা এই নক্ষত্ররাজির কথা জানি, গ্যালাক্সির কথা জানি— কারণ আমরা সেগুলো দেখতে পাই। মানুষের চোখ নামে অপূর্ব এক জোড়া সম্পদ রয়েছে, দেখা নামক অভূতপূর্ব এক ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই চোখ আলোকে দেখতে পায় আর সেই আলো থেকে আমরা এই নক্ষত্ররাজি এই গ্যালাক্সির কথা জানি। যদি নক্ষত্র থেকে আলো বের না হতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আমরা এই নক্ষত্রদের দেখতে পেতাম না, হয়তো তাদের কথা এত সহজে জানতে পারতাম না।

বিজ্ঞানীরা এই নক্ষত্ররাজি এবং গ্যালাক্সিমণ্ডলীকে দেখে অনুমান করার চেষ্টা করেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার কত বড়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি সবকিছু মিলিয়ে তার ভর কত। সেটা করতে গিয়েই তারা আবিষ্কার করলেন যে, তাদের হিসেব মিলছে না। আমরা আমাদের চোখে যে নক্ষত্ররাজি যে গ্যালাক্সি দেখছি সেটুকু যথেষ্ট নয়। তার বাইরেও আরও বিশাল কিছু থাকতে হবে, যেগুলো আমরা দেখতে পাই না। যেটা দেখতে পাই না সেটা আছে কিংবা নেই সেই প্রশ্নটাই আমরা করি কী করে?

একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে আমরা বোঝাতে পারি, আমরা চাঁদের কথা ধরি। ধরা যাক কোনো একটা কারণে চাঁদ আমাদের কাছ অদৃশ্য, আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না। তাহলে পৃথিবীর মানুষ কি চাঁদের কথা জানতে পারত না? নিশ্চয়ই পারত এবং সেটা জানতে পারত নদী এবং সমুদ্রের পানিতে জোয়ার-ভাটা দেখে। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে কেন সমুদ্রের পানিতে জোয়ার এবং ভাটা হয় তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতেন পৃথিবীর কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনো একটা উপগ্রহ রয়েছে সেই উপগ্রহের আকর্ষণে সমুদ্রের পানি ফুলে-ফেপে ওঠে জোয়ারভাটার জন্ম দিচ্ছে। হিসেবপত্র করে তারা এই উপগ্রহের আকার আকৃতি বের করে ফেলতে পারবেন, পৃথিবীটাকে কতদিন পরপর প্রদক্ষিণ করছে সেটাও অনুমান করে ফেলতে পারতেন।

ঠিক সেরকম মহাজগতে নানা নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জের গতি দেখে তারা অনুমান করার চেষ্টা করেন তাদের আশপাশে যে সব মহাজাগতিক বস্তু আছে তাদের ভর কত। গত কয়েক দশকে তারা আবিষ্কার করছেন যে, তাদের অনুমান মিলছে না। নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ বা মহাজাগতিক গ্যাসের গতিবিধি দেখে আশপাশে যে ভর থাকা উচিত বলে অনুমান করা হচ্ছে প্রকৃত ভর তার থেকে অনেক কম। তাদের মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনো ভর লুকিয়ে আছে যেটা তারা দেখতে পাচ্ছেন না।

আমাদের চোখ যে আলোকে দেখতে পায় তার বাইরেও কিন্তু আলো রয়েছে। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতর থাকে শুধুমাত্র তখন সেটা আমরা দেখতে পাই, তার বাইরে চলে গেলে আমরা সেটা দেখতে পাই না। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিশাল ব্যাপ্তির মাঝে আমরা যেটুকু দেখতে পাই সেটা খুবই ছোট, ধর্তব্যের মাঝেই আনার কথা নয়! কাজেই আমরা যেটাকে দৃশ্যমান আলো বলছি তার বাইরেও অদৃশ্য আলোর একটা বিশাল জগৎ রয়েছে। অতি বেগুনি রশ্মি বা আলট্রাভায়োলেট রে সেরকম আলো, এক্স-রে সে রকম আলো। এই অদৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট। ফাইবার অপটিক্সে তথ্য পাঠানোর জন্যে যে আলো ব্যবহার করা হয় সেটিও অদৃশ্য আলো, আমরা তাকে বলি ইনফ্রারেড বা অবলাল আলো। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি। মাইক্রোওয়েভ বা রেডিও, টেলিভিশন কিংবা মোবাইল টেলিফোনে তথ্য আদান প্রদান করার জন্যে আমরা যে বিদ্যুৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করি সেগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে অনেক বেশি।

AMARBOI.COM

26.2 নং ছবি : আমরা যে নক্ষত্ররাজি আর গ্যালাক্সিমণ্ডলী দেখতে পাই তার বাইরে রয়েছে এক অদৃশ্য জগৎ। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই অদৃশ্য জগতটুকু শতকরা নব্বই ভাগ থেকেও বেশি।

আমরা যে আলোকে দেখতে পাই তার বাইরেও বিশাল অদৃশ্য আলোর জগৎ জানার পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সেই জগৎটা কেমন? আকাশের যে অংশ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না সেটা দেখার জন্যে বিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনেক আলো শোষিত হয়ে যায় বলে মহাকাশে টেলিস্কোপ পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর বিশাল এলাকা নিয়ে অতিকায় রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন এবং মহাকাশকে তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দৃশ্যমান জগতের বাইরে বিশাল অদৃশ্য জগৎ তারা খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু আবার যখন হিসেব করতে বসেছেন তারা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, এখনো হিসাব মিলছে না। এই মহাজগতে যে পরিমাণ বস্তু থাকার কথা সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণ বস্তু দেখা যাচ্ছে না। তারা নিশ্চিতভাবেই বলছেন এই মহাজগতে আমাদের চোখের কাছে অদৃশ্য এক ধরনের বস্তু রয়ে গেছে। খালি চোখে বা বিশেষ টেলিস্কোপে কোনোভাবেই সেটা দেখা যায় না বলে এর নাম দিয়েছেন অন্ধকার বস্তু বা ইংরেজিতে ডার্ক ম্যাটার। বর্তমান বিজ্ঞানের যে কয়টি রহস্য রয়েছে তার মাঝে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক রহস্যের একটি হচ্ছে এই ডার্ক ম্যাটার রহস্য।

সৃষ্টিজগতের কতটুকু এই ডার্ক ম্যাটার বা অন্ধকার বস্তু? শুনলে নিশ্চয়ই চমকে যাবার কথা যে শতকরা 93 ভাগ আমাদের চোখে এখনো অদৃশ্য। আমরা যেটুকু দেখছি সেটি হচ্ছে মাত্র দশ ভাগ, বাকি অংশটুকু আমরা দেখছি না, সোজাসুজি দেখার কোনো উপায়ও নেই।

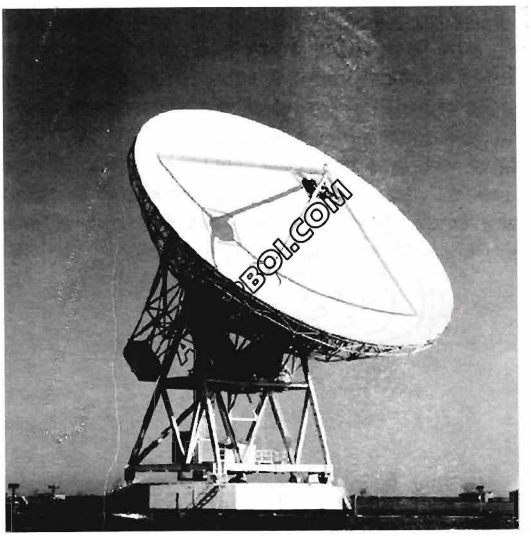

26.3 নং ছবি : চোখের কাছে অদৃশ্য জগৎটুকু দেখার জন্যে ব্যবহার হয় রেডিও টেলিস্কোপ।

ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত। এক দলকে বলা যায় বেরিওনবাদী। তারা মনে করেন এই ডার্ক ম্যাটার আমাদের পরিচিত বেরিওন (নিউট্রন প্রোটন) দিয়ে তৈরি। যেহেতু তাদের থেকে আলো বের হয় না তাই আমরা তাদের দেখতে পারি না— কিন্তু তারা আছে। সোজাসুজি না দেখলেও তাদের প্রভাবটুকু অনুভব করা যায়। তাদের প্রবল মাধ্যাকর্ষণের কারণে কখনো-কখনো আলো বেঁকে যায়। কখনো বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় সেটা লেন্সের মতো কাজ করে। ম্লান কোনো আলোকে উজ্জ্বল আলো হিসেবে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা আমাদের ছায়াপথে পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করছেন ডার্ক ম্যাটারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এরকম। মৃত নক্ষত্র এবং আলোহীন নানা ধরনের গ্যাস বা পদার্থ দিয়ে এসব তৈরি।

ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি তার দ্বিতীয় দলের মানুষদের বলা যায় বৈচিত্র্যবাদী! তারা মনে করেন বিশাল এই ডার্ক ম্যাটারের জগৎ আসলে আমাদের পরিচিত বেরিওন দিয়ে তৈরি নয়, সেগুলো তৈরি হয়েছে এমন কোন বিচিত্র পদার্থ দিয়ে আমরা এখনো যার খোঁজ পাই নি। তারা সেটার একটা গালভরা নাম দিয়েছেন (Weackly Interacting Massive Particles) WIMP এবং অনুমান করছেন আমাদের চারপাশে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু যেহেতু এগুলো আমাদের পরিচিত কিছু নয় তাই আমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না। সেগুলো খোঁজার জন্যে বিশেষ ধরনের ডিটেক্টর তৈরি করা হয়েছে। চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় রাখা সিলিকনের সেই ডিটেক্টর এ ধরনের বিচিত্র বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে পরীক্ষা করে যাচ্ছে। যদি সত্যি সেরকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নূতন একটি অধ্যায়ের সূচনা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূতন অধ্যায়ের সূচনা হোক আর পুরাতন অধ্যায় দিয়েই ব্যাখ্যা করা হোক মহাজগতের অদৃশ্য এই বিশাল ভর কোথা থেকে এসেছে সেটি জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশাল এই জগতের কতটুকু ক্ষুদ্র অংশই না আমরা জানি এবং ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের না জানি কত বিস্ময় লুকিয়ে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

27. ব্ল্যাক হোল

ব্ল্যাক হোল (Black Hole) শব্দটা তুলনামূলকভাবে বেশ নূতন। 1969 সালে জন হুইলার প্রথম এটা ব্যবহার করেছিলেন। যদিও ব্ল্যাক হোল বিষয়টি মাত্র কিছুদিন থেকে পদার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো দুশ বছরেরও আগে ক্যামব্রিজের একজন বিজ্ঞানী, জন মিসেল প্রথম এর একটি ধারণা দিয়েছিলেন।

একটা সময় ছিল যখন কোনো কোনো বিজ্ঞানী ভাবতেন আলো হচ্ছে এক ধরনের কণা, অন্যেরা ভাবতেন এটা হচ্ছে তরঙ্গ। (মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন দেখা গেছে দুটিই সত্যি, আলোকে কণা হিসেবে দেখা যায় আবার তরঙ্গ হিসেবেও দেখা যায়!) আলোকে তরঙ্গ হিসেবে দেখা হলে মহাকর্ষ বল কীভাবে এর উপর কাজ করবে সেটা অনুমান করা যায় না। কিন্তু এটাকে কণা হিসেবে দেখলে বিষয়টা খুব সহজ হয়ে যায়। একটা টেনিস বল উপরে ছুড়ে দিলে মধ্যাকর্ষণের কারণে এটা যে-রকম নিচে ফিরে আসে ব্যাপারটা অনেকটা সে-রকম হয়ে যায়। জন মিশেল সেটাই করলেন— হিসেব করে দেখালেন, একটা নক্ষত্র যদি যথেষ্ট বড় হয়, তার ঘনত্ব যদি নির্দিষ্ট ঘনত্ব থেকে বেশি হয় তাহলে তার থেকে যে আলোটা বের হবে (যে আলোর কণা বের হবে) সেটা নক্ষত্র ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণে আলোর কণা ঠিক উপরে ছুড়ে দেওয়া টেনিস বলের মতো নিচে ফিরে আসবে। এ-রকম কোনো নক্ষত্র যদি থাকে সেটাকে কেউ দেখতে পাবে না, কারণ সেখান থেকে কোনো আলো বের হবে না, উল্টো মনে হবে সব আলো বুঝি শুষে নিচ্ছে, মনে হবে অন্ধকারের গোলক বা ব্ল্যাক হোল।

জন মিশেলের ব্ল্যাক হোলের অবশ্যি একটা বড় সমস্যা রয়েছে, সেটা তখন কেউ জানত না। আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল এবং সেটা কখনোই কমে না বা বাড়ে না! সব সময়েই এটা সমান— কাজেই নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণে আলোর কণার গতিবেগ কমে একসময় থেমে যাবে তারপর আবার নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণে আবার নক্ষত্রের বুকে ফিরে আসবে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। মহাকর্ষ বল কীভাবে আলোর কণার উপর কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে সেটা পুরাপুরি বোঝার জন্যে পৃথিবীর মানুষকে 1915 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, যখন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার জেনারেল থিউরি অব রিলেটিভিটি দিয়ে প্রথমবার সেটা ব্যাখ্যা করলেন। সত্যি কথা বলতে কি বিশাল নক্ষত্র কীভাবে তার মহাকর্ষ বল দিয়ে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে আলোর কণার উপর কাজ করে সেটা পুরাপুরি বুঝতে বুঝতে আরো কয়েক দশক কেটে গেছে।

ব্ল্যাক হোল কীভাবে তৈরি হয় সেটা বোঝার জন্যে আগে একটা নক্ষত্র কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে হবে। একটা নক্ষত্র তৈরি হয় যখন মহাকাশের কোথাও হাইড্রোজেন গ্যাসের বিশাল একটা ভাণ্ডার একত্র হয়। মহাকর্ষের কারণে হাইড্রোজেন গ্যাস সংকুচিত হতে শুরু করে, যতই এটা সংকুচিত হয় ততই এর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। (গ্যাসকে সংকুচিত করা হলে তার তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াই খুবই পরিচিত ব্যাপার, এর উল্টোটাও সত্যি, সংকুচিত বাতাসকে যুক্ত করে দেওয়া হলে সেটা শীতল হয়ে যায়। রেফ্রিজিরেটর বা এয়ার কন্ডিশনারে এই প্রক্রিয়াটা ব্যবহার করা হয়। বাতাসকে সংকুচিত করার সময় সেটা যে বেশ গরম হয়ে যায় সেটা রেফ্রিজিরেটরের বা এয়ার কন্ডিশনারের পিছনে গেলেই আমরা টের পাই।) সংকুচিত হাইড্রোজেন গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছায় তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে পরমাণুর গতিবেগ বেড়ে যাওয়া কাজেই নক্ষত্রের ভেতরের হাইড্রোজেন পরমাণু প্রবল বেগে একটা আরেকটাকে ধাক্কা দিতে শুরু করে। গতিবেগ যদি খুব বেশি হয় তখন একটা হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য পরমাণুকে ভেঙেচুরে একেবারে তার নিউক্লিয়াসে আঘাত করে। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসগুলো একত্র হয়ে তখন হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস হয়ে মোট ভর কমে যায় তখন সেই বাড়তি ভরটুকু আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। (সত্যি কথা বলতে কী হাইড্রোজেন বোমাটি আসলে এই একই ব্যাপার। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখনো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখেন নি— নক্ষত্রে সেটা নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়!) একটা নক্ষত্রে যখন হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি শুরু হয় তখন সেটা শক্তি বিচ্ছুরণ করতে থাকে, আমরা তার আলোকে দেখতে পাই। নক্ষত্র যখন শক্তি দিতে শুরু করে তখন প্রথমবার সেই তাপশক্তি মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখতে সম্ভব হয়। নক্ষত্রের সংকুচিত হওয়া হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এর পরের প্রশ্নটি এসে যায়, সেটি হচ্ছে যখন নক্ষত্রের সব হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য নিউক্লিয়ার জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে তখন কী হবে? যতক্ষণ ভেতর থেকে শক্তি তৈরি হচ্ছিল ততক্ষণ মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল, যখন সেই শক্তি শেষ হয়ে যাবে এক অর্থে নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটবে, তখন মহাকর্ষ বলকে ঠেকিয়ে রাখার কেউ নেই সেটা আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। আমাদের সূর্য এ-রকম একটা নক্ষত্র তার সব জ্বালানী শেষ হতে এখনো পাঁচ বিলিয়ন বছর বাকী, যে সব নক্ষত্র আকারে বড় হয় তাদের জ্বালানী কিন্তু শেষ হয় তাড়াতাড়ি। তার কারণ বড় নক্ষত্রের তাপমাত্রা হয় বেশি তাই জ্বালানী খরচও হয় অনেক বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

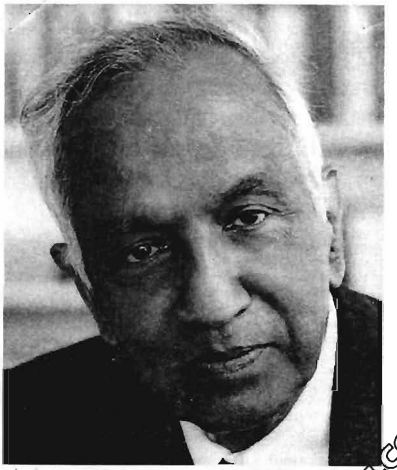

27.1 নং ছবি : চন্দ্রশেখর প্রথম বলেছিলেন কোনো নক্ষত্র যদি সূর্য থেকে দেড়গুণ পর্যন্ত বড় হয় শুধুমাত্র তাহলেই সেটা শান্তিতে হোয়াইট ডোয়ারফ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

একটা নক্ষত্রের মৃত্যুর পর অর্থাৎ, ভেতরের জ্বালানী শেষ হবার পর যখন ভেতর থেকে আর তাপ সৃষ্টি হয় না, তখন মহাকর্ষের প্রচণ্ড আকর্ষণে নক্ষত্রের কী অবস্থা হয় সেটা প্রথম বের করেছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখর। তিনি তখন ছাত্র, 1928 সালে জাহাজে করে যাচ্ছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে। জাহাজে যেতে-যেতে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেবে বের করলেন একটা নক্ষত্র সবচেয়ে বেশি কতটুকু বড় হতে পারে যেন নিউক্লিয়ার জ্বালানী শেষ হবার পরেও সেটা সংকুচিত হতে হতে এক জায়গায় এসে থেমে যায়! নক্ষত্র সংকুচিত হতে হতে একসময় এমন একটা পরিস্থিতি হবে যখন পরমাণুগুলো একেবারে গায়ে গায়ে লেগে যাবে। তখন সেটা আর ছোট হতে পারবে না। (পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াটির একটা গালভরা নাম আছে সেটা হচ্ছে পলির এক্সক্লুশান প্রিন্সিপাল)। একটা নক্ষত্র যখন এভাবে "মৃত্যুবরণ" করে সেটাকে বলা হয় হোয়াইট ডোয়ারফ (White Dwarf) বা শ্বেত বামন। আজ থেকে পাঁচ বিলিয়ন বৎসর পরে আমাদের সূর্য হোয়াইট ডোয়ারফ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। চন্দ্রশেখর হিসেব করে দেখালেন কোনো নক্ষত্র যদি সূর্য থেকে প্রায় দেড় গুণ পর্যন্ত বড় হয় সেটি শান্তিতে এবং নিরাপদ হোয়াইট ডোয়ারফের মৃত্যুবরণ করতে পারে এবং এটাকে বলা হয় চন্দ্রশেখর লিমিট বা চন্দ্রশেখর সীমা।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে সব নক্ষত্রই যে চন্দ্রশেখরের দেয়া সীমার ভেতরে থাকবে সেটা কে বলেছে? এটা তো বড়ও হতে পারে, যদি এটা এই বড় হয় তখন কী হবে? চন্দ্রশেখর দেখালেন তখন এই নক্ষত্রের মৃত্যু আর শান্তিময় নিরাপদ মৃত্যু নয়— এর মৃত্যু তখন ভয়ংকর একটি মৃত্যু। নক্ষত্রটি মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণে ছোট হতে হতে এত ছোট হতে শুরু করবে যে, কেউ তার সেই ভয়ংকর সংকোচন থামাতে পারবে না। সে রকম সংকোচনের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, শেষ পর্যন্ত কী হবে কারো কোনো ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। অল্প বয়েসী চন্দ্রশেখর যেদিন রয়াল এস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির সভায় তার এই যুগান্ত কারী আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেদিন বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল। তার ঘোষণার পরপরই চন্দ্রশেখরের শিক্ষক পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ছাত্রকে সকলের সামনে তুলোধুনো করতে শুরু করলেন। এডিংটন তখন ডাকসাইটে বিজ্ঞানী, চন্দ্রশেখর অল্পবয়সী তরুণ বিজ্ঞানী, কাজেই এডিংটনের সেই ভয়ংকর বক্তৃতার ফলাফল হলো ভয়ানক। এডিংটন প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন চন্দ্রশেখরের গবেষণার ফলাফল ভুল এবং অর্থহীন। একটা নক্ষত্র লাগামছাড়া ভাবে ছোট হতে হতে বিলীন হয়ে যাবে এটা এক ধরনের পাগলামো, বাতুলতা।

এডিংটনের সেই ভাষণের পর চন্দ্রশেখর মনের দুঃখে নক্ষত্রের মৃত্যু 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' এই ধরনের গবেষণা থেকেই সরে এলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কেমব্রিজ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেলেন। মজার কথা হচ্ছে 1983 সালে তাকে যখন নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় সেটা ছিল মূলত তার অভিমান ভরে ছেড়ে দেয়া নক্ষত্রের মৃত্যুর উপর গবেষণার জন্যে।

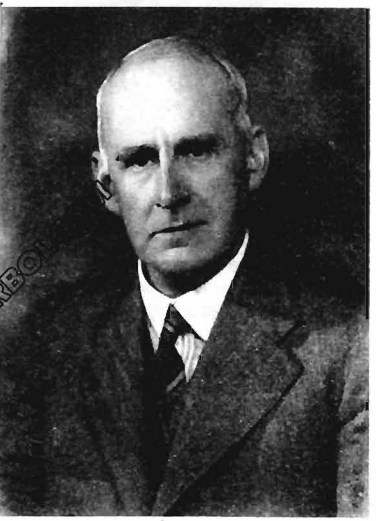

27.2 নং ছবি: ডাকসাইটে বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তরুণ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের মতবাদের সমালোচনা করেছিলেন। চন্দ্রশেখর একদিন কিন্তু সেই সমালোচিত মতবাদের জন্যেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন কোনো নক্ষত্র যদি চন্দ্রশেখর লিমিট থেকে বড় হয় সেটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে সংকুচিত হতে শুরু করে। প্রকৃত অর্থে কী হয় সেটা নিয়ে অভিমান করে তখন তিনি আর গবেষণা করেন নি। সেটা নিয়ে গবেষণা করে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি ব্যবহার করে 1939 সালে প্রথম যিনি একটা সমাধান দিলেন তিনি হচ্ছেন তরুণ মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার। ঠিক তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ওপেনহাইমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের ডামাডোলে মানুষ নক্ষত্রের সংকোচন বা এই ধরনের বিষয় প্রায় ভুলেই গেল। নিউক্লিয়ার বোমা আবিষ্কারের পর সবার কৌতূহল দানা বাঁধল পরমাণু আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

27.3 নং ছবি : ওপেনহাইমার যদিও নিউক্লিয়ার বোমা তৈরীর জন্যেই পরিচিত তিনি কিন্তু ব্ল্যাকহোলের জন্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর। 1960 সালের দিকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আবার প্রায় ভুলে যাওয়া এই বিষয়টাতে ফিরে এলেন এবং অনেকেই নূতন করে ওপেনহাইমারের সমাধানটি নূতন করে আবিষ্কার করলেন।

ওপেনহাইমারের সমাধান থেকে আমরা একটা নক্ষত্রের সংকুচিত হয়ে ব্ল্যাক হোলে পরিবর্তিত হবার বিষয়টা কল্পনা করতে পারি। ধরা যাক একটা নক্ষত্র সংকুচিত হতে শুরু করেছে। এটা যতই সংকুচিত হচ্ছে ততই আরো ছোট জায়গার ভেতরে নক্ষত্রের পুরো ভরটুকু আঁটানো হচ্ছে কাজেই মহাকর্ষ বল ততই বেড়ে যাচ্ছে। সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যায় দূর নক্ষত্রের আলো মহাকর্ষের কারণে বেঁকে যায়। কাজেই নক্ষত্রের প্রবল মহাকর্ষের কারণে তার থেকে বের হওয়া আলোটুকুও ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হতে শুরু করে। বাইরে থেকে কেউ যদি দেখে তাহলে দেখবে নক্ষত্রের আলো কমেছে এবং ধীরে ধীরে তার শক্তি কমে আসছে। নক্ষত্র সংকুচিত হতে হতে যখন একটা বিশেষ আকারে সংকুচিত হয়ে যাবে তখন তার থেকে আলো বের হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। জেনারেল রিলেটিভিটির সূত্র অনুযায়ী কোনো কিছুই আলোর গতিবেগ থেকে বেশি হতে পারে না, তাই নক্ষত্র থেকে যখন আর আলো বের হতে পারে না তখন তার থেকে আর কোনো কিছুই বের হতে পারে না। বাইরের জগতের সাথে তার আর কোনো যোগাযোগই থাকে না।

27.4 নং ছবি : স্টিফেন হকিং ব্ল্যাকহোল নিয়ে চমকপ্রদ সব গবেষণা করেছেন।

এ-রকম একটা অবস্থা যখন হয় সেটাকেই বলে ব্ল্যাক হোল। বিজ্ঞানের জগতে এর চাইতে চমকপ্রদ আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

28. বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত বিচি

একটা বিশাল নক্ষত্রের সকল জ্বালানী যখন শেষ হয়ে যায় তখন তার প্রবল মহাকর্ষ বলকে ঠেকিয়ে রাখার কিছু থাকে না। সেই মহাকর্ষ বল তখন পুরো নক্ষত্রটিকে একটা বিন্দুতে সংকুচিত করে আনে, আর এভাবেই ব্ল্যাক হোলের জন্ম। যদিও কাগজে-কলমে পদার্থবিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের কথা অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন কিন্তু মহাকাশে তাকিয়ে সত্যিকার ব্ল্যাক হোল খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। কারণটি সহজ— ব্ল্যাক হোল সত্যি আছে তার একেবারে একশভাগ বিশ্বাসযোগ্য সিগন্যালের খুব অভাব। অন্য অনেক মহাজাগতিক বস্তু আছে (যেমন নিউট্রন স্টার) তাদের সিগন্যালটি এত চমকপ্রদ যে সেটা অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই— ব্ল্যাক হোলের বেলায় সে-রকম কিছু নেই।

ব্ল্যাক হোল আমাদের সব রকম সংজ্ঞাকে হার মানায় সত্যি, কিন্তু একটা ব্ল্যাক হোলকে বর্ণনা করতে মাত্র তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথমটি হচ্ছে তার ভর, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার ঘূর্ণনের পরিমাণ (বিজ্ঞানের ভাষায় কৌণিক ভরবেগ) এবং তৃতীয়টি তার বৈদ্যুতিক চার্জ। ব্ল্যাক হোলের ভর থাকবেই— সত্যি কথা বলতে কি বিশাল একটা ভরের কারণেই ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয় কিন্তু অন্য দুটো বিষয়, ঘূর্ণন বা বৈদ্যুতিক চার্জ, থাকতেই হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, নাও থাকতে পারে। কাজেই আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির ভয়ংকর জটিল হিসেব করে যে ব্ল্যাক হোল পাওয়া যায় সেটাকে বর্ণনা করতে হলে শুধু তার ভরটুকু বলে দিলেই হয়। আর কিছু বলতে হয় না—এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার।

কোথাও যদি একটা ব্ল্যাক হোল থাকে তাহলে তার আশপাশের যত গ্যাস ধূলিকণা অনু পরমাণু সবকিছু ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে সেদিকে ছুটে যেতে থাকবে। সেগুলো যতই ব্ল্যাক হোলের কাছে যেতে থাকবে ততই নিজেদের ভেতরে ধাক্কাধাক্কি হতে থাকবে। যার ফলে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। তাপমাত্রা বাড়লে যে সেখান থেকে আলো বের হয় সেটা আমরা সবাই জানি মোমবাতির আলো থেকে লাইট বাল্বের ফিলামেন্ট সবকিছুতেই সেটা আমরা দেখেছি। কাজেই ব্ল্যাক হোলের আশপাশেও সেটা আমরা দেখব। ব্ল্যাক হোলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে দ্রুত ধাবমান গ্যাস থেকে তীব্র উজ্জ্বল আলো বের হতে শুরু করছে। গ্যাস যত ব্ল্যাক হোলের কাছে যাবে সেটা তত বেশি উত্তপ্ত হবে আর সেখান থেকে তত বেশি শক্তিশালী আলো বের হবে। আলো এক ধরনের তরঙ্গ সেটা যত শক্তিশালী হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তত ছোট হতে থাকে, কাজেই ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অনু, পরমাণুর তাপমাত্রা যখন কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে সেখান থেকে খুব ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ধরনের আলো বের হবে। ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এই আলোকে আমরা খালি চোখে দেখি না। তবে এর নামটা সবাই জানি, এটাকে বলে এক্স-রে। ব্ল্যাক হোলের কাছে থেকে বের হয়ে আসা এক্স-রে দেখে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রথম একটা ব্ল্যাক হোলকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে ছয় হাজার আলোকবর্ষ দূরে সেই ব্ল্যাক হোলটি সিগনাস এক্স ওয়ান (Cygnus X-1) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ নিশ্চিত যে এটা সত্যিই একটা ব্ল্যাক হোল, শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত নন। অনেকের ধারণা ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারে কেউই কখনো শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত হতে পারবে না। যে জিনিসটি শুধু যে চোখে দেখা যায় না তা নয়, তার ভেতর থেকে কোনো কিছু বের হতে পারে না। সেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত হওয়া মুশকিল ব্যাপার নয়।

২৬। না ছবি: এখন পর্যন্ত কেউ ব্ল্যাক হোল দেখে নি, তাই শিল্পীর কল্পনায় একটি ব্ল্যাক হোলের ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ যদি কখনো কোনো একটা ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি যায় তাহলে তারা যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে একেবারে মিশমিশে কালো রংয়ের একটা গোলক। এই কালো গোলকটিকে বলে ব্ল্যাক হোলের দিগন্ত। আমরা পৃথিবীতে যখন দাঁড়াই তখন বহুদূরে দিগন্ত রেখা দেখতে পাই। দিগন্ত রেখার অন্য পাশে কিছু আমরা দেখতে পাই না। ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের বেলাতেও সেটা সত্যি। দিগন্তের বাইরের অংশটুকু থেকে আলো বের হতে পারে কিন্তু দিগন্তের ভেতরে মহাকর্ষ বলের আকর্ষণ এত তীব্র সেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হতে পারে না। ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের ভেতরে কী আছে সেটি কেউ কখনো দেখতে পাবে না!

ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের আকার কত হবে সেটা বের করার খুব সহজ একটা সূত্র রয়েছে। একটা ব্ল্যাক হোলের ভর সূর্য থেকে যত গুণ বেশি তার দিগন্তের পরিধিটি হবে 18.5 কিলোমিটার থেকে ততগুণ বেশি। অর্থাৎ, যদি একটি ব্ল্যাক হোলের ভর হয় সূর্যের ভরের দশ গুণ তাহলে তার দিগন্তটি দিয়ে যে মিশমিশে কালো গোলক তৈরি হবে তার পরিধি হবে মাত্র 185 কিলোমিটার, ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব থেকেও কম! যদি ব্ল্যাক হোলের পুরো ভরটুকু এই ব্ল্যাক হোলের দিগন্ত দিয়ে তৈরি করা গোলকের মাঝে থাকত তাহলে এর ঘনত্ব হতো প্রতি এক সিসিতে 200 মিলিয়ন টন! সেটা কত বড় সেটা নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। তবে সবচেয়ে যে বিস্ময়ের ব্যাপার সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের বিশাল ভরটুকু কিন্তু দিগন্তের গোলকের মাঝে ছড়িয়ে থাকে না। সেটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই একটা বিন্দুর মাঝে সংকুচিত হয়ে থাকে। এই বিন্দুটিকে বলে 'সিংগুলারিটি' (Singularity) আর এর আকার হচ্ছে 10^{-33} সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। এটি কত ছোট সেটা অনুভব করাও কঠিন। তুলনা করার জন্যে বলা যায় একটা পরমাণুর আকার থেকে একশত বিলিয়ন মিলিয়ন ভাগ ছোট। (যাদের মনে নেই তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় এক বিলিয়ন হচ্ছে একশ কোটি।) দশটি সূর্যের সমান ভর কেমন করে এত ছোট একটি বিন্দুর মাঝে সংকুচিত হয়ে থাকে সেটি সম্ভবত এই জগতের সবচেয়ে বড় বিস্ময়গুলোর একটি।

AMARBOI.COM

কেউ লক্ষ করেছে কি না জানি না ব্ল্যাক হোলের দিগন্ত দিয়ে তৈরি গোলকটির কথা বলার সময় তার পরিধির কথা বলা হয়েছে। তার ব্যাসার্ধের কথা বলা হয় নি। আমরা একটা গোলককে বোঝাতে সব সময়েই তার ব্যাস কিংবা ব্যাসার্ধ দিয়ে প্রকাশ করি, কখনোই তার পরিধি দিয়ে প্রকাশ করি না! কিন্তু ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের বেলায় তার পরিধির কথা বলা হয়েছে ব্যাসার্ধের কথা বলা হয় নি —এটি কোনো ত্রুটি নয়, আসলে ইচ্ছে করে করা হয়েছে। তার কারণ ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের গোলকটির পরিধি কত সেটা আমরা জানি কিন্তু সেই গোলকের ব্যাসার্ধ কত সেটা আমরা জানি না।

আমি নিশ্চিত অনেকেই তার ভুরু কুঞ্চিত করে ফেলেছেন। সেই স্কুলে শেখানো হয়েছে একটা গোলকের ব্যাসার্ধ যদি হয় R তাহলে পরিধি হচ্ছে $2\pi R$। কাজেই ব্ল্যাক হোলের দিগন্তের গোলকটির পরিধিকে 2π (6.28 এর কাছাকাছি) দিয়ে ভাগ করলেই পেয়ে যাব। কিন্তু মজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার হচ্ছে এটি সত্যি নয়। যে গোলকটির পরিধি মাত্র 185 কিলোমিটার তার কেন্দ্রটি কিন্তু গোলকের পৃষ্ঠে থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে হতে পারে। ব্ল্যাক হোলের বিশাল ভরের কারণে তার চারপাশের এলাকাটুকুও (Space) ভয়াবহভাবে সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। কাজেই দূরত্ব বলতে আমাদের যে পরিচিত ধারণা আছে তার কোনোটিই এখানে খাটবে না।

28.2 নং ছবি : ব্ল্যাক হোলের প্রবল আকর্ষণে পাশের নক্ষত্র থেকে গ্যাস ছুটে আসছে প্রচণ্ড গতিতে, আবার শিল্পীর কল্পনা।

বিষয়টা কীভাবে ঘটে সেটা একটা অন্য উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব। মনে করা যাক, একটা বৃত্তাকার রবারের পাতলা পর্দাকে টানটান করে রাখা হয়েছে। তার ঠিক কেন্দ্রে আমরা একটা বিন্দু একেছি। এই বিন্দু থেকে বৃত্তের পরিসীমা পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে R_1 এবং বৃত্তের পরিসীমা হচ্ছে $2\pi R_1$ আমরা সেই স্কুলে এটা শিখেছি।

এবারে ছোট একটা পাথর এনে আমরা রবারের তৈরি বৃত্তের কেন্দ্রে রাখতে পারি। পাথরের ভরের কারণে রবারের এই পৃষ্ঠটির কেন্দ্রটি খানিকটা ঝুলে যাবে। এবারে কেন্দ্র থেকে বৃত্তের পরিসীমা পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে R_2 এবং দেখাই যাচ্ছে R_2 হচ্ছে R_1 থেকে বেশি। বৃত্তের পরিসীমা হচ্ছে $2\pi R_1$ কিন্তু "ব্যাসার্ধ" R_1 নয়, ব্যাসার্ধ R_1 থেকে বেশি R_2।

যদি আরো ভারী একটা পাথর রাখা হয় তাহলে কেন্দ্রটি আরো নিচে নেমে আসবে এবং যদিও পরিধির কোনো পরিবর্তন হয়নি, "ব্যাসার্ধ" R_3 হবে আরও অনেক বেশি। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

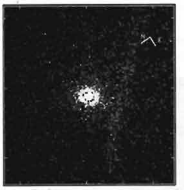

২৪.৩ নং ছবি : সিগনাস এক্স ওয়ান থেকে এই এক্স-রে সিগন্যালটি একটি ব্ল্যাক হোলের কারণে আসছে বলে অনুমান করা হয়।

প্রচলিতভাবে ব্যাসার্ধ বলতে যা বোঝাই এখানে সেটি আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্তু ব্যবহার করার উপায়ও নেই! ব্ল্যাক হোলের বেলাতেও তাই হয়। পাথরের ভরের কারণে যে রকম রবারের পাতলা পর্দা ঝুলে পড়ে ব্ল্যাক হোলের ভরের কারণেও ঠিক সেরকম চারপাশের এলাকা বা ক্ষেত্র ঝুলে পড়ে। রবারের পদার্থ ছিল দ্বিমাত্রিক। ব্ল্যাক হোলের বেলায় সেটা হবে ত্রিমাত্রিক, এটাই পার্থক্য।

শৈশবে রূপকথার গল্পে আমরা পড়েছিলাম বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত বিচি। সেটা সম্ভব হবে কেউ কখনো কল্পনা করে নি— কিন্তু ব্ল্যাক হোলের বেলায় সেটা সত্যি। গোলকের পরিধি ছোট কিন্তু তার ব্যাসার্ধ বিশাল।

২৪.৪ নং ছবি : বৃত্তের পরিসীমা $2\pi R_1$ কিন্তু ব্যাসার্ধ R_1 থেকে অনেক বেশি হতে পারে যদি এলাকাটা এক সমতল না হয়।

AMARBOI.COM

ব্ল্যাক হোলের প্রকৃত ব্যাসার্ধ কত সেটা বের করা সহজ নয়। কারণ, এক ক্ষুদ্র বিন্দুতে সীমাবদ্ধ বিশাল ভর কিন্তু শান্ত হয়ে বসে নেই, সেখানে ক্রমাগত প্রলয়কাণ্ড চলছে। তার কারণে তার চারপাশের ক্ষেত্রে এক বিশাল আলোড়ন সঠিকভাবে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব বের করার কোনো উপায় নেই। কেউ একজন যে কখনো সেখানে ঢুকে কী হচ্ছে দেখে আসবে তারও কোনো উপায় নেই। প্রকৃতি অনেক আগেই সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে।

ব্ল্যাক হোলের ভেতরে কী হচ্ছে সেটা কেউ কখনো জানবে না। কিন্তু কল্পনা করতে পারবে না সেটা তো কেউ বলে নি—এই হিসেবে মানুষের ভাবনার জগৎ থেকে বড় কিছু আর নেই— সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

29. মহাজাগতিক সংঘর্ষ

কোনো জিনিস আকারে খুব বড় হলে সেটা সাধারণত আমাদের ভেতরে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময়ের জন্ম দেয়। মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা তার ব্যতিক্রম খুঁজে পাই, এমন কোনো জিনিস আমাদের চোখে পড়ে যার আকারটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিশাল এবং তার বিশালত্ব নিজের কাছে ক্ষতিকর, অনেক সময় দৃষ্টিকটু এবং এ রকম জিনিসকে আমরা ডাইনোসর বলে উপহাস করি। তার কারণ পৃথিবীতে একসময় ডাইনোসর বলে এক ধরনের বিশাল সরীসৃপ রাজত্ব করত এবং আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগে পৃথিবীতে টিকে থাকতে না পেরে তারা পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোনো প্রাণী যদি পৃথিবীতে টিকে থাকতে না পারে তাহলে আমরা সেটাকে তার সীমাবদ্ধতা মনে করে উপহাস করতেই পারি, আমাদের কারো কাছে সেটা মোটেও বিচিত্র মনে হয় না।

তবে যে জিনিসটা আমরা প্রায়ই চিন্তা করি না সেটা হচ্ছে— ধ্বংস হয়ে যাবার আগে ডাইনোসর পৃথিবীর বুকে একশ ত্রিশ মিলিয়ন বৎসর বেঁচেছিল। একশ ত্রিশ মিলিয়ন বৎসর সুদীর্ঘ সময় তুলনা করার জন্যে বলা যায় পৃথিবীতে আমরা (হোমোস্যাপিয়েন) এসেছি মাত্র চল্লিশ হাজার বৎসর আগে। এই চল্লিশ হাজার বৎসরেই পৃথিবীটাকে আমরা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছি যে আমাদের সন্তানদের কাছে এটা বাসযোগ্য রেখে যেতে পারব কী না সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদের ভেতরেই সন্দেহের জন্ম হয়েছে। যদি পরিবেশ পুরাপুরি ধ্বংস না করেও কোনোভাবে টিকে যেতে পারি তারপরেও পৃথিবীর যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপতিরা লোভ এবং গোয়ার্তুমি করে পুরো পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিতে পারে। পৃথিবীতে মানুষ এক লক্ষ বছর বেঁচে থাকবে কিনা আমরা জানি না, ডাইনোসর একশ ত্রিশ মিলিয়ন বৎসর বেঁচেছিল। যেটা এক লক্ষ থেকে একশ ত্রিশ হাজার গুণ বেশি। কাজেই কেউ যদি ডাইনোসরকে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অযোগ্য একটা প্রাণী ভেবে থাকে সে খুব বড় ভুল করবে।

তবে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, পৃথিবীর অত্যন্ত সফল একটা প্রাণী যারা দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করত তারা বিস্ময়করভাবে আজ থেকে পঁয়ষট্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিয়ন বৎসর আগে পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে এটা ঘটেছে সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তাভাবনা করে একটি ব্যাখ্যা বের করেছেন। সেটি এ রকম :

29.1 নং ছবি : পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে একটা গ্রহকণা পৃথিবীকে আঘাত করেছিল, সেই মহাবিপর্যয়ে ডাইনোসরেরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

AMARBOI

আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগে কোনো একদিন যখন পৃথিবীর বুকে বিশাল ডাইনোসরেরা গাছের মাথা থেকে পাতা ছিড়ে খাচ্ছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ইঁদুরের মতো ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী জঙ্গলের ফাঁক-ফোকড়ে ছোটা-ছুটি করছে তখন হঠাৎ আকাশ থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার বড় একটি গ্রহকণা পৃথিবীর বুকে ছুটে এসেছিল। সেই বিশাল গ্রহকণার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় একশ হাজার কিলোমিটার থেকে বেশি। সেই বিশাল গ্রহকণার গতিবেগ এত বেশি ছিল যে, বলা যেতে পারে বায়ুমণ্ডলে একটা ফুটো তৈরি করে মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপ এলাকায় এসে আঘাত করেছিল। সেই ভয়ংকর গতিবেগ ছিল অপ্রতিরোধ্য। সেটা সমুদ্রের তলদেশে আঘাত করেও কঠিন পাথর ভেঙে কয়েক কিলোমিটার ঢুকে গেল। এই ভয়ংকর আঘাতে যে বিস্ফোরণ হলো সেটি পৃথিবীর সকল নিউক্লিয়ার বোমা থেকেও দশ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। সমুদ্রের তলদেশে যে গর্তের জন্ম হয়েছিল তার ব্যস ছিল 150 কিলোমিটার। বিস্ফোরণের পাথর ধুলাবালি বায়ুমণ্ডলের সেই গর্তের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গেল এবং কিছু বোঝার আগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রে ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের জন্ম হলো, সেটা সমুদ্র মহাসমুদ্র দিয়ে পৃথিবীর উপকূলে আছড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল। বিস্ফোরণের ধুলাবালি পাথর ধীরে ধীরে পৃথিবীতে পড়তে শুরু করে এবং দেখতে-দেখতে সারা পৃথিবী কালো ধুলাবালিতে ঢেকে গেল। বায়ুমণ্ডলে যে ধুলাবালি ছড়িয়ে পড়েছে সেটা সূর্যের আলোকে ঢেকে দিল। সারা পৃথিবী তখন অন্ধকারে ডুবে গেল। মাসের পর মাস পৃথিবীতে ঘন অন্ধকার, তাপমাত্রা দেখতে-দেখতে নিচে নেমে এলো, সারা পৃথিবীতে তখন এক হিমশীতল পরিবেশ। বিস্ফোরণের সময় প্রচণ্ড তাপে যে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে পানির সাথে মিশে সেটি ভয়ংকর এসিডের জন্ম দিলো, পুরো একটা মহাদেশ সেই এসিডের বৃষ্টিতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। বিস্ফোরণের প্রবল ধাক্কায় পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ফাটলের জন্ম হয়ে শত শত আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত করতে শুরু করে। অন্ধকার, এসিড-বৃষ্টি, শীত এবং অগ্ন্যুৎপাত— সব মিলিয়ে পৃথিবীতে যে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হলো সেটি সব ডাইনোসরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। শুধু যে ডাইনোসর নিশ্চিহ্ন হলো তা নয়— সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সকল জীবিত প্রাণী গাছপালা সবকিছুর দুই-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

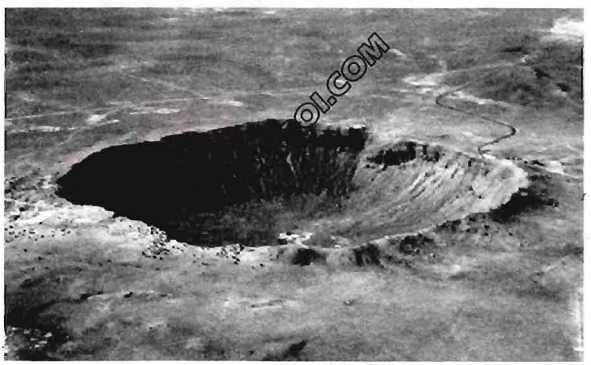

29.2 নং ছবি : যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা অঙ্গরাজ্যে বিশাল একটা উল্কা এসে আঘাত করেছিল মাত্র পনেরো থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে, তার চিহ্ন এখনো সেখানে রয়ে গেছে।

এই ঘটনাটি কী শুধু বিজ্ঞানীদের অনুমান নাকি তার পিছনে যুক্তি আছে সেটি পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। পৃথিবীর বুকে খোদাই করে পাথরের যে স্তরটি পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগে জমা হয়েছিল সেখানে ইরিডিয়াম নামে একটা ধাতু দেখা গেছে। এই ধাতু পৃথিবীর উপরে থাকার কথা নয়, মহাকাশ থেকে কোনো একটি গ্রহকণা পৃথিবীতে ভয়ংকর গতিবেগে আঘাত করলেই তার বিস্ফোরণে সারা পৃথিবীতে যে ধূলিকণা ছড়িয়ে পড়বে সেখানে এটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। শুধু তাই নয় মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে সমুদ্রের নিচে গ্রহকণার সংঘাতে তৈরি প্রায় দেড়শ কিলোমিটার ব্যাসের গর্তটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে। পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগের গাছপালার যে ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো থেকেও প্রমাণ পাওয়া গেছে হঠাৎ করে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ভয়াবহভাবে শীতল হয়ে গিয়েছিল! বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগে সত্যি সত্যি এই পৃথিবীর বুকে মহাকাশ থেকে মৃত্যুদূতের মতো একটি গ্রহকণা নেমে এসেছিল।

29.3 নং ছবি: 1908 সালের 30 জুন সাইবেরিয়ার তুঙ্গুসকাতে একটা ভয়াবহ উল্কাপাতে তিন হাজার বর্গ কিলোমিটারের সব গাছ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

যদি আমরা বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্ব মেনে নিই, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে পরের প্রশ্নটি এসে যায়। আবার কি পৃথিবীর বুকে এ-রকম সাক্ষাৎ-মৃত্যু নেমে আসতে পারে? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ পারে। সত্যি কথা বলতে কি ইতোমধ্যেই এ-রকম আরো ঘটনা ঘটে গেছে। আজ থেকে মাত্র পনেরো থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে প্রায় পঁচিশ মিটার বড় একটা উল্কা এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

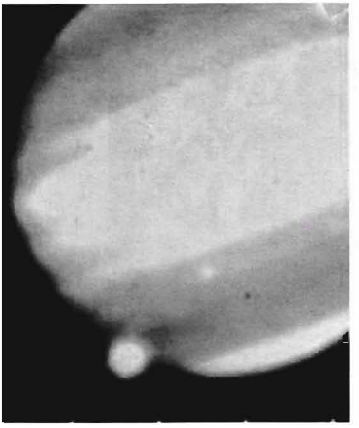

29.4 নং ছবি : বৃহস্পতি গ্রহে বিশাল উল্কাপাতের দৃশ্যটি সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা অঙ্গরাজ্যকে আঘাত করেছিল। তার চিহ্ন হিসেবে সেখানে প্রায় দেড় কিলোমিটার ব্যাস এবং দুইশ মিটার গভীর গর্তের চিহ্নটি এখনো সেখানে রয়ে গেছে। অতি সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটেছে 1908 সালের 30 জুন সাইবেরিয়ার তুঙ্গুসকাতে। সেদিন ভোররাতে আকাশের বুক চিরে একটা উল্কা পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল। তার ভয়ংকর বিস্ফোরণে প্রায় তিন হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার একটা পুরো বনাঞ্চলের সব গাছ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন প্রায় একশ মিটার বড় একটি উল্কা মাটির কাছাকাছি পৌঁছে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। এই বিস্ফোরণে বায়ুমণ্ডলে যে ধুলোবালি জমা হয়েছিল সারা পৃথিবীর মানুষ সেটা দেখেছে। সৌভাগ্যক্রমে সাইবেরিয়াতে কোনো মানুষজন থাকে না, তাই কোনো মানুষের জীবন নষ্ট হয় নি। কিন্তু ঘটনাটি যদি কোনো লোকালয়ে হতো তাহলে কী হতো সেটা চিন্তা করে মানুষ এখনো আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

পৃথিবীর কক্ষপথ আর গ্রহাণুপুঞ্জের কক্ষপথ একটি আরেকটিকে ছেদ করে তাই মাঝে মাঝেই এধরনের ঘটনা ঘটবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে এই উল্কাগুলো মাটিতে পৌঁছানোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উল্কাগুলোর আকার যদি বড় হয় তাহলে মাটিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পুড়ে শেষ হতে পারে না। বিজ্ঞানীদের হিসেবে প্রতি একশ বছরে একটা পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটারের উল্কা পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে। তবে তার বেশির ভাগই সমুদ্রে পড়বে, আমরা হয়তো বুঝতেই পারব না। প্রতি মিলিয়ন বছরে দশ কিলোমিটারের একটা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। সেটি যদি পৃথিবীতে আঘাত করে তার ফলাফল হবে ভয়ানক, পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর প্রাণিজগৎ সেটা টের পেয়েছিল। 1972 সালে এক হাজার টনের একটা উল্কা পৃথিবীর কাছাকাছি দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য সেটা পৃথিবীকে আঘাত করে নি। 1991 সালে প্রায় দশ মিটার বড় একটা গ্রহকণা পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝখান দিয়ে উড়ে গিয়েছিল।

কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে মহাজাগতিক এধরনের সংঘর্ষ হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। রাতের আকাশে আমরা যখন হঠাৎ করে একটা উল্কাকে নীলাভ আলো ছড়িয়ে উড়ে যেতে দেখি তখন আমরা এক ধরনের বিস্ময় মেশানো আনন্দ অনুভব করি। কথিত আছে তখন মনে-মনে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

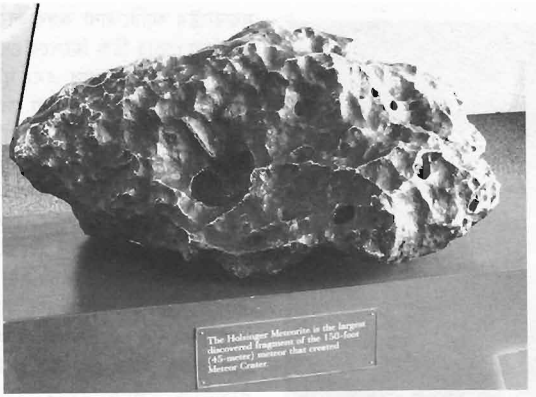

29.5 নং ছবি : পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত এরকম উল্কা এসে আঘাত করেছে।

ইচ্ছাটা করা হয় সেটাই পূরণ হয়। কিন্তু হঠাৎ করে এই উল্কাগুলো যদি কয়েক কিলোমিটার বড় হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর পুরো সভ্যতা এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টাকেও গুরুত্বের দিয়ে দেখছেন। পৃথিবীর কিছু বড় বড় টেলিস্কোপকে আকাশমুখী করা হয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা বিভিন্ন গ্রহকণাগুলো খুঁজে বের করতে। এ-রকম একটি টেলিস্কোপ ছিল হাওয়াইয়ের মনাকীতে। সেটাই 1991 সালের দশ মিটার বড় গ্রহকণাটিকে খুঁজে বের করেছিল। স্পেস গার্ড নামে নূতন একটা প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে, পঁচিশ বছরে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে পৃথিবীর এক কিলোমিটারের কাছাকাছি সবগুলো গ্রহকণাকে খুঁজে বের করে তার তালিকা করা হচ্ছে। সেগুলোকে চোখে চোখে রাখা হবে। হঠাৎ করে কোনো একটা যদি পৃথিবীমুখী রওনা দেয় সেটাকে কীভাবে মহাকাশে নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে সেটা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রযুক্তি হয়তো পুরাপুরি প্রস্তুত হয় নি, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে আমাদের প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে, কাজেই তখন সেটি এমন কিছু অসম্ভব কাজ বলে মনে হবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

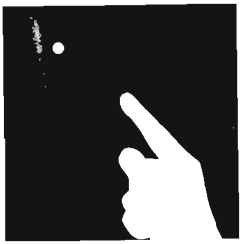

30. টাইম মেশিন

সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা আইনস্টাইন পাল্টে দিয়ে গিয়েছিলেন। একসময় ধারণা করা হতো সময় সবার জন্যে এক। আমার বয়স যদি এক বৎসর বাড়ে তাহলে আমার বন্ধু আমার পরিচিত সব মানুষজন এমনকি অপরিচিত সব মানুষের বয়সও এক বৎসর বেড়ে যাবে! কিন্তু আইনস্টাইন দেখিয়েছেন সেটা সত্যি নয়, যে মানুষটি বেশি ছোটাছুটি করছে তার বয়স একটু হলেও কম বেড়েছে, কারণ সময় সবার জন্যে এক নয়, যার যার সময় তার কাছে। আমরা বিষয়টা ধরতে পারি না কারণ পৃথিবীর মানুষ যারা ছোটাছুটি করে তাদের গতিবেগ খুবই কম, সুপারসনিক প্লেনে বড় জোর তারা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে যেতে পারে। কিন্তু সময়ের এই ব্যাপারটা চোখে পড়তে হলে একজনকে আলোর বেগের কাছাকাছি ছোটাছুটি করতে হবে। একজন মানুষ আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে যেতে পারে না কিন্তু অনেক মহাজাগতিক কণা সহজেই সেটা পারে। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে মিউওন, মহাজাগতিক কণা বায়ুমণ্ডলের উপরে আঘাত করে এই মিউওনের জন্ম দেয়। মিউওনের আয়ু খুবই কম। এই কম সময়ের ভেতরে একটা মিউওনের পুরো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উপস্থিত হওয়ার কোনো উপায় নেই, কিন্তু এটি সব সময় ঘটে থাকে (আমি একটা টাইম প্রজেকশন চেম্বার তৈরি করেছিলাম, সেখানে বসে বসে কংক্রীটের ছাদ, পুরু সীসার আস্তরন, ধাতব দেওয়াল সবকিছু ভেদ করে আসা মিউওনগুলো দেখতাম) বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসতে যেটুকু সময় দরকার সেই সময়টুকু বেঁচে না থেকেই মিউওন কেমন করে চলে আসে তার ব্যাখ্যা খুবই সহজ। মিউওন তার হিসেবে বেঁচে থাকে ক্ষুদ্র একটি সময়, কিন্তু আমাদের সময়টি মিউওনের ব্যক্তিগত সময় থেকে ভিন্ন। যেটি অনেক দীর্ঘ। এই সময়ের ভেতর মিউওন দিব্যি বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে চলে আসতে পারে।

সময় সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। টাইম মেশিনে করে সময় পরিভ্রমণ করা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন। সময় পরিভ্রমণ করে ভবিষ্যতে চলে যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে সহজ। কেউ যদি একটা মহাকাশযানে করে প্রচণ্ড বেগে (আলোর বেগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি) ছয় ঘণ্টা ভ্রমণ করে কোথাও যায় তারপর দিক পরিবর্তন করে আবার ছয় ঘণ্টা ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তা হলে সে দেখবে পৃথিবীতে হয়তো দশ বছর হয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে দশ বছর ভবিষ্যতে চলে গেছে। এটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর বিষয় নয়— এটি আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির ভবিষ্যদ্বাণী।

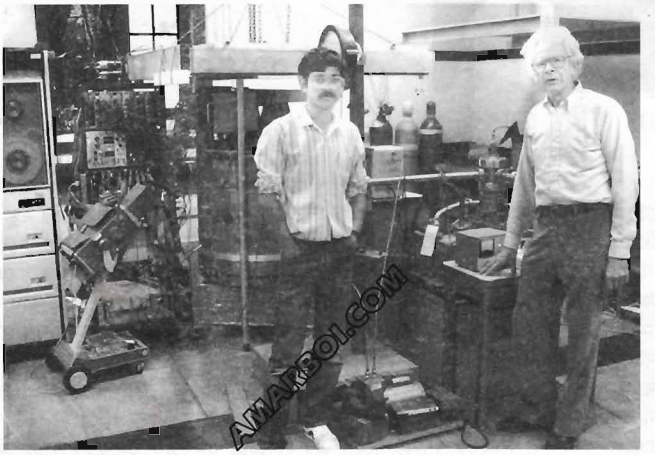
AMARBOI.COM

30.1 নং ছবি: টাইম প্রজেকশন চেম্বারে খুব সহজেই দেখা যায় মিউওন কংক্রীটের ছাদ, সীসার আস্তরণ, ধাতব দেওয়াল সব কিছু ভেদ করে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু অতীতে কী যাওয়া সম্ভব? শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু টাইম মেশিনে করে সময় পরিভ্রমণ করার ওপরে একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। কিপ থর্ন[১] নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানী এই বিষয়ের উপর একটা গবেষণাপত্র (Wormholes, Time Machines, and The weak Energy Condition, Physical Review, Le Hers, 61, 1446, 1488) প্রকাশ করেছেন, যেটি সময় পরিভ্রমণের মতো একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বিষয়কে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিণত করেছে।

১. Black Holes and Time warps, Kip S. Thorne. (আমি যখন ক্যালটেকে ছিলাম কিপ থর্ন ঠিক আমার ফ্লোরের কাছাকাছি ছিলেন, আমার অফিসের খুব কাছেই ছিল তার অফিস। কিপ থর্ন বাজী ধরতে খুব পছন্দ করতেন। তার অফিসের দেওয়ালে পৃথিবীর বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীদের সাথে বাজী ধরে বিচিত্র সব অঙ্গীকারনামা তৈরি করে টানিয়ে রাখতেন। কিপ থর্ন খুব আমুদে একজন মানুষ!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় পরিভ্রমণ করে অতীতে যাওয়ার বিষয়টি বোঝার আগে ওয়ার্ম হোল নামের বিষয়টি আগে বুঝতে হবে। ওয়ার্ম হোল হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গার ভেতরে একটি শর্ট কাট। ত্রিমাত্রিক জগতের ভেতরে একটি ওয়ার্মহোল কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আমরা যদি বোঝার সুবিধার জন্যে ত্রিমাত্রিক জগৎটিকে দ্বিমাত্রিক জগৎ হিসেবে কল্পনা করে নিই তাহলে বিষয়টা বোঝা সহজ হয়। 30.2 নং ছবিতে এ-রকম একটি ওয়ার্মহোল দেখানো হয়েছে। সব ওয়ার্মহোলের দুটি মুখ থাকে, ছবিতে দেখানো হয়েছে এই ওয়ার্মহোলের একটি মুখ পৃথিবীর কাছাকছি। অন্য মুখটি 26 আলোকবর্ষ (সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে আলো এক বৎসরে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি হচ্ছে এক আলোকবর্ষ) দূরে ভেগা নক্ষত্রের কাছাকাছি। ওর্য়মহোল ব্যবহার না করে কেউ যদি পৃথিবী থেকে ভেগা নক্ষত্রে যেতে চায় তাহলে তার ছাব্বিশ আলোকবর্ষ দূরে যেতে হবে। কিন্তু সে যদি ওয়ার্মহোলের ভেতরের টানেলটি দিয়ে যেতে চায় সে হয়তো মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সেই একই জায়গায় পৌঁছে যাবে। এই টানেলটা হাইপার স্পেস ব্যবহার করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুটি ভিন্ন জায়গার ভেতর একই শর্টকার্ট তৈরি করে দিয়েছে।

কেউ যেন মনে না করে ওয়ার্মহোলের এই বিষয়গুলো গালগল্প। আইনস্টাইনের সূত্রের সমাধান করে 1916 সালে প্রথমে এর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। আইনস্টাইন, রোজেন, হুইলারের মতো বড় বড় বিজ্ঞানীরা এর উপর গবেষণা করেছেন। টাইম মেশিন তৈরি করতে এ-রকম একটা ওয়ার্মহোল তৈরি করতে হবে। এই মুহূর্তে ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব হয়তো কাগজ-কলমে (বড় জোর কম্পিউটারের) সীমাবদ্ধ কিন্তু দূর ভবিষ্যতে মানুষ যখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রায় লাগাম ছাড়া উন্নতি করে ফেলবে তখন হয়তো তারা ইচ্ছেমতো ওয়ার্ম হোল তৈরি করতে পারবে। মানুষ যখন সেরকম পার্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন তারা একটা টাইম মেশিন তৈরি করার কথা ভাবতে পারবে।

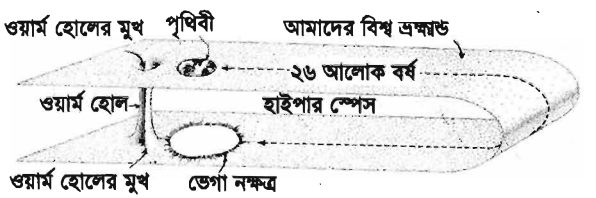

30.2 নং ছবি: ওয়ার্ম হোল দিয়ে পৃথিবী থেকে ভেগা নক্ষত্রের মাঝে একটা শর্টকাট তৈরী করা যেতে পারে।

এটা তৈরি করার জন্যে প্রথমে দরকার হবে একটা মহাকাশযানের। তারপর একটা ওয়ার্ম হোল তৈরি করে তার একটা মুখ রাখতে হবে মহাকাশযানের ভেতরে, অন্যটা থাকবে ধরা যাক কারো ঘরের বৈঠকখানায়। টাইম মেশিন তৈরি করার প্রস্তুতি শেষ এখন সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করা শুরু করা যেতে পারে। বিষয়টা বোঝার জন্যে আমরা কল্পনা করে নেই ঘরের বৈঠকখানায় একজন এসে বসেছে, তার নাম মৃত্তিকা। আর যে মহাকাশযানে বসে আছে তার নাম হচ্ছে আকাশ। এখন আমরা দেখি টাইম মেশিন চালু করার সময় মৃত্তিকা আর আকাশ কে কী বলবে :

মৃত্তিকা : "আমি বসে আছি আমার বৈঠকখানায়। ঘরের বাইরেই দেখতে পাচ্ছি মহাকাশযানটি দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আছে আকাশ। সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার বৈঠকখানার ভেতরে ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে মহাকাশযানের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। এই ওয়ার্মহোলটা কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা। আমি এর ভেতর দিয়ে আমার হাতটা ঢুকিয়ে আকাশকে ধরতে পারি। আমি আর আকাশ ঠিক করেছি মহাকাশযানটা যখন রওনা দেবে আমরা একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখব।"

আকাশ : "আমি আর মৃত্তিকা একজন আরেকজনের হাত ধরে রেখেছি। আজকে 3000 সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ। ঠিক সকাল নয়টার সময় মহাকাশযানটি রওনা দেবে। আমি ঠিক করেছি প্রচণ্ড গতিবেগে, প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি ছয়ঘণ্টা ছুটে যাব। তারপর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে থাকব পরের ছয় ঘণ্টায়। অর্থাৎ, সকাল নয়টায় রওনা দিয়ে ঠিক রাত নয়টার মাঝে ফিরে আসব।"

মৃত্তিকা : "এখন বাজে ঠিক নয়টা, মহাকাশযানটি আকাশকে নিয়ে মহাকাশে ছুটে যেতে শুরু করেছে। যেহেতু ওয়ার্মহোলটি মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা আমি এখনো আকাশকে ধরে রাখতে পারছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কি আমি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আকাশকে দেখতেও পাচ্ছি! আকাশ মহাকাশ ভ্রমণ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তার হাত ধরে রাখব। অর্থাৎ, বারো ঘণ্টা তার হাত ধরে থাকতে হবে।"

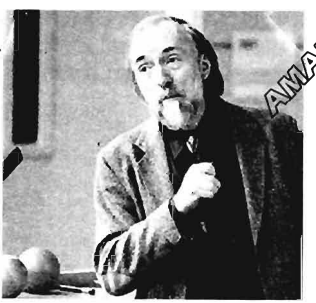

30.3 নং ছবি : পদার্থবিজ্ঞানী কিপ থর্ন বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে বাজী ধরতে খুব পছন্দ করেন।

আকাশ : "আমি ছয় ঘণ্টা আলোর বেগের কাছাকাছি গতিবেগে আমার মহাকাশযানে ছুটে গিয়েছি। তারপর মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমি যখন রওনা দিয়েছিলাম তখন আমার মহাকাশযানের ঘড়িতে বেজে ছিল সকাল নয়টা। আমি যখন ফিরে এসেছি তখন আমার ঘড়িতে বাজে রাত নয়টা।"

মৃত্তিকা : "আমি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আকাশ যে মহাকাশযান দিয়ে ভ্রমণ করে এসেছে সেই ঘড়িটাতে এখন বাজে রাত নয়টা। বারো ঘণ্টা টানা আমরা হাত ধরে রেখেছিলাম। এখন হাতটা ছেড়ে দিই। আমার হাতের ঘড়িতেও বাজে রাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়টা। এতক্ষণ আমি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে আকশকে দেখছিলাম। এখন তার হাত ছেড়ে দিয়েছি, ঘড়িতে বাজে রাত নয়টা এক মিনিট, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছি। কী আশ্চার্য! মহাকাশযানটি তো নেই, গেল কোথায়?

"আমার একটি খুব ভালো টেলিস্কোপ আছে, সেটা দিয়ে মহাকাশে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখলাম মহাকাশযানটি ছুটে যাচ্ছে!"

"তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। শুধু দিন নয়, সপ্তাহ কেটেছে মাস কেটেছে এমনকি বছর কেটেছে। আমার বয়স বেড়েছে দশ বছর। চুলে একটু পাক ধরেছে, মুখের চামড়ায় বয়সের রেখাও পড়েছে।

"ঠিক দশ বছর বছর পর 3010 সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ হঠাৎ দেখি গর্জন করে আকাশের মহাকাশযানটি আমার বৈঠকখানার কাছে নেমে এসেছে। আমি ছুটে গিয়েছি দেখি মহাকাশযানের ভেতরে আকাশ একজনের হাত ধরে বসে আছে। আমার দশ বৎসর বয়স বেড়েছে কিন্তু আকাশের বয়স বেড়েছে মাত্র বারোঘণ্টা। আমি আকাশকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার হাত ধরে রেখেছ? সে বলল, কেন তোমার? আমি মহাকাশযান ওঠে তার ওয়ার্মহোলের মুখে উঁকি দিয়ে দেখি সত্যি সত্যি সে একজন মানুষের হাত ধরে রেখেছে। মানুষটি আর কেউ নয়, মানুষটি স্বয়ং আমি। দশ বৎসর আগে যেমন ছিলাম!

"আমি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়েছি। আমি দেখছি আমার নিজেকে। দশ বৎসর আগে আমি ফিরে গেছি আমার নিজের কাছে!"

আমি জানি পুরো ব্যাপারটি একটা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়— কিন্তু এটা ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন একটি জার্নালে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের মূল বিষয়। সেখানে যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা আসলে ঠিক এ-ধরনের একটা সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

বলা বাহুল্য এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হবার পর সারা পৃথিবীতে প্রবল হইচই শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখছেন। এটি আসলে সম্ভব নাকি অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে সেটা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা পাল্টা আলোচনা চলছে। স্টিফেন হকিংও এর উপরে মন্তব্য করেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন একটি ওয়ার্মহোল ঠিক যখন টাইম মেশিন হিসেবে কাজ করতে শুরু করে তখন ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশান (Vacuam Fluctuation) এর ক্রম আবর্তনের কারণে সেটি ধ্বংস হয়ে যাবে! সেটি কি সত্যি, নাকি আসলেই টাইম মেশিন তৈরী করা সম্ভব সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো কেউ জানে না। কোয়ান্টাম গ্রেভিটি সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আরো ভালো করে না জানা পর্যন্ত কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না!

আমাদের সেই জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

31. আমরা কি একা?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ ছাড়াও অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা এই বিষয়টি থেকে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে নিউট্রিনোর ভর আছে কিনা এবং যদি থেকে থাকে সেটা কত। কিন্তু আমি বাজী ধরে বলতে পারি নিউট্রিনোর ভর বিষয়ক আলোচনা হলে সাধারণ মানুষ হাই তুলে অন্য একটা বিষয়ে চলে যাবেন। কিন্তু এই সৃষ্টিজগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কী না সেটা নিয়ে আলোচনা হলে নিশ্চিতভাবে কৌতূহলী হয়ে আলোচনাটি শুনবেন।

AMARBOI.COM

পৃথিবীর মানুষের এই বিষয় নিয়ে কৌতূহল অনেক দিনের। একসময় ধারণা করা হতো সূর্যের প্রখর উত্তাপ বাইরে, ভেতরে পৃথিবীর মতো শান্তিময় পরিবেশ। সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণীরা বসবাস করে। সূর্যের গঠনটা বুঝে নেবার পর এখন আর সেটা কেউ বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর কাছাকাছি ছোট গ্রহগুলো হচ্ছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল। পৃথিবীতে আমরা সবাই আছি এবং সব সময়েই কল্পনা করছি অন্য গ্রহগুলোতে হয়তো আমাদের মতো কেউ আছে। এখন আমরা জেনেছি ভয়ংকর উত্তপ্ত বুধ গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটা সম্ভব না। শুক্র গ্রহও মেঘে ঢাকা উত্তপ্ত প্রাণ সৃষ্টির অনুপযোগী একটা গ্রহ। মঙ্গল গ্রহ প্রতিযোগিতায় খুব দুর্বলভাবে টিকে আছে। বড় বড় চোখ, কিলবিলে হাত পা, ধারালো দাঁত এই ধরনের পূর্ণ বিকশিত প্রাণীর আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু জীবাণু আকারের কিছু একটা আছে কী না কিংবা এখন না থাকলেও অতীতে কখনো ছিল কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা মাঝে মাঝেই চাঙ্গা হয়ে উঠে।

মানুষ ছাড়া সৃষ্টি জগতে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা সেটা নিয়ে মানুষের কৌতূহল যুক্তিসম্মত এবং সেটা বের করার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানও আছে, তার নাম Search for Extra Terrestrial Intelligence সংক্ষেপে SETI এবং তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করে মহাজগতে ক্রমাগত প্রাণের সন্ধান করে যাচ্ছে। মূলত মহাজগৎ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের সংকেত আসে তার মাঝে কোনো প্যাটার্ন বা বুদ্ধিমত্তা আছে কিনা সেটাই খোঁজা হয়। ধারণা করা হয়, যদি সে-রকম কিছু পাওয়া যায় বুঝে নিতে হবে সেটা পাঠাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন বুদ্ধিমান প্রাণী। এটা নিয়ে অনেক বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু এখনো কিছু পাওয়া যায় নি। তবে বিজ্ঞনীরা যে মহাজাগতিক প্রাণী বলে কিছু নেই সেটা পুরাপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন তা নয়। ভয়েজার মহাকাশযানগুলো আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো পর্যবেক্ষণ করে সৌরজগতের বাইরে চলে গেছে। সেখানে মানব-মানবীর ছবিসহ আরও অনেক কিছু পাঠানো হয়েছে, কোনো একটি বুদ্ধিমান প্রাণী কোনো একদিন সেটা খুঁজে পাবে সেই আশায়!

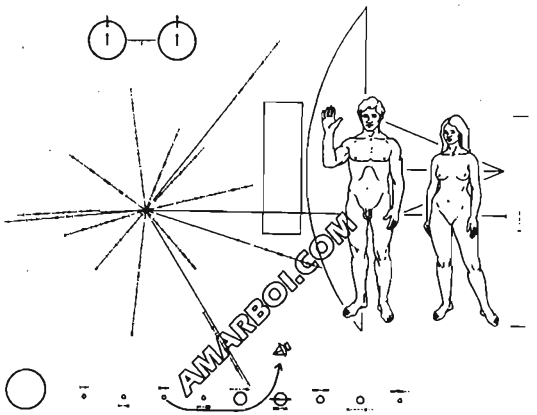

31.1 নং ছবি : পৃথিবীর বাইরেও বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কি নেই, সেটা নিয়ে মানুষের খুব কৌতূহল। ভয়েজার মহাকাশ যানটি যখন সৌরজগৎ থেকে বাইরে চলে যায় সেখানে এই ছবিটি দিয়ে দেয়া হয়েছিল, কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এটা দেখে পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে জানতে পারবে সেই আশায়।

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সেটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা করা হয় নি, তা নয়। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ড্রেকের সমীকরণ। এই সমীকরণে বলা হয়েছে এই মুহূর্তে যে কয়টি বুদ্ধিমান প্রাণীর জগৎ থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে তার সংখ্যা N হচ্ছে : $N = R \times P \times E \times L \times I \times T$

এখানে R হচ্ছে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা, P হচ্ছে একটা নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহ পাবার সম্ভাবনা, E হচ্ছে এ-রকম গ্রহ থেকে থাকলে প্রাণ বিকাশের উপযোগী গ্রহের সংখ্যা, L হচ্ছে প্রাণ বিকাশের উপযোগী থেকে থাকলে তার ভেতরে সত্যি সত্যি প্রাণের বিকাশ হবার সম্ভাবনা, I হচ্ছে সত্যি সত্যি প্রাণের বিকাশ হয়ে থাকলে সেগুলো বিবর্তনে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নত হয়ে অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করার মতো বুদ্ধিমত্তা অর্জনের সম্ভাবনা এবং T হচ্ছে যে সময় পর্যন্ত সেই বুদ্ধিমান প্রাণী টিকে থাকতে পারে। এর কিছু-কিছু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বেশ ভালো ধারণা আছে, কিছু-কিছু অনুমান করতে হয়। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী কার্ল সাগান ড্রেক সমীকরণ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন এই গ্যালাক্সিতেই লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিমান প্রাণীর সভ্যতার জন্ম হওয়ার কথা। আবার অনেক বিজ্ঞানী সেটা মোটেও বিশ্বাস করতে রাজী নন, তাদের ধারণা ড্রেকের সমীকরণ ব্যবহার করে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করা এত সোজা না। আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী হচ্ছেন এনরিকো ফার্মি, তিনি ড্রেকের সমীকরণ দেখে বিখ্যাত ফার্মির বিভ্রান্তি জন্ম দিয়েছিলেন, সেটা এরকম :

(ক) সত্যি যদি মহাজগতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থেকে থাকত তাহলে এতদিনে তাদের পৃথিবীতে দেখা পাওয়ার কথা।

(খ) তাদের যদি পৃথিবীতে দেখা না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে মহাকাশযান তৈরি করে পৃথিবীতে আসার তাদের কোনো গরজ নেই।

(গ) সেটা যদি সত্যি না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই বুদ্ধিমান প্রাণীর সভ্যতা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাদের জন্ম হয় এবং কিছু বোঝার আগেই তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে!

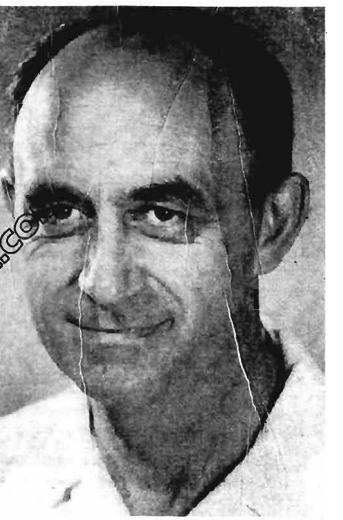

31.2 নং ছবি : এনরিকো ফার্মী, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম পদার্থ বিজ্ঞানী ঠাট্টাচ্ছলে মহাজগতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটাকেই খুব গুরুত্ব নিয়ে বিবেচনা করা হয়।

এনরিকো ফার্মি যে খুব চিন্তাভাবনা করে তার এই বিভ্রান্তিটির জন্ম দিয়েছিলেন তা নয়, বলা হয়ে থাকে দুপুরের খাবার খেতে খেতে ঠাট্টার ছলে কথাগুলো বন্ধুদের বলেছিলেন এবং এখন যারাই মহাজাগতিক প্রাণী নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তার কোনো না কোনোভাবে এনরিকো ফার্মির বিভ্রান্তির কথা জানে। প্রথম দুটোর কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা তৃতীয়টা নিয়ে একটু ভাবতে পারি।

আমরা মানুষেরা নিজেদের খুব উন্নত এবং বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু ইতিহাস পড়লে সেটাকে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। যুদ্ধবিগ্রহ করে মানুষ একে অন্যকে কতভাবে খুন করেছে সেটি কেউ চিন্তা করে দেখেছে? পুরো একটি সভ্যতাকে অন্য একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতা এসে ধ্বংস করে দিয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আমাদের মনে হয় এই মুহূর্তে আমর ঠিক এ-রকম একটা সময়ের মাঝে আছি। চেঙ্গিস খান বা হালাকু খানের আমলে মানুষ খুন করা পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল, কারণ তখন তরবারি দিয়ে আরেকজনকে কাটতে হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনী সেটাকে আধুনিক করে ফেলেছিল। গ্যাস চেম্বারে মারা থেকে শুরু করে মৃতদেহকে ভস্মীভূত করার অনেক বিজ্ঞানসম্মত উপায় তারা আবিষ্কার করেছিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিধ্বংসী নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে এক মুহূর্তে কয়েক লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলে হত্যাকাণ্ডের একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। তার সাথে সাথে এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকবে কিনা সেটা নিয়ে একটা প্রশ্নও প্রথমবার তৈরি হয়েছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা করে পৃথিবীর নানা দেশের কাছে এখন যে পরিমাণ মানব বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে সেই অস্ত্র দিয়ে এই পৃথিবীর সকল প্রাণীকে একবার নয় অসংখ্যবার ধ্বংস করে ফেলা যায়। তারপরেও আমরা কি মানুষকে সভ্য মানুষ বলতে পারি?

31.3 নং ছবি : মানুষ নিজেই এখন নিজেদের পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। হিরোশিমাতে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে তার একটা প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের পছন্দ হোক আর না হোক এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে এ-রকম একটা পরিস্থিতি হওয়া সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে। চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান ধারালো তরবারি দিয়ে কুপিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে শেষ করতে পারত না কিন্তু জর্জ বুশ কিংবা টনি ব্লেয়ার ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে শেষ করে ফেলতে পারে। একবার নয়, বহুবার। তার কারণ চেঙ্গিস খান বা হালাকু খানের কাছে নিউক্লিয়ার বোমা ছিল না। জর্জ বুশ কিংবা টনি ব্লেয়ারের কাছে আছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক সূত্র থেকে যখন বের করেছিলেন $E = mc^2$ তখন কি তিনি সন্দেহ করেছিলেন এটা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর মরণাস্ত্র তৈরি হবে? পরমাণুর বড় একটি নিউক্লিয়াস ভেঙে দু টুকরো করা হলে তার বাড়তি ভরটুকু শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। ভর বা m কে E বা শক্তি তৈরি করা হলে সেটাকে c বা আলোর বেগ দিয়ে দুইবার গুণ করতে হয়, তাই একটুখানি ভর দিয়ে অনেকখানি শক্তি পাওয়া যায়। সাধারণ বোমার ধ্বংস করার ক্ষমতা থেকে নিউক্লিয়ার বোমার ধ্বংস করার ক্ষমতা তাই এত বেশি। যে পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়ে এটা প্রথমে করা হয়েছিল সেটি ছিল ইউরেনিয়ামের। ইউরেনিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে 92। তাই এই সংখ্যাটির একটা অন্যরকম গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ যখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে প্রথমবার 92 নম্বর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে ভয়ংকর শক্তিটা বের করতে পেরেছে ঠিক তখনই তারা সারা জীবনের জন্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কারণ, ঠিক তখন প্রথমবার তারা পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতাটি অর্জন করেছে। মানুষ তাদের নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে কিনা সেটি কেউ এখনো জানে না। কিন্তু সেই ক্ষমতাটি যে তাদের আছে সেটি সবাই জানে। একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সভ্যতা যখন বিকশিত হয় তাদের অস্তিত্বের প্রথম বিপদটি আসে এই 92 নম্বর পরমাণু থেকে। এর থেকে উত্তরণ হবার পরেই বলা যায় তারা 92-এর বাধা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

1.4 নং ছবি : বুদ্ধিমান প্রাণীরা কি নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে সবসময়ে একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকবে?

পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে বিকশিত হয়ে একসময় 92-এর ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি হয় ঠিক সেরকম অন্য কোনো গ্যালাক্সির অন্য কোনো নক্ষত্রে অন্য কোনো গ্রহে যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হয় তাহলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে তারাও এক সময় 92 নম্বর পরমাণু থেকে শক্তি বের করার রহস্যটি জেনে যাবে। মানুষ যেভাবে তাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করার মুখোমুখি হয়েছে সে-রকম তারাও সেই নিজেকে ধ্বংস করার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে।

তারপর কী হয় আমরা জানি না। এনরিকো ফার্মি ভয় পেয়েছেন বুদ্ধিমান প্রাণী হয়তো নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। মানুষও বুদ্ধিমান প্রাণী, তাই হয়তো আমরাও নিজেদের ধ্বংস করে ফেলব! হয়তো সৃষ্টিজগতে অনেক প্রাণের উদ্ভব হয়েছে কিন্তু বুদ্ধিমত্তার জন্যে তাদের খুব বড় মূল্য দিতে হয়েছে। সে কারণে হয়তো বুদ্ধিমান প্রাণীরা সব সময়ই একা। সব সময়েই নিঃসঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~